ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান
আল ফাওযান

عقيدة التوحيد

আক্বীদাতুত তাওহীদ

تأليف الشيخ الدكتور العلامة/صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

লেখক: শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

অনুবাদ: শাইখ মুখলিসুর রহমান মানসুর

সম্পাদনা: শাইখ মুহাম্মাদ এজাজুল হক্ব

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১১

গ্রন্থকারের ভূমিকা ১৭

প্রথম অধ্যায়

আক্বীদা পাঠের প্রারম্ভিক কথা

আক্বীদার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ২১

ছ্বহীহ আক্বীদার উৎস ও তা গ্রহণে সালফে সালিহীনগণের নীতি ২৫

সঠিক আক্বীদা হতে পদস্খলন এবং তা হতে বাঁচার উপায় ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাওহীদ ও তার প্রকারভেদ

১। তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব।

তাওহীদে রুবুবিয়্যার সংজ্ঞা এবং এর প্রতি মুশরিকদের স্বীকারোক্তি ৩৫

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে “রব” শব্দের ব্যাখ্যা। তাওহীদে রুবুবিয়্যাহর ক্ষেত্রে পথ ভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলোর ধ্যাণ ধারণা এবং এর প্রতিবাদ ৪১

আল্লাহর বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করা পৃথিবীর সব কিছুর স্বভাবজাত ধর্ম ৪৯

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্বতা প্রমাণে কুরআনের নীতি ৫৩

তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ তাওহীদে উলুহিয়্যাহকে আবশ্যক করে ৫৯

২। তাওহীদে উলূহিয়্যাহ

তাওহীদে উলূহিয়্যার সংজ্ঞা যা ছিল সকল রসূলগণের দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ৬৫

শাহাদাতাইন (কালিমায়ে শাহাদাত)

শাহাদাতাইনের অর্থ ৭১
শাহাদাতাইনের রুকনসমূহ ৭৩
শাহাদাতাইনের শর্তাবলী ৭৫
শাহাদাতাইনের দাবি ৮০
শাহাদাতাইন নষ্ট বা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ৮১

শরী'আত প্রবর্তন সম্পর্কে : হালাল-হারাম আল্লাহর অধিকার ৮৫
ইবাদত সম্পর্কে : ইবাদতের সংজ্ঞা-প্রকার-ব্যাপকতা ৮৯
ইবাদতের ভুল সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে ৯২
সঠিক ইবাদতের খুঁটি বা রুকনসমূহ/ বিশুদ্ধ ইবাদতের মূল বিষয়াবলী : ভালবাসা-ভয়-বিনয় ও নম্রতা এবং আশা আকাঙ্খা ৯৪

আমল ও ইবাদত কবুলের শর্তাবলী:

ইখলাস এবং শরী'আত তথা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত মোতাবেক হওয়া ৯৭
দীনের স্তর সম্পর্কে : ইসলাম-ঈমান-ইহসান। প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ও পারস্পরিক সম্পর্ক ৯৯

৩। তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী প্রমাণে কুরআন, হাদীছ এবং জ্ঞানগত (যুক্তিগত) দলীল ১০৭

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতি ১১৩

যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বা তার কিছু অংশকে অস্বীকার করে তাদের প্রতিবাদ ১১৫

তৃতীয় অধ্যায়

মানুষের জীবনে ভ্রষ্টতা-বিপর্যয়ঃ

শিরক, কুফরী, নাস্তিকতা, মুনাফিক্বী, জাহিলিয়াত, ফাসিক্বী, পথ-ভ্রষ্টতা ও মুরতাদ

মানুষের জীবনে বিপর্যয় বা ভ্রষ্টতা ১২৫

শিরকের পরিচয় ও প্রকারভেদ ১২৯

কুফরীর পরিচয় ও প্রকারভেদ ১৩৯

মুনাফিক্বীর পরিচয় ও প্রকারভেদ ১৪৫

জাহিলিয়াত-ফাসিক্বী-পথ ভ্রষ্টতা-মুরতাদ হওয়া এবং তার প্রকার ও বিধান

জাহিলিয়াত ১৫১

আল্ ফিস্ক্ব বা ফাসিক্বী ১৫৩

দ্বলাল বা পথ ভ্রষ্টতা ১৫৪

রিদ্দাহ এর প্রকারভেদ ও তার বিধান ১৫৬

মুরতাদ (স্বধর্মত্যাগকারী) ব্যক্তির বিধান ১৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

এমন কিছু কথা ও কাজ যা তাওহীদ পরিপন্থী অথবা তাওহীদকে ত্রুটিযুক্ত করে

ইলমে গায়িব বা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করা
(হাতের তালু, কাপ-পেয়ালা পড়ে বা তারকা গণনার মাধ্যমে)........১৬১
জাদু, জ্যোতিষী এবং গণকদারী করা........১৬৫
কবর ও মাজারে নযর-মানত, হাদিয়া ও নৈকট্যলাভের জন্য উপঢৌকন
দেওয়া এবং এসকল স্থানকে সম্মান করা........১৭১
মূর্তি এবং স্মৃতি স্তম্ভকে সম্মান করার বিধান ১৭৯
দীন ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা এবং তার সম্মানহানী করার বিধান..১৮৩
মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার কার্য পরিচালনা করার বিধান........১৮৭
মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার ফায়ছালাকারীর বিধান ১৯৫
শরী'আত পরিবর্তন এবং হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষমতা রয়েছে বলে দাবী করা........১৯৯
নাস্তিকতা এবং জাহিলী দল ও মতের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার বিধান ২০৫
জীবন পরিচালনায় বস্তুবাদী চিন্তা-ধারা এবং এর ক্ষতিকর দিকসমূহ........২১৩
তাবিজ-কবচ ও ঝাঁড়-ফুঁক সম্পর্কে ২১৯
গাইরুল্লাহ বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা, অসীলা বা মাধ্যম গ্রহণ এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন সৃষ্টি জীবের নিকটে সাহায্য প্রার্থনার বিধান ২২৫
সৃষ্টিজীবকে অসীলা- ধরে আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করা........২২৯
সৃষ্টিজীবের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা ও বিপদে উদ্ধার কামনা করা........২৩৫

পঞ্চম অধ্যায়

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবারবর্গ এবং ছাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে যে বিশ্বাস রাখা ফরয

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা ও সম্মান করা ফরয, তার প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়া-বাড়ি ও সীমালংঘন করা নিষিদ্ধ এবং তার মর্যাদা সম্পর্কে ২৩৯

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও অনুকরণ করা ফরয ২৪৯

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ছ্বলাত-দরুদ ও সালাম পাঠের বিধান ২৫৩

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের মর্যাদা এবং তাদের জন্য করণীয় ও বর্জণীয় ২৫৭

ছাহাবাগণের মর্যাদা, তাদের ব্যাপারে যে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব এবং তাদের মাঝে সৃষ্ট মতানৈক্য সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ২৬৩

ছাহাবাগণের মাঝে সংঘটিত লড়াই ও গোলযোগের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতি ২৬৬

ছাহাবাগণ এবং দীনের সঠিক পথের ইমামগণকে গালি দেয়া নিষেধ ২৭৫

উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার সঠিক পথের অনুসারী কোন আলিমকে গালি দেয়া নিষেধ ২৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিদ‘আত পরিচিতি

বিদ‘আতের সংজ্ঞা-তার প্রকার ও বিধান ২৮১

একটি সতর্কতা (বিদ‘আতকে হাসানা ও সাইয়িআ হিসাবে প্রকরণ করা) ২৮৪

মুসলিম সমাজে বিদ‘আতের প্রকাশ এবং তার কারণসমূহ ২৮৭

বিদ‘আতীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অবস্থান ২৯৭

বিদ‘আতীদের প্রতিবাদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের নীতি ৩০১

বর্তমান যুগের বিদ‘আতের কিছু নমুনা ৩০৩

বর্তমানে দলীলবিহীন যে সকল কাজকে ইবাদত মনে করা হয় ৩০৯

বিদ‘আতের ভয়াবহতা ও ক্ষতিকারক দিক ৩১১

বিদ‘আতীর সাথে কেমন আচরণ বা ব্যবহার করা উচিত ৩১৭

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য যিনি আমাকে তাওহীদি বিশ্বাসের উপর সৃষ্টি করতঃ তার উপর অবিচল থাকার তৌফীক্ব দান করেছেন। ছ্বলাত (দরুদ) ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ ও শ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও সাথীবর্গের উপর।

অতঃপর সম্মানিত পাঠক পাঠিকা, আমি ২০০৮-২০০৯ ঈসায়ী মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে লেখাপড়া সমাপ্ত করে চাকুরীর খোঁজে তায়েফে গমন করি। সেখানে ভাই শাইখ হারুনুর রশীদের সহযোগীতায় সঊদী আরবের স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড থেকে বেশ কিছু বই সংগ্রহ করি। যার অন্যতম একটি বইয়ের নাম ছিল **'আক্বীদাতুত তাওহীদ'**, লেখক সঊদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ ও ফতোয়া বোর্ডের সম্মানিত প্রবীণ সদস্য **ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ)**। বইটির সূচিপত্র ও শিরোনামগুলো পড়ে তা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা জরুরী মনে করি। মনের গহীনে এ আশা থাকলেও কর্ম ব্যস্ততার দরুন তা সম্ভব হয়নি।

সঊদী আরবের দাম্মাম ইসলামিক কাল্চারাল সেন্টারে কর্মরত অবস্থায় প্রতি শুক্রবার সকালে বইটি হতে ধারাবাহিক ক্লাস শুরু করি। ছাত্রদের সুবিধার্থে প্রতিদিনের পড়া অনুবাদ করে তাদেরকে পান্ডুলিপি আকারে দিতাম। এ ধারাবাহিকতায় আল্লাহর রহমতে এক সময় বইটির পাঠদান ও অনুবাদ সমাপ্ত করি।

অত্র বইয়ে লেখক তাওহীদের জন্য আবশ্যকীয় ও তার পরিপন্থী বিষয়সমূহ অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আমিও সেভাবে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। তবুও মানুষ হিসাবে ভুল থাকা স্বাভাবিক। তাই পাঠকের নিকটে কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে জানালে সাদরে গ্রহণ করব।

হে আল্লাহ, তাওহীদ বিষয়ে তুমি আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করে একে আমার ও পাঠকমহলের মুক্তি-নাজাতের অসীলা বানাও। দিকে দিকে তাওহীদি ঝান্ডা উড়িয়ে শিরকের মূলোৎপাটন কর। আমীন।

শাইখ মুখলিসুর রহমান মানসুর।

সম্পাদকের বাণী

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য। ছ্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার সম্মানিত রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর।

তাওহীদ ইসলামের মূল স্তম্ভ। সত্তা ও গুণাবলীর দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে এক ও একক জানা ও মানাই হলো তাওহীদের বিশ্বাস। প্রত্যেক মুমিনের ইহজগত ও পরজগতের সফলতা ও বিফলতা তাওহীদের উপরই নির্ভরশীল। তাই এ তাওহীদের মর্মবাণী প্রচারের লক্ষেই পৃথিবীতে সমস্ত নাবী-রসূলদের আগমন হয়েছিল। সুতরাং প্রতিটি মুমিন নর-নারীকে অন্তত তাওহীদ ও তার বিপরীত বিষয় শিরক সম্পর্কে সম্মক জ্ঞানার্জন করা অপরিহার্য।

শির্ক ও বিদ'আতের মহা মড়কের অঞ্চল বাংলাদেশে তাওহীদের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ, তাবলীগ তথা প্রচার ও প্রসার তো একেবারে নেই বললেই চলে। কিন্তু শিরক ও বিদ'আতের প্রচার প্রসারের কোন কমতি নেই। দিন যতই যাচ্ছে তার ভয়াবহতা ততই বেড়ে চলেছে।

বন্ধুবর শাইখ মুখলিসুর রহমান শাইখ **ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযানের (হাফিযাহুল্লাহ) রচিত কিতাব "আক্বীদাতুত তাওহীদ"** এর বঙ্গানুবাদ করেছেন তা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে মনে করি। অনুবাদের বিশাল জগতে তার নতুন পদচারনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

তার অনুদিত বইটি যদি বাংলা ভাষী মুমিন নর-নারীর কিঞ্চিত উপকার, তাওহীদের প্রতি উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতে সক্ষম হয় তাহলে লিখন, অনুবাদ, সম্পাদনা ও মুদ্রণের সকল শ্রম সার্থক হবে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শাইখ মুহাম্মাদ এজাজুল হক্ব।
দাঈ, ইসলামিক সেন্টার, আব্দুল্লাহ্ ফুয়াদ-দাম্মাম। সৌদী আরব।

ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ আল-কাসীম অঞ্চলের বুরায়দাহ শহরের নিকটবর্তী শামাসীয়ার অধিবাসী। তিনি ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখ মোতাবেক ১ রজব ১৩৫৪ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থাকতেই তার পিতা মারা যান। অতঃপর তিনি ইয়াতীম অবস্থায় স্বীয় পরিবারে প্রতিপালিত হন। শহরের মসজিদের ইমামের নিকট তিনি কুরআনুল কারীম, কিরা'আতের মূলনীতি এবং লিখা শিখেন।

শামাসিয়ায় ১৩৬৯ হিজরী সালে যখন সরকারী মাদরাসা চালু করা হয়, তখন তিনি সেখানে ভর্তি হন। অতঃপর বুরায়দা শহরস্থ ফয়সালীয়া ইবতেদায়ী মাদরাসায় ১৩৭১ হিজরী সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এ সময় তাকে ইবতেদায়ী মাদরাসায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর বুরায়দাতে ১৩৭৩ হিজরী সালে যখন ইসলামিক ইন্সটিটিউট খোলা হয়, তখন তিনি তাতে ভর্তি হন। ১৩৭৩ হিজরী সালে তিনি এখানে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি রিয়াদ শহরস্থ কুল্লীয়া শারঈয়া বা শারঈয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৩৮১ হিজরী সালে শিক্ষা সমাপনী ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি একই প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী ফিকাহর উপর এম, এ পাস করেন এবং একই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্ম জীবন

শারঈয়া কলেজ থেকে ডিগ্রী অর্জন করার পর তিনি রিয়াদস্থ ইসলামিক ইন্সটিটিউটে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অতঃপর তাকে শারঈয়া কলেজের শিক্ষক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর তাকে ইসলামী আক্বীদাহ বিভাগের উচ্চতর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অতঃপর তাকে বিচার বিষয়ক উচ্চতর ইন্সটিটিউটে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর তাকে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষে তাকে পুনরায় সেখানে শিক্ষক হিসাবে ফিরে আসেন। অতঃপর তাকে ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য নিয়োগ করা হয়। তিনি এখানো এই পদে বহাল রয়েছেন।

তিনি আরো যেসব সরকারী দায়িত্ব পালন করেন, তার মধ্যে هيئة كبار العلماء এর সদস্য, মক্কা মুকাররামায় অবস্থিত রাবেতার পরিচালনাধীন ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর সদস্য, ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য, হজ্জ মৌসুমে দাঈদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সদস্য এবং রিয়াদ শহরের মালায এলাকার আমীর মুতইব ইবনে আব্দুল আযীয আল-সউদ জামে মসজিদের ইমাম, খতীব ও শিক্ষক। তিনি সৌদি আরব রেডিওতে نور على الدرب নামক প্রোগ্রামে শ্রোতাদের প্রশ্নের নিয়মিত উত্তর প্রদান করেন।

এ ছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, গবেষণা, অধ্যায়ন, পুস্তিকা রচনা, ফতোয়া প্রদান করাসহ বিভিন্নভাবে ইলম চর্চা অব্যাহত রখেছেন। এগুলো একত্র করে কতিপয় পুস্তকও রচনা করা হয়েছে। তিনি মাস্টার্স ও ডক্টরেক ডিগ্রী অর্জনার্থী অনেক ছাত্রের গবেষণা কর্মে তত্বাবধায়ন করেছেন।

শাইখের উস্তাদবৃন্দ

১) মান্যবর শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে সা'দী

২) শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায

৩) আব্দুল্লাহ ইবনে হুমায়েদ

৪) শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন শানকিতী

৫) শাইখ আব্দুর রায্যাক আফীফী

৬) শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুর রাহমান আস-সুকাইতী

৬) শাইখ সালেহ ইবনে ইবরাহীম আল-বুলাইহী

৭) শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সুবাইল

৮) শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ আলখুলাইফী

৯) শাইখ ইবরাহীম ইবনে উবাইদ আল-আব্দ আল-মুহসিন

১০) শাইখ হামুদ ইবনে উকালা আশ শুআইবী

১১) শাইখ সালেহ আল-ইল্লী আন্ নাসের

এ ছাড়াও আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ধার্মিক শাইখের কাছ থেকে হাদীছ, তাফসীর এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন।

শাইখের ছাত্রগণ

১) শাইখ ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল-সাদহান

২) শাইখ আলী ইবনে আব্দুর রাহমান আশ শিবিল

৩) শাইখ সাগীর ইবনে ফালেহ আলসাগীর

৪) শাইখ ইউসুফ ইবনে সা'দ আলজারীদ

৫) শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামাদ আল-উসাইমী

৬) শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামাদ আলউসাইমী

৭) মাসজিদুল হারামের ইমাম শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে সুদাইস

৮) মসজিদে নববীর ইমাম শাইখ আব্দুল মুহসিন আল কাসিম

৯) শাইখ সালেহ ইবনে ইবরাহীম আলুস-শাইখ

১০) শাইখ আয্যাম মুহাম্মাদ আল শুআইর

এ ছাড়াও তার অনেক ছাত্র রয়েছে। তারা নিয়মিত তার মজলিসে এবং নিয়মিত দারসগুলোতে অংশ গ্রহণ করতেন।

শাইখের ইলমী খেদমত

লেখালেখির কাজে রয়েছে শাইখের অনেক খেদমত। তার মধ্য থেকে নিম্নে কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো।

১) **التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية** এটি ইলমে ফারায়েযের উপর রচিত শাইখের একটি কিতাব। এটি ছিল মাস্টার্স পর্বে তার গবেষণার বিষয়। বইটি এক খন্ডে ছাপানো হয়েছে।

২) **أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية** ইসলামী শরী'আতে খাদ্যদ্রব্যের বিধিবিধান।

৩) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد এটি বক্ষমান গ্রন্থ। আমরা এর বাংলা নাম দিয়েছি **ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী**। **মাকতাবাতুস সুন্নাহ** কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

৪) شرح العقيدة الواسطية আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম ইমাম শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার আল আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বীয়ার ব্যাখ্যা **"শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া"** এটি। **মাকতাবাতুস সুন্নাহ** কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

৫) البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب এটি একটি বড় মাপের কিতাব। এতে তিনি বিভিন্ন কিতাবের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন।

৬) مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة আক্বীদা ও দাওয়া বিষয়ে শাইখের বিভিন্ন লেকচার এখানে জমা করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

৭) الخطب المنبرية في المناسبات العصرية যুগোপযোগী অনেক বিষয়কে একত্র করে জুমআর খুৎবা হিসাবে লিখা হয়েছে। এটি দু'খণ্ডে ছাপানো হয়েছে।

৮) ইসলামের সংস্কারক ইমামগণ

৯) বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা

১০) বিদ'আত থেকে সাবধান। বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

১১) مجموع فتاوى في العقيدة والفقه ফতোয়া ও আক্বীদা বিষয়ক সংকলন

১২) شرح كتاب التوحيد– للإمام محمد بن عبد الوهاب এটি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহর লিখিত কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যা।

১৩) الملخص الفقهي ফিকাহর উপর লিখিত শাইখের এটি একটি বিশাল কিতাব।

১৪) إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان রমাদ্বান মাসের জন্য খাস করে অনেকগুলো দারস এখানে জমা করা হয়েছে।

১৫) হাজ্জ ও উমরাহকারীর জন্য যা করণীয়

১৬) কিতাবুত তাওহীদ **كتاب التوحيد**। এটি সৌদি আরবের স্কুলসমূহে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে।

১৭) কিতাবুদ দাওয়া

১৮) রমাদ্বানুল মুবারকের মজলিস

১৯) **عقيدة التوحيد** আক্বীদাতুত তাওহীদ। **মাকতাবাতুস সুন্নাহ** কর্তৃক বাংলায় অনুদিত এ বইটি।

২০) **كشف الشبهات** এর ব্যাখ্যা।

২১) যাদুল মুসতাকনি

২২) **الملخص في شرح كتاب التوحيد** এটি কিতাবুত্ তাওহীদের ব্যাখ্যা।

২৩) **شرح مسائل الجاهلية** এটি জাহেলী যুগের অনেক শিরক, কুফর এবং কুসংস্কারের প্রতিবাদে লিখিত হয়েছে। এটি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহ এর লিখিত মাসাঈলিল জাহিলিয়াহ নামক পুস্তিকার ব্যাখ্যা **“শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ”**। **মাকতাবাতুস সুন্নাহ** কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

২৪) **حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي** নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবস উপলক্ষে মীলাদ উদ্‌যাপন করা।

২৫) **الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة** ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান এবং মানব জীবনে তার প্রভাব।

২৬) **مجمل عقيدة السلف الصالح** সালাফদের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

২৭) **حقيقة التصوف** সুফীবাদের হাকীকত।

২৮) **من مشكلات الشباب** যুবকদের সমস্যা

২৯) **وجوب التحاكم إلى ما أنزله الله** আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার-ফায়ছালা করা ফরয

৩০) من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা

৩১) دور المرأة في تربية الأسرة পরিবার পরিচালনায় নারীর ভূমিকা

৩২) معنى لا إله إلا الله লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ব্যাখ্যা

৩৩) شرح نواقض الإسلام ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা

৩৪) التوحيد في القران কুরআনুল কারীমে তাওহীদ

৩৫) سلسلة وصايا وتوجيهات للشباب ١–٤ যুবকদের জন্য কতিপয় উপদেশ ও নির্দেশনা সিরিজ ১-৪

শাইখের প্রশংসায় বিভিন্ন আলিমের মন্তব্য

সৌদি আরবে যে সব বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ আলিম এখনো জীবিত আছেন, তাদের মধ্যে শাইখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, শাইখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার পরে আমরা কার কাছে দীনের বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো? জবাবে ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ বললেন, আপনারা সালেহ ফাওযান জিজ্ঞসা করবেন। এমনি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল-উছাইমীন রহিমাহুল্লাহকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা আপনার পরে কাকে জিজ্ঞাসা করবো? তিনি জবাব দিলেন যে, আপনারা সালিহ ফাওযানকে জিজ্ঞাসা করবেন। কেননা তিনি একজন ফকীহ এবং ধার্মিক। শাইখ ইবনে গুদাইয়্যান প্রায়ই বলতেন, আপনারা দীনের ব্যাপারে শাইখ সালেহ ফাওযানকে জিজ্ঞাসা করবেন। আল্লাহ যেন তার আনুগত্যের উপর তার বয়স বৃদ্ধি করেন, তার শেষ পরিণাম যেন ভালো করেন এবং যেন হকের উপর তাকে টিকিয়ে রাখেন।

আমরা শাইখের জন্য দু'আ করি, তিনি যেন তার হায়াতে বরকত দান করেন এবং দীনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তা যেন কবুল করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

গ্রন্থকারের ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালন কর্তা। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার এবং সকল সাথীগণের উপর।

অতঃপর এটি তাওহীদ বিষয়ক একটি কিতাব। এটি লিখার সময় আমি সংক্ষিপ্ততা ও সরলতার প্রতি খেয়াল রেখেছি। আমাদের বিজ্ঞ আলিমগণের বিভিন্ন মূল কিতাবাদি থেকে তা চয়ন করেছি।

বিশেষতঃ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ, আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম, শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহুম এবং তার দাওয়াতের বরকতে গড়ে উঠা বিজ্ঞ ছাত্রদের কিতাবাদি থেকে এ কিতাবটি রচনা করেছি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী আক্বীদার জ্ঞান এমন মূল বিদ্যা যার শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ও তদনুযায়ী আমল করার প্রতি ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া জরুরী, যাতে আমলসমূহ সঠিক, আল্লাহর নিকট গৃহিত এবং আমলকারীর জন্য উপকারী হয়।

আক্বীদার বিষয়টি বর্তমানে বেশী গুরুত্ব সহকারে পড়া ও তদনুযায়ী আমল করা দরকার। কারণ, আমরা এমন এক সময়ে অবস্থান করছি যখন বিপথগামী স্রোতের ধারা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- নাস্তিকতা, সূফী ও বৈরাগ্যবাদ, কবর পূজা এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত হিদায়াত বিরোধী বিদ‘আত ইত্যাদী।

মুসলিম কুরআন-সুন্নাহ ও সালফে সালিহীনের সঠিক পথের উপর নির্ভরশীল বিশুদ্ধ আক্বীদার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দৃঢ়পদ না হলে ঐ সকল ভ্রষ্টতার স্রোতে পতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এটাই মুসলিম সন্তানদেরকে মূল উৎস হতে বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা দেয়ার গুরুত্ব বহন করছে।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের নাবী মুহম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার এবং সকল সাথীবর্গের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষন করুন। আমীন।

প্রথম অধ্যায়

مدخل لدراسة العقيدة

আক্বীদা পাঠের প্রারম্ভিক কথা

১ম পরিচ্ছেদ

معنى العقيدة، وبيان أهميتها؛ باعتبارها أساسًا يقوم عليه بناء الدين

আক্বীদার সংজ্ঞা, দীনের ভিত্তিসমূহ আক্বীদার উপর স্থাপিত হওয়ার দিক দিয়ে এর গুরুত্ব।

২য় পরিচ্ছেদ

مصادر العقيدة الصحيحة، ومنهج السَّلف في تلقيها

ছ্বহীহ আক্বীদার উৎস এবং তা গ্রহণে সালফে সালিহীনগণের নীতি।

৩য় পরিচ্ছেদ

الانحرافُ عن العقيدة، وسُبلُ التّوقِّي منه

ছ্বহীহ আক্বীদা হতে পদস্খলন এবং তা হতে বাঁচার উপায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

في بيان العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساسًا يقوم عليه بناء الدين

আক্বীদার সংজ্ঞা, দীনের ভিত্তিসমূহ আক্বীদার উপর স্থাপিত হওয়ার দিক দিয়ে তার গুরুত্ব

আক্বীদার আভিধানিক সংজ্ঞা: আক্বীদা শব্দটি আরবী **العَقْدُ** (আল আক্বদু) শব্দ হতে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ: কোন কিছুকে বাঁধা বা গিরা দেয়া। আরবীতে বলা হয়: (ই'তাক্বাদ্‌তু কাযা) যার অর্থ- আমি এ বিষয়ের উপর আমার হৃদয় ও অন্তরকে বেঁধেছি। অপর দিকে মানুষের দীনকে আক্বীদা বলা হয়। বলা হয় (লাহু আক্বীদাতুন হাসানাতুন) তার আক্বীদা ভালো তথা সন্দেহ থেকে মুক্ত। আক্বীদা হলো আন্তরিক ইবাদত। আর তা হলো হৃদয় দিয়ে কোন বিষয়ের প্রতি ঈমান নিয়ে আসা এবং তা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় আক্বীদার সংজ্ঞা: আল্লাহ তা'আলা, তার ফেরেশতাগণ, তার আসমানী কিতাবসমূহ, তার প্রেরিত রসূলগণ (আলাইহিমুস্ সলাতু ওয়াস্-সালাম), শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় আক্বীদা বলা হয়। এগুলোকে আরকানুল ঈমান বা ঈমানের ভিত্তিও বলা হয়।

ইসলামী শরী'আত দু'ভাগে বিভক্ত:

১। আক্বীদা তথা বিশ্বাসগত বিষয়

২। আমল তথা বাস্তব কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়।

আক্বীদাগত: এটা ঐ সকল বিষয় যা আমল বা কর্মপদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত নয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলা আমাদের রব এবং তার ইবাদত করা আবশ্যক এ বিশ্বাস রাখা। এছাড়াও উল্লিখিত ঈমানের অন্যান্য রুকন বা ভিত্তিসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এগুলোকে আসলি বা মূল বিষয়ও বলা হয়।

আমলগত বিষয়: এটা ঐ সকল বিষয় যা আমল বা কর্মপদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন: ছ্বলাত, যাকাত, সিয়াম এবং অনান্য সকল আমলগত বিষয়ের বিধিবিধান। এগুলোকে ফারঈ বা শাখা মাস'আলাও বলা হয়। কেননা, এগুলোর বিশুদ্ধতা আক্বীদা ছ্বহীহ হওয়ার উপর নির্ভরশীল।

বিশুদ্ধ আক্বীদা সেই ভিত্তি যার উপর দীন প্রতিষ্ঠিত। আর এর মাধ্যমেই আমল বিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]

অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। *(সূরা আল্ কাহ্ফ ১৮: ১১০)*

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: ٦٥]

আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। *(সূরা আয্ যুমার ৩৯: ৬৫)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزمر: ٢، ٣]

অতএব, আপনি ইখলাস বা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্তে। *(সূরা আয্ যুমার ৩৯: ২-৩)*

এ আয়াতগুলো এবং অনুরূপ আরো অনেক আয়াত প্রমাণ করে যে, শিরক মুক্ত না হলে কোন আমলই আল্লাহর দরবারে গৃহিত হয় না। আর এ জন্য সকল নাবী ও রসূলগণ আলাইহিমুস্ সালাম প্রথমেই আক্বীদা বিশুদ্ধ করণের দাওয়াত দিয়েছেন। তারা প্রথমে স্বীয় উম্মাতদিগকে এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত ত্যাগ করার দাওয়াত দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦]

আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বগূত বর্জন কর। *সূরা আন্ নাহ্ল ১৬: ৩৬।*

প্রত্যেক রসূলগণও তাদের উম্মাতদেরকে সর্বপ্রথম এ বলেই সম্বোধন করেছেন:

{اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: ٥٩، ٦٥، ٧٣، ٨٥]

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন দ্বিতীয় ইলাহ নেই। *সুরা আল্ আ'রাফ ৭: ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫।*

- নূহ, হুদ, সালিহ, শুআ'ইব এবং সকল নাবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম স্বীয় উম্মাতদেরকে একই কথা বলেছেন।
- নবুঅত প্রাপ্তির পর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তেরটি বছর তাওহীদ ও আক্বীদা বিশুদ্ধ করণের প্রতি মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। কেননা, এ তাওহীদই হলো মূলবিষয় যার উপর দীনের ভিত্তিসমূহ স্থাপিত।
- দাঈ এবং ন্যায়পন্থীগণ যুগে যুগে নাবী ও রসূলদের পথেরই অনুসরণ করেছেন। তারা শুরুতেই তাওহীদ ও আক্বীদা বিশুদ্ধকরণের দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর পর্যায়ক্রমে দীনের অন্যান্য বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

في بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف في تلقيها

ছ্বহীহ আক্বীদার উৎস ও তা গ্রহণে সালফে সালেহীনগণের নীতি

আক্বীদা তাওক্বীফী বিষয় (আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথায় সীমাবদ্ধ)। অতএব শরী'আত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে প্রমাণ না পাওয়া গেলে তা সাব্যস্ত হবে না। এখানে ব্যক্তি মতামত ও ইজতিহাদের কোন স্থান নেই। সঙ্গত কারণেই আক্বীদার মূল উৎস হলো কুরআন ও ছ্বহীহ সুন্নাহ। কেননা আল্লাহ তা'আলা, তার জন্য ওয়াজিব বিষয়াবলি এবং যে সকল বিষয় থেকে তাকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করতে হবে সে সম্পর্কে আল্লাহর চেয়ে বেশী কেউ জানে না। আর আল্লাহর পরে এ বিষয়াবলি সম্পর্কে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কেউ বেশী জ্ঞান রাখে না। এজন্য সালফে সালিহীন এবং তাদের অনুসারীগণের নীতি হলো কেবল মাত্র কুরআন ও সুন্নাহ বা হাদীস থেকেই আক্বীদা গ্রহণ করতে হবে।

কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহর ক্ষেত্রে যা বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান রাখেন, সে অনুযায়ী আক্বীদা পোষণ করতঃ আমল করেন। আর আল্লাহর ক্ষেত্রে কুরআন হাদীছে যা উল্লেখ করা হয়নি তা থেকে আল্লাহকে মুক্ত মনে করতঃ তা পরিত্যাগ করেন। এজন্য আক্বীদা বিষয়ে তাদের মাঝে কোন মত বিরোধের সৃষ্টি হয়নি। বরং তাদের সকলের আক্বীদা ও জামা'আত এক ছিল। কারণ যারা কুরআন ও হাদীছকে মজবুতভাবে ধারণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাদের একতা, আক্বীদার বিশুদ্ধতা এবং একক নীতিমালা হওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: ١٠٣]

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ কর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না। ***সূরা আলে ইমরান ৩: ১০৩।***

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى} [طه: ٢٣]

যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়েত আসে, তখন যে আমার পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ঠ হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না *সূরা ত্ব-হা ২০: ১২৩।*

এ জন্য তারা ফিরকাতুন নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য নাজাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, তার উম্মাত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সকল দলই জাহান্নামে যাবে।

এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي

সে দলটি হলো আজ আমি এবং আমার ছাহাবাগণ যে পথের উপর আছি তার পথিকগণ।[১]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। কিছু মানুষ যখন কুরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে গ্রীকদের নিকট হতে ধার করা ইলমুল কালাম বা তর্কবিদ্যা ও ইলমে মানতিক বা যুক্তিবিদ্যার উপর আক্বীদার ভিত্তি স্থাপন করেছে, তখনি আক্বীদার ক্ষেত্রে পদস্খলন ও বিভক্তি শুরু হয়েছে। যার দরুন ইসলামী একতা নষ্ট ও দলা-দলির সৃষ্টি হয়ে ইসলামী সমাজ গঠন প্রক্রিয়া ভেস্তে গেছে।

---

১. হাসানঃ তিরমিযী ২৬৪১, মুসতাদরাক হাকীম ৪৪৪, মুসনাদে আহমাদ। ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

في بيان الانحرافِ عن العقيدة وسبل التوقي منه

সঠিক আক্বীদা হতে পদস্খলন এবং তা হতে বাঁচার উপায়

ছ্বহীহ আক্বীদা হতে পদস্খলনে ধ্বংস ও ক্ষতি অনিবার্য। কেননা ছ্বহীহ আক্বীদাই উপকারী আমলের প্রতি মানুষের প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি করে। আর ছ্বহীহ আক্বীদা ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির সন্দেহ ও সংশয়ের খপ্পরে পড়া স্বাভাবিক, যা কখনো পাহাড়ের আকার ধারণ করতে পারে। ফলে ছ্বহীহ আক্বীদাবিহীন ব্যক্তি সুখী জীবনের চিন্তাধারা থেকেই বঞ্চিত হয়। এমনকি তার জীবন এত সংকীর্ণ হয় যে, এ সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার মাধ্যমে হলেও নিজের জীবন শেষ করে দিতে চায়। ছ্বহীহ আক্বীদাবিহীন অনেক ব্যক্তিকেই আমরা এরূপ করতে দেখি।

যে সমাজ ছ্বহীহ আক্বীদা দ্বারা পরিচালিত হয় না, তা পশুর সমাজের ন্যায়। প্রকৃত সুখী জীবনের যাবতীয় উপাদান ও উপকরণ তাতে থাকে না। যদিও তারা অঢেল সহায়-সম্পত্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হোক না কেন? বরং তাদের এ অর্থ অনেক সময় তাদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। যেমন, কাফির ও অনৈসলামিক সমাজের বর্তমান অবস্থা। কেননা, এ সকল ঐশ্বর্য হতে উপকার গ্রহণ ও অনাবিল উপভোগের জন্য চাই সঠিক ও নির্ভুল দিক নির্দেশনা। আর তাওহীদি আক্বীদা ব্যতীত অন্য কিছুতে তা লাভ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: ٥١]

হে রসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করো এবং সৎকাজ করো। *সূরা মুমিনূন ২৩: ৫১।*

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا

نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: ١٠– ١٣]

আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তার জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম এবং তাকে আমি বলে ছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি। আর আমি সোলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির-শাস্তি আস্বাদন করাব। তারা সোলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ- করত। হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ। *সূরা সাবা ৩৪: ১০-১৩।*

আক্বীদা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থাকা আবশ্যক। যদি আক্বীদা হতে অর্থনীতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে অর্থনৈতিক শক্তি সমাজ ধ্বংস ও পদস্খলনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটি অনৈসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে দেখা যায়। তারা অর্থের মালিক ঠিক কিন্তু ছ্বহীহ আক্বীদায় বিশ্বাসী নয়।

সঠিক আক্বীদা হতে বিচ্যুত হওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে যা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিম্নরূপ:

১। সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে অজ্ঞতা: তার শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বা তার প্রতি গুরুত্ব কম দেয়ার কারণে। এমনকি পরবর্তীতে এমন এক প্রজন্ম আসবে যারা বাপ-দাদার আক্বীদা এবং তার পরিপন্থী বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানে না। ফলে এরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে বসে। যেমন- উমার ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إنما تُنقضُ عُرى الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في الإسلام من لا يعرفُ الجاهلية

যখন ইসলামে জাহিলিয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের আবির্ভাব ঘটবে তখন ইসলামের বন্ধন (রশি) একটা একটা করে ছিড়ে যাবে।

২। বাতিল জানার পরও বাপ দাদার ভ্রান্ত আক্বীদা বা মতামতকে গোঁড়ামী বশতঃ আঁকড়ে থাকা: ফলে বিপরীত বিষয়গুলো সত্য হলেও তা ত্যাগ করা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [البقرة: ١٧٠]

আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে বিধানেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে- কক্ষনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদি ও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। *সূরা আল্ বাক্বারা ২: ১৭০।*

৩। দলীল এবং বিশুদ্ধতা না জেনেই আক্বীদার ক্ষেত্রে অন্ধভাবে মানুষের কথা গ্রহণ করা: যেমন ছুহীহ আক্বীদা বিরোধী জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশা'ইরা, সূফীয়া এবং অন্যান্য পথভ্রষ্ট দলের অবস্থা। তারা নিজেদের হৃদয়ে ভ্রষ্ট ইমামদেরকে স্থান করে দেয়ার ফলে নিজেরা ভ্রষ্ট হয়ে সঠিক আক্বীদা হতে বিচ্যুত হয়েছে।

৪। অলী এবং সৎ ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে বাড়া-বাড়ি করা: যোগ্যতার চেয়ে তাদেরকে অধিক সম্মান করা। এমনকি তাদের ক্ষেত্রে উপকার করা ও ক্ষতি প্রতিহত করার বিশ্বাস রাখা যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ করতে পারে না। প্রয়োজন পূরণ এবং দু'আ কবুলের জন্য আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মাঝে তাদেরকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে গ্রহণ করা। এমনকি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত এবং তাদের কবরের নিকটে জীব জন্তু জবাই করা, নযর-মানত করা, প্রার্থনা করা এবং সাহায্য সহযোগিতা চাওয়ার মাধ্যমে তাদের নৈকট্য লাভ করা শুরু হয়েছে। নূহ আলাইহিস সালাম এর কওমের সৎ ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছিল যখন তারা বলেছিল,

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: ٢٣﴾

তারা বলল: তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ কর না এবং ত্যাগ কর না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। *সূরা নূহ্ ৭১: ২৩।* বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রে কবর পূজারিদেরও একই অবস্থা।

৫। আল্লাহর কুরআনে এবং সৃষ্টিজগতে ছড়িয়ে থাকা তার নিদর্শনগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা থেকে গাফিল বা উদাসীন থাকা: আল্লাহ প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ নিয়ে গর্ব-অহংকার করা। এমনকি এ সমস্ত লোকেরা এ ধারণা পোষণ করে যে, অর্থের পিছনে একমাত্র মানুষের অবদান রয়েছে। ফলে তারা মানুষকে সম্মান করতঃ এ সকল নিয়ামতকে মানুষের দিকে সম্পর্কিত করতে শুরু করে। যেমন কারূন ইতিপূর্বে বলেছিল,

{قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي} [القصص: ٧٨]

সে বলল, আমি এগুলো আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। *সূরা আল্ ক্বাসাস ২৮: ৭৮।* যেমন মানুষ বলে,

{هَذَا لِي} [فصلت: ٥٠]

এটা আমার বা আমারই যোগ্যতা বলে পেয়েছি। *সূরা ফুসসিলাত ৪১: ৫০।* মানুষ আরো বলে,

{إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ} [الزمر: ٤٩]

মানুষ বলে আমি আমার জ্ঞান দ্বারা এ সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছি। *সূরা আয্ যুমার ৩৯: ৪৯।* অথচ মানুষ এসকল বস্তুর সৃষ্টি কর্তা, বিশেষ চাক-চিক্যদানকারী, মানুষের অস্তিত্ব দাতা, বিভিন্ন জিনিস তৈরীতে মানুষকে শক্তি দাতা এবং তার মাধ্যমে উপকার গ্রহণের তৌফীক্ব দাতার বড়ত্ব ও মহত্বের দিকে চিন্তা করে দেখে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: ٩٦]

আল্লাহ তোমাদিগকে এবং তোমরা যা কর তার সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। *সূরা সফ্ফাত ৩৭: ৯৬।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} [الأعراف: ١٨٥]

তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে এবং যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'আলা বস্তু সামগ্রী থেকে। *সূরা আল্ আ'রাফ ৭: ১৮৫।*

{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم: ٣٢– ٣٤]

তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তার আদেশে সমুদ্রে চলা ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবসকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছো, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ। *সূরা ইবরাহীম ১৪:৩২-৩৪।*

৬। অধিকাংশ পরিবারই আজ সঠিক দিক নির্দেশনা শূন্য: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

প্রত্যেকটি সন্তান ইসলামী স্বভাবজাত ধর্মের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী অথবা খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।[২]

অতএব, বুঝা গেল সন্তানদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার বড় ভূমিকা রয়েছে।

৭। অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহে শিক্ষা এবং প্রচার মাধ্যমসমূহ তার যথাযথ দায়িত্ব পালন না করা: শিক্ষা পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় দিককে বেশী বা একেবারেই গুরুত্ব দেয়া হয় না। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলো (রেডিও, টেলিভিশন, পত্র পত্রিকা) বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সমাজ ধ্বংস এবং পদস্খলনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথবা প্রচার মাধ্যমগুলো অর্থনৈতিক ও বিনোদনমূলক বিষয়গুলোকেই বেশী

---

২. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৮৫।

গুরুত্ব দিচ্ছে। অপর দিকে চরিত্র ঠিক করা, বিশুদ্ধ আক্বীদা গঠন এবং বিপথগামী স্রোতধারা প্রতিরোধে কোন গুরুত্বই দেয় না। যাতে নিরস্ত্র ও অরক্ষিত এমন এক জাতি তৈরী হয়, নাস্তিক্যবাদী সৈন্যদের সামনে যাদের কোন শক্তিই থাকবে না।

এ সকল পদস্খলন থেকে বাঁচার উপায়

১। ছ্বহীহ আক্বীদা গ্রহণের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসা: যেমন সালফে সালিহীনগণ এ দু'স্থান হতে তাদের আক্বীদা গ্রহণ করতেন। এ উম্মাতের প্রথম যুগের লোকেরা যা দিয়ে কল্যাণ লাভ করেছেন তা ব্যতীত শেষ যুগের লোকদেরও কল্যাণ লাভ হতে পারে না। সে সাথে পদস্খলিত দলসমূহের আক্বীদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। প্রতিবাদ ও পদস্খলন থেকে বাঁচার জন্য এসকল দলের সংশয়গুলো জানতে হবে। কেননা যে ব্যক্তি মন্দ সম্পর্কে জানে না সে ব্যক্তি মন্দের শিকার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

২। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে ছ্বহীহ আক্বীদা তথা সালফে সালিহীনগণের আক্বীদা শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিটি শ্রেণীতেও পর্যাপ্ত পরিমাণ আক্বীদার পাঠদান রাখতে হবে। পরীক্ষার সময়েও এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৩। পাঠ্যসূচি নির্ধারণ: নির্ভরযোগ্য সালাফী আলিমগণের বিশুদ্ধ কিতাবগুলোকে পাঠ্যসূচি হিসাবে গ্রহণ করা। আর সূফী, বিদ'আতী, জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশা'ইরা, মাতুরিদীয়্যাহ ও অন্যান্য পদস্খলিত দলসমূহের কিতাবাদি থেকে দূরে থাকতে হবে। তবে তাদের কিতাবসমূহে যে বাতিল আক্বীদা ও আমল রয়েছে তা জেনে তার প্রতিবাদ করা ও তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এ সকল বাতিলপন্থীদের কিতাবাদি পড়াতে কোন অসুবিধা নেই।

৪। দাঈ (আল্লাহর পথে আহব্বানকারী) নিয়োগ: কিছু ন্যায়পরায়ণ দাঈগণকে মানুষের সামনে সালাফগণের আক্বীদা তুলে ধরার জন্য কাজ করতে হবে। সে সাথে তারা ছ্বহীহ আক্বীদা হতে বিচ্যুত দলগুলোর ভ্রষ্টতাকে দূর করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

في بيان معنى التوحيد وأنواعه

তাওহীদের অর্থ ও তার প্রকারভেদ

তাওহীদের সংজ্ঞা: সৃষ্টি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা। একনিষ্ঠভাবে সকল ইবাদত কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য করা। তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত ত্যাগ করা। আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ এবং সু-উচ্চ গুণাবলীকে তার জন্য সাব্যস্ত করা। দোষ ত্রুটি হতে আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র ও মুক্ত বলে ঘোষণা দেয়া।

এ সংজ্ঞায় তিন প্রকার তাওহীদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার বর্ণনা নিম্নরূপ:

১। توحيد الربوبية বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব।

নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদ সমূহে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: তাওহীদে রুবুবিয়্যার সংজ্ঞা, সকল আদম সন্তান এ প্রকার তাওহীদের স্বভাবজাত ধর্মের উপর জন্ম গ্রহণ করে। মুশরিকরাও তাওহীদে রুবুবিয়্যাহকে স্বীকার করতো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে "রব্" শব্দের ব্যাখ্যা। তাওহীদে রুবুবিয়্যাহর ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলোর ধ্যাণ ধারণা এবং তার প্রতিবাদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: রিযিক্ব, সৃষ্টি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব সাব্যস্তে কুরআনের নীতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ তাওহীদে উলুহিয়্যাহকে আবশ্যক করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

في بيان معنى توحيد الربوبية وإقرار المشركين به

তাওহীদে রুবুবিয়্যার সংজ্ঞা এবং এর প্রতি মুশরিকদের স্বীকারোক্তি

তাওহীদের সংজ্ঞাঃ ব্যাপক অর্থে তাওহীদ হলো প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হওয়া, একনিষ্ঠভাবে সকল ইবাদত কেবল মাত্র তার জন্য করা এবং আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলীকে স্বীকার করা।

তাওহীদ তিন প্রকারঃ

১। **توحيد الربوبية** বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব।

২। **توحيد الألوهية** তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব।

৩। **توحيد الأسماء والصفات** বা নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে একত্ব।

প্রত্যেক প্রকারের পৃথক সংজ্ঞা রয়েছে, যা বর্ণনা করা আবশ্যক। যাতে প্রত্যেক প্রকারের মাঝে পার্থক্য ফুটে উঠে।

১। তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ্ঃ আল্লাহর কর্মে তাকে এক বলে জানা ও মানা। এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এক মাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল মাখলুক্বের সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]

আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সূরা আয্ যুমার ৩৯:৬২।

তিনিই সকল মানুষ এবং জন্তুর রিযিক্বদাতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: ٦ ﴾

পৃথিবীতে বিচরণকারী সকল জন্তুর রিযিক্বের দায়িত্ব মহান রব্বুল আলামীনের উপর। *সূরা হুদ **১১**: ৬।*

আল্লাহ তা'আলা হলেন রাজাধিরাজ, পৃথিবীর সকল কিছুর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। নেতৃত্ব দান এবং তা হতে অপসারণের ক্ষমতা একমাত্র তারই। তিনিই ইজ্জত-সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত বা অপমানিত করেন।

তিনি সব কিছু করতে সক্ষম। তিনিই দিন ও রাত্রিকে পরিচালনা করেন। জীবন ও মৃত্যুর মালিকও তিনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [آل عمران: ٢٦، ٢٧]

বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচছা বেহিসাব রিযিক্ব দান কর। সূরা আলে ইমরান ৩:২৬-২৭।

স্বীয় রাজত্ব, রিযিক্ব ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা শরীকানা ও সহযোগীতাকে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর কোন শরীক ও সহযোগী নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

এটা আল্লাহর সৃষ্টি; অতঃপর তিনি ব্যতীত অন্যেরা যা সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও। বরং জালিমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। সূরা লুক্বমান ৩১:১১।

অপর স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾

তিনি যদি রিযিক্ব বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক্ব দিবে? সূরা মুলক ৬৭: ২১।

সকল সৃষ্টিজীবের উপর প্রভুত্বের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা তার একত্বের ঘোষণা দিয়ে বলেন,

{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢]

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের রব। সূরা ফাতিহা **১:২**

তিনি আরো বলেন:

{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: ٥٤]

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র যা স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। *সূরা আল্ 'আরাফ ৭: ৫৪।*

সকল সৃষ্টিজীবকে আল্লাহ তার প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। এমনকি যে সকল মুশরিক ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে তারাও একক ভাবে আল্লাহর প্রভুত্বকে স্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} [المؤمنون: ٨٦- ٨٩]

বল- সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? এখন তারা বলবে, আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? বলো- তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? তখন তারা বলবে- আল্লাহর। বলুন- তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে? (*সূরা আল মুমিনূন ২৩:৮৬-৮৯*)।

আদম সন্তানের প্রসিদ্ধ বা পরিচিত কোন দল এ প্রকার তাওহীদের বিপরীতে যায়নি। বরং প্রত্যেক হৃদয় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন অস্তিত্বমান বস্তুর স্বীকারোক্তির উপর সৃষ্ট হওয়ার চেয়ে এ প্রকার তাওহীদের উপরই বেশী সৃষ্ট।

যেমন রসূলগণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [إبراهيم: ١٠]

তাদের রসূলগণ বলেছিলেন: আল্লাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের স্রষ্টা? (*সূরা ইব্রাহীম ১৪: ১০)।*

যারা রব্ব তথা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকারকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ এবং তার সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তাদের অন্যতম হলো ফির'আউন। সেও গোপনে তথা আত্মিকভাবে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলো।

যেমন, মূসা আ. তাকে বলেছিলেন,

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ ﴾ [الإسراء: ١٠٢﴾

তিনি বললেন: তুমি জান যে, আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। *সূরা বানী ইসরাঈল ১৭: ১০২।*

আল্লাহ তা'আলা ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন,

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤]

তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। *সূরা আন্ নামল ২৭: ১৪।*

কমিউনিস্টদের মধ্যে যারা আজ রব্ব বা প্রভুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তারা মূলতঃ বাহ্যিকভাবে ও অহংকার বশতঃ অস্বীকার করে। আত্মিকভাবে তারা একথা মানতে বাধ্য যে, প্রত্যেক অস্তিত্বমান বস্তুরই একজন অস্তিত্ব দানকারী রয়েছে। সংঙ্গত কারণেই প্রত্যেক সৃষ্টিরও একজন স্রষ্টা রয়েছে। যেমন প্রত্যেক ছাপ বা চিহ্নরই চিহ্নদাতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ} [الطور: ٣٥- ٣٦]

তারা কি আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। (*সূরা আত-তূর ৫২: ৩৫-৩৬)।*

নিম্ন ও উর্ধ্বগমনসহ পৃথিবীর প্রতিটি অংশ নিয়ে চিন্তা করলে তাতে আপনি এসবের তৈরী কারী, স্রষ্টা ও মালিকের সন্ধান ও সাক্ষ্য পাবেন। জ্ঞান ও স্বভাবজাত ধর্মে যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তারা যেন ইলম বা জ্ঞানকেই অস্বীকার করে। এতদুভয়ের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। কারণ, বিশুদ্ধ জ্ঞান স্রষ্টার অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করে। কমিউনিস্টরা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকারের যে ধ্বনী তুলেছে তা মূলতঃ অহংকার বশতঃ এবং এতে জ্ঞান ও বিশুদ্ধ চিন্তা ধারার ফলাফলকে গোপন রাখা হয়েছে। অবস্থা যার এই, বাস্তবে সে নিজের জ্ঞানকে অকার্যকর করে মানুষকে তার নিজের ঠাট্টা বিদ্রুপের প্রতি আহ্বান জানায়।

কবি বলেন:

কিভাবে আল্লাহর বিরোধীতা করা হবে?

অস্বীকারকারী তো তাকে অস্বীকার করে।

প্রতিটি জিনিসে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে।

যা প্রমাণ করে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

مفهومُ كلمةِ الربِّ في القرآن والسُّنَّة وتصوُّرات الأمم الضّالَّة

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রব্ব শব্দের তাৎপর্য এবং ভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের চিন্তা-ধারা

১। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রব্ব শব্দের তাৎপর্য: الرب শব্দটি رب-يرب এর মাসদার (উৎস স্থল)। যার অর্থ হলো, পর্যায় ক্রমে বা ধীরে ধীরে কোন জিনিসকে লালন পালন করে তার পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। আরবীতে বলা হয়: ربه, رباه, وربيه যার অর্থ: সে তাকে (কোন ব্যক্তিকে) লালন পালন করেছে। দেখা যাচ্ছে رب শব্দটি মাসদার হওয়া সত্ত্বেও রূপকভাবে কর্তার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর দিকে الرب (আলিফ লাম সহকারে) শব্দটি সকল অস্তিত্বশীল বস্তুর দায়িত্বশীল আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢]

সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। *সূরা আল্ ফাতিহা ১: ২।*

{رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ} [الشعراء: ٢٦]

তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা। *সূরা আশ্ শুআরা ২৬:২৬।*

রব্ব (رب) শব্দটি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে মুযাফ তথা সম্বন্ধ যুক্ত ও সীমিত করণ ব্যতীত ব্যবহার করা যাবে না। যেমন: **رب الدار, رب الفرس** অর্থাৎ ঘোড়া বা বাড়ির মালিক।

আর এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহর ঐ বাণী যা তিনি ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন:

{اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ} [يوسف: ٤٢]

(যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ আ. বলে দিলেন) **আপন মালিকের কাছে আমার আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে মালিকের কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল।** *সূরা ইউসুফ ১২:৪২।*

অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

{قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ} [يوسف: ٥٠]

(যখন ইউসুফ আ. এর নিকটে দূত আসল) তখন তিনি বললেন: ফিরে যাও তোমাদের মালিকের কাছে। *সূরা ইউসুফ ১২: ৫০।* আরেক আয়াতে বলা হয়েছে:

{أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا} [يوسف: ٤١]

তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে। *সূরা ইউসুফ ১২:৪১।*

আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উট হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলেছেন: **(حتى يجدها ربها)** অর্থ: যতক্ষণ তার মালিক তাকে না পায়।[৩]

এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রব্ব শব্দটি আল্লাহর ক্ষেত্রে معرف (আলিফ লাম যুক্ত) এবং مضاف (সম্বন্ধ যুক্ত) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়: **الرب** (আর্ রব্বু) বা **رب العالمين** (রব্বুল আলামীন) বা **رب الناس** (রব্বুন্নাস)। রব্ব শব্দটি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে সম্বন্ধ যুক্ত ছাড়া ব্যবহৃত হয় না। যেমন: **رب الدار** (ঘরের মালিক), **رب المنزل** (বাড়ির মালিক), **رب الإبل** (উটের মালিক)।

রব্বুল আলামীনের অর্থ: আল্লাহ তা'আলা হলেন সমগ্র জগতের স্রষ্টা, মালিক, কল্যাণ দাতা। তিনিই রসূল পাঠানো, আসমানী কিতাবাদী নাযিল ও নানাবিধ স্বীয় নিয়ামত দিয়ে তাদেরকে লালন পালনকারী। তিনি মানুষদেরকে নিজেদের কর্মের প্রতিফল দান করবেন।

ইবনে ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন: রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বের চাহিদা হলো- বান্দাদেরকে ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে নিষেধ করা। সৎকর্মশীলদেরকে ভাল এবং মন্দ কর্মশীলদেরকে খারাপ প্রতিদান দেয়া।[৪]

---

৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫২৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭২২।
৪. মাদারিজুস্ সালিকীন ১/৮।

২। পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের নিকটে রব্ব শব্দের অর্থ: আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতকে তার একত্বের স্বভাবজাত ধর্ম এবং স্রষ্টাকে জানার জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠]

তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। *সূরা আর্ রুম ৩০: ৩০।* আল্লাহ তা'আলা আরা বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢]

আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। *সূরা আল্ আ'রাফ ৭: ১৭২।*

অতএব, আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্বকে স্বীকার করা এবং তার অভিমুখী হওয়া স্বভাবজাত বিষয়। অপরদিকে শিরক বহিরাগত নতুন বিষয়।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

প্রত্যেকটি শিশু ইসলামী স্বভাবজাত ধর্মের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা মাতা তাকে ইয়াহূদী অথবা খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।[৫]

তাই কোন বান্দা ও তার স্বভাবজাত ধর্ম বা চরিত্রকে একাকী ছেড়ে দেয়া হলে তাওহীদ মুখীই হবে এবং আসমানী কিতাবসহ আনীত রসূলগণের দাওয়াতকে গ্রহণ করবে।

৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৮৫।

দুনিয়াবী নিদর্শনসমুহও এর উপর প্রমাণ বহন করে। কিন্তু বিপথগামী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নাস্তিক্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা নবজাতকের দিক পরিবর্তন করে। সঙ্গত কারণেই ভ্রষ্টতা ও বিপথগামীতায় সন্তানেরা তাদের পিতা মাতার অনুসরণ করে।

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ

আমি আমার বান্দাদের সকলকে একনিষ্ঠ তাওহীদপন্থী করে সৃষ্টি করেছি। শয়তান এসে তাদেরকে তাদের দীন থেকে বিমুখ করেছে।[৬]

কিন্তু শয়তান তাদের নিকটে এসে তাদেরকে তাদের দীন হতে টেনে বিপথে নিয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত বহু মাবূদ গ্রহণের দিকে ধাবিত করেছে।[৭]

ফলে মানুষ ভ্রষ্টতা, মতিভ্রম, দলাদলী ও মতবিরোধে লিপ্ত হয়। প্রত্যেকেই আলাদা মাবূদ গ্রহণ করে তার ইবাদত করা শুরু করে। কেননা, যখন তারা সত্যিকার এক মাবূদকে পরিত্যাগ করে তখন বিভিন্ন বাতিল মাবূদের ফিৎনা বা পরীক্ষায় পতিত হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ}[يونس: ٣٢]

অতএব, এ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) গোমরাহী ছাড়া কি রয়েছে? *সূরা ইউনূস ১০: ৩২।*

গোমরাহী বা ভ্রষ্টতার কোন সীমা ও শেষ নেই। যে নিজের সত্য মাবূদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে অবশ্যই ঐ গোমরাহীতে পতিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [يوسف: ٣٩، ٤٠]

হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতকগুলো নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। ***সূরা ইউসূফ ১২: ৩৯-৪০।***

৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬৫।
৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬৫।

একই গুণ ও কর্মের অধিকারী দু'জন স্রষ্টা সাব্যস্তের মাধ্যমে আল্লাহর প্রভুত্বে শিরক করা অসম্ভব ব্যাপার। অনেক মুশরিক ধারণা করে যে, দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের মনগড়া মাবূদগুলোরও কিছু হাত রয়েছে। এসকল বাতিল মাবূদের ইবাদতের ব্যাপারে শয়তান তাদের সাথে খেল-তামাশা করে। প্রত্যেক কওমের সাথে শয়তান তাদের জ্ঞান অনুযায়ী খেলা করে। মৃত ব্যক্তিদেরকে সম্মান করার পথ ধরে এক দলকে ঐ মৃত ব্যক্তিদের ইবাদত করার প্রতি আহ্বান করেছে। এরা ঐ সমস্ত লোক যারা মৃত ব্যক্তিদের মূর্তি তৈরী করেছিল। যেমন, নূহ আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায়। আরেক দল আবার নক্ষত্রের আকৃতিতে মূর্তি তৈরী করে। এরা মনে করে যে, দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে এ নক্ষত্ররাজির প্রভাব রয়েছে।

ফলে এ সকল মূর্তির জন্য ঘর ও দায়িত্বশীল নিয়োগ করে। তারা এ সকল নক্ষত্রের ইবাদতে মতবিরোধ করেছে। তাদের কেউ সূর্যের পূজা করে, কেউ আবার চন্দ্রের পূজা করে। অনেকে আবার চন্দ্র সূর্য ব্যতীত অন্য নক্ষত্রগুলোর পূজা করে।

এমনকি প্রত্যেক নক্ষত্রের আলাদা মূর্তি তৈরী করেছে। কেউ আবার আগুনের পূজা করে। তারা হলো অগ্নিপূজক। অনেকে গরুর পূজা করে, ভারত বর্ষের দিকে খেয়াল করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কেউ ফেরেশতাদের ইবাদত করে, কেউ গাছ ও পাথরের পূজা করে। অনেকে আবার কবর ও মাজারের পূজা করে। এ সকল ইবাদত ও পূজার কারণ হলো এরা প্রত্যেকেই এ সকল বস্তুর মাঝে রুবূবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বের কিছু বিশেষত্ব রয়েছে বলে ধারণা করে।

তাদের অনেকেরই ধারণা এ সকল মূর্তিগুলো অদৃশ্য বস্তুর প্রতিকৃতি। ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, অদৃশ্য মাবূদের অনুপস্থিতিতে এসকল মূর্তিগুলো রাখা হয়। তাই মূর্তিগুলোকে ঐ অনুপস্থিত মাবূদের আকৃতিতে তৈরী করা হয়।

যাতে করে এ মূর্তিগুলো ঐ অনুপস্থিত মাবূদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। নতুবা এ কথা সর্বজন বিদিত যে, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি স্বহস্তে এক খণ্ড কাঠ দিয়ে তৈরী মূর্তি বা পাথরকে দাড় করিয়ে তাকে নিজের মাবূদ বা ইলাহ হিসাবে বিশ্বাস করতে পারে না। যেমন অতীত ও বর্তমান যুগের কবর পূজারীরা ধারণা করে যে, এ সকল মৃত ব্যক্তি তাদের জন্য সুপারিশ করবে। তাদের প্রয়োজন পূরণে আল্লাহ ও তাদের মাঝে মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। তারা বলে,

{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: ٣]

আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। *সূরা আয যুমার ৩৯: ৩।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾[يونس: ١٨]

আর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর উপাসনা করে, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ। তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। ***সূরা ইউনুস ১০:১৮।***

অপর দিকে আরবের কিছু মুশরিক এবং খ্রিষ্টানরা তাদের মাবূদদের ক্ষেত্রে ধারণা করে যে, এরা হলো আল্লাহর সন্তান। আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করে তাদের ইবাদত করত। খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালাম কে আল্লাহর পুত্র মনে করে তার ইবাদত করে।

৩। এসব বাতিল ধারণার প্রতিবাদ:

নিম্নে বর্ণিত উপায়ে আল্লাহ তা'আলা এ সকল ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করেছেন।

ক) আল্লাহ তা'আলা এর বাণী:

{أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [النجم: ١٩، ٢٠]

তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে? এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? ***সূরা আন্ নাজম ৫৩:১৯-২০।***

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমরা কি এ সকল মাবূদ সম্পর্কে ভেবে দেখেছো! তারা কি কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? যার দরুন তারা আল্লাহর শরীক বা অংশীদার হবে? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ছাহাবাগণ যখন ঐ মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করছিলেন তখন কি তারা আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলো?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} [الشعراء: ٦٩- ٧٤]

আর তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। যখন তার পিতাকে এবং তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের ইবাদত কর? তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে? তারা বলল, না। তবে আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত। *সূরা আশ্ শুআ'রা ২৬: ৬৯-৭৪।*

তারা এ কথা মানতো যে, এসকল মূর্তি কোন আহ্বান বা ডাক শুনতে পায় না। এগুলো কোন উপকার বা অপকার করতে পারে না। তবে বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে তারা এগুলোর পূজা করে থাকে। আর তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ বাতিল দলীল যা গ্রহণযোগ্য নয়।

খ) যারা চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের ইবাদত করে, নিম্নোক্ত বাণীর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিবাদ করেছেন,

﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ} [الأعراف: ٥٤]

তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজী এগুলো তারই আদেশের অনুগামী। *সূরা আল্ আ'রাফ ৭: ৫৪।* অপর স্থানে তিনি বলেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: ٣٧]

তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তারই ইবাদত কর। *সূরা হামীম সাজদা (ফুসসিলাত) ৪১:৩৭।*

গ) যারা ফেরেশতা ও ঈসা আলাইহিস সালাম কে আল্লাহর সন্তান মনে করে তাদের ইবাদত করে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত বাণীতে তাদের প্রতিবাদ করেছেন।

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} [المؤمنون: ٩١ ﴾

আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। *সূরা আল্ মুমিনূন ২৩: ৯১।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾ [الأنعام: ١٠١]

কিরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তার কোন সঙ্গিনী নেই? *সূরা আল্ আন্আ'ম ৬: ১০১।* অপর স্থানে তিনি বলেন:

{لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: ٣، ٤]

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। *সূরা আল্ ইখলাস ১১২: ৩-৪।*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الكونُ وفطرتُهُ فِي الخُضُوعِ والطَّاعةِ للهِ

আল্লাহর বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করা পৃথিবীসহ সব কিছুর স্বভাবজাত ধর্ম

আসমান, যমীন, তারকা-নক্ষত্র (গ্রহ-উপগ্রহ), পশু-পাখি, গাছ-পালা, নগর বাসী, জল-স্থল বাসী, ফেরেশতা, জ্বীন এবং মানুষসহ সবকিছু আল্লাহর বাশ্যতা স্বীকার করে তার দুনিয়াবী নির্দেশ মেনে চলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا} [آل عمران: ٨٣]

আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তারই অনুগত হবে এবং তার দিকেই ফিরে যাবে। *সূরা আলে ইমরান ৩: ৮৩।* তিনি আরো বলেন,

﴿بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} [البقرة: ١١٦﴾

বরং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তার আজ্ঞাধীন। *সূরা আল্ বাক্বারা ২: ১১৬।*

{وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [النحل: ٤٩]

আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভুমণ্ডলে আছে এবং ফেরেশতাগণ; তারা অহংকার করে না। *সূরা আন্ নাহল ১৬:৪৯।*

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ} [الحج: ١٨]

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীব জন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা লাঞ্চিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। সূরা আল্ হজ্জ ২২: ১৮।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [الرعد: ١٥]

আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়। *সূরা আর্ রা'দ ১৩: ১৫।*

পৃথিবীর সবকিছু এবং সমগ্র জগত আল্লাহর অনুগত ও বশ্যতা স্বীকার করে। তার ইচ্ছা এবং নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো পরিচালিত হয়। জগত সমূহের কোন জিনিস তার অবাধ্য হতে পারে না। প্রত্যেকে স্ব-স্ব-কাজ আঞ্জাম দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে তার ফল দিয়ে যাচ্ছে এবং স্বীয় স্রষ্টাকে যাবতীয় ক্রুটি, অপারগতা এবং দোষ হতে মুক্ত ঘোষণা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: ٤٤]

সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা করা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। *সূরা বানী ইসরাঈল ১৭: ৪৪।*

সুতরাং জড় বস্তু ও প্রাণী, জীবিত-মৃত সবকিছুই আল্লাহর অনুগত এবং তার দুনিয়াবী নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। প্রত্যেকটি জিনিসই স্ব-স্ব অবস্থায় দোষ-ক্রুটি হতে আল্লাহর মুক্ততা ঘোষণা করে। জ্ঞানী ব্যক্তি এসকল সৃষ্টি জীব নিয়ে যখনি চিন্তা-ভাবনা করবে তখনি সে জানতে পারবে যে, সত্য সহকারে এবং সত্যের জন্য এগুলো সৃষ্ট হয়েছে। এসকল জিনিস আল্লাহর অনুগত ও অধীনস্ত। পরিচালনার ক্ষেত্রে এসবের কোন ক্ষমতা নেই এবং এগুলো তার পরিচালক আল্লাহ তা'আলারও অবাধ্য হয় না। সৃষ্টিগত স্বভাব জাত ধর্মের ভিত্তিতেই সব কিছু তার স্রষ্টাকে স্বীকার করে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: পৃথিবীর সকল কিছু বিভিন্নভাবে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে। সকলেই তার নিকটে বিনয়ী ও তার মুখাপেক্ষী। সে দিকগুলো নিম্নরূপ:

এক. এক মাত্র আল্লাহ তা'আলাই চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহ পূরণ করেন এ বিষয়ে সকলের জ্ঞান রয়েছে।

দুই. আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়তি সকলেই মানে এবং এর প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে।

তিন. নিরুপায়ের সময় সকলেই কেবল মাত্র মহান রব্বুল আলামীনকেই ডাকে।

মুমিন স্বেচ্ছায় আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত বিপদাপদ ও হুকুমের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। মুসলিম হওয়ার দরুন সে স্বেচ্ছায় আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার ও তার নিকটে নত হয়। বিপদাপদ ও আল্লাহর নির্দেশে সে ধৈর্য্য ধারণ করে।[৮]

কাফির আল্লাহর দুনিয়াবী নিয়মের নিকটে বশ্যতা স্বীকার করে। সৃষ্টি জীবের সিজদা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করা। প্রত্যেকটি জিনিস নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী আল্লাহকে সিজদা করে। আর ঐ সিজদাতে বশ্যতা সম্পৃক্ত থাকে।

অপর দিকে প্রতিটি জিনিস তার নিজের অবস্থা অনুযায়ী রূপকার্থে নয় বরং বাস্তবিকই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে।

আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহি. বলেন,

{أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [آل عمران: ٨٣]

তারা কি আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন অনুসন্ধান করছে? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তারই অনুগত হবে এবং তার দিকেই ফিরে যাবে। *সূরা আলে ইমরান ৩:৮৩।*

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন: আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে সমগ্র জগতের স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার বশ্যতা স্বীকারের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ সকল সৃষ্টি জীবই আল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাসী। চায় সে তা স্বীকার করুক বা না করুক।

---

৮. মাজমূ' ফতোয়া ১/৪৫।

➔বিশ্ব জগত আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তাধীন এবং তিনি তাদের নিয়ন্ত্রক। সঙ্গতকারণেই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সমগ্র জগত আল্লাহরই নিকটে আত্মসমর্পন কারী।

➔কোন সৃষ্টি জীবই আল্লাহর ইচ্ছা, নিয়তি এবং ফায়ছালার বাহিরে যেতে পারে না।

➔তিনি ব্যতীত কেউ ভাল কাজে তৌফীক্ব দিতে এবং খারাপ কাজ হতে বাধা দিতে পারে না।

➔তিনি জগত সমূহের প্রতিপালক এবং তাদের মালিক।

➔যেভাবে ইচ্ছা তিনি তাদেরকে পরিচালনা করেন।

➔তিনিই তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং আকৃতি দানকারী।

➔আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যা কিছু রয়েছে, সবকিছুই পালনকৃত, আবিষ্কৃত, সৃষ্ট, দরিদ্র, আল্লাহর মুখাপেক্ষী, দাস এবং বশীভূত।

➔তিনি এক-একক, মহা প্রতাপশালী ও পরাক্রান্ত, সৃষ্টি কর্তা ও আকৃতি দাতা।[৯]

৯. মাজমূ' ফতোয়া ১০/২০০।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

في بيانِ منهج القرآن في إثبات وُجُودِ الخَالِقِ ووحدانيَّته

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্বতা প্রমাণে আল কুরআনের নীতি

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্বতা প্রমাণে কুরআনের নীতি সঠিক স্বভাব জাত ধর্ম এবং সুষ্ঠু বিবেক-জ্ঞানের সাথে একমত। আর সে নীতি হলো, মনোপুত বিশুদ্ধ দলীলের মাধ্যমে বিবাদী তথা প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পন করানো। ঐ সকল নীতিমালার কিছু নিম্নে পেশ করা হলো,

১। এটা সর্বজন বিদিত যে, প্রত্যেক কাজের একজন কর্তা প্রয়োজন: এটা আবশ্যক বিষয় যা স্বভাবজাত ধর্ম দ্বারা জানা যায়। এমনকি বাচ্চারাও তা জানে; যদি অসতর্ক অবস্থায় কোন বাচ্চাকে কেউ প্রহার করে এবং সে প্রহারকারীকে দেখতে না পায় তবে অবশ্যই সে বলবে, কে আমাকে প্রহার করল? যদি তাকে বলা হয়, কেউ তোমাকে প্রহার করেনি, তাহলে প্রহারকারী বিহীন এ প্রহারকে তার জ্ঞান মেনে নিবে না। অপর দিকে যদি বলা হয়, অমুক ব্যক্তি তোমাকে প্রহার করেছে, তবে প্রহারকারীকে প্রহার না করা পর্যন্ত সে কাঁদতে থাকে। এজন্য-আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} [الطور: ٣٥﴾

তারা কি কোন কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে না তারাই স্রষ্টা? ***সূরা তুর ৫২:৩৫***

এ প্রকরণের মাধ্যমে স্রষ্টাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। অস্বীকার মূলক প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন। যাতে এটা স্পষ্ট হয় যে, এ প্রাথমিক বিষয়টি জানা আবশ্যক যা অস্বীকার করা অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾

তারা কি কোন স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে? ***সূরা আত তূর ৫২:৩৫***

দু'টি বিষয়ই বাতিল। অর্থাৎ কোন স্রষ্টা ছাড়া তারা সৃষ্টি হয়নি এবং নিজেরাও নিজেদেরকে সৃষ্টি করেনি। এতে স্থির হলো যে, তাদের এমন একজন স্রষ্টা রয়েছেন যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই হলেন, আল্লাহ তা'আলা। তিনি ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} [لقمان: ١١]

এটা (দুনিয়া ও আসমান এবং এতদু'ভয়ের সব কিছু) আল্লাহর সৃষ্টি। তোমরা আমাকে দেখাও আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হচ্ছে তারা কি সৃষ্টি করেছে? *সুরা লুক্বমান* **৩১: ১১** *।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ} [الأحقاف: ٤]

আল্লাহ ব্যতীত অন্যরা যমীনের কোন জিনিসটি সৃষ্টি করেছে তা তোমরা আমাকে দেখাও? । *সূরা আহ্‌কাফ ৪৬: ৪ ।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد: ١٦]

তবে কি তারা আল্লাহর জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুন: আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী। *সূরা আর্ রা'দ* **১৩: ১৬** *।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ} [الحج: ٧٣]

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। *সূরা হাজ্জ* **২২: ৭৩** *।*

{وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ} [النحل: ٢٠]

যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের ডাকে, ওরা তো কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। *সূরা আন্ নাহ্‌ল* **১৬: ২০** *।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} [النحل: ١٧]

যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করবে না? *সূরা আন্ নাহ্‌ল* **১৬: ১৭** *।*

একাধিক বার এ সকল চ্যালেঞ্জ ঘোষণার পরও কেউ এ দাবী করেনি যে, সে কোন কিছু সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি সাব্যস্ত তো দূরের কথা কেউ এ দাবীই করেনি। এতে নির্দিষ্ট হলো যে, এক ও লা-শরীক আল্লাহ তা'আলা হলেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

২। পৃথিবীর সকল বিষয়াদির নিয়মতান্ত্রিক ও সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়া: দুনিয়া সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত হওয়া এ কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বহন করে যে, দুনিয়ার পরিচালক হলেন এক ইলাহ, এক রব্ব যার কোন শরীক নেই এবং এ বিষয়ে কোন বিবাদীও নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [المؤمنون: ٩١]

আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে কোন মাবূদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবূদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হয়ে আক্রমন করে বিজয়ী হত। ***সূরা মুমিনূন ২৩: ৯১।***

সত্য মা'বূদ হতে হলে অবশ্যই সৃষ্টি কর্তা ও দুনিয়া পরিচালনার যোগ্যতা থাকতে হবে। যদি আল্লাহর সাথে তার মালিকানায় শরীক (আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত) কোন ইলাহ থাকতো তাহলে তারও কিছু সৃষ্টি ও কর্ম থাকত। আর তখনই সে নিজের সহিত অন্য ইলাহের শরীকানা মেনে নিত না। বরং যদি সে তার শরীককে পরাভূত করে ইলাহ ও মালিকানার ক্ষেত্রে একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতো তবে তাই করতো। আর যদি এমনটি করতে সক্ষম না হতো তবে নিজের মালিকানা ও সৃষ্টিগুলো নিয়ে সে আলাদা হয়ে যেত। যেমন দুনিয়ার রাজা বাদশারা প্রত্যেকে নিজের রাজত্ব নিয়ে একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে যায়। তখনি বিভাজন ও বিভক্তির সৃষ্টি হয়ে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি আবশ্যক হয়ে যায়:

ক. একজন অপর জনকে পরাজিত করে একক কর্তৃত্ব গ্রহণ করা।

খ. প্রত্যেকে নিজ নিজ সৃষ্টি ও মালিকানা নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে, যার ফলে বিভক্তির সৃষ্টি হবে।

গ. অথবা সকলে এক মালিকের নেতৃত্ব মেনে নিবে যিনি যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে পরিচালিত করবেন। ফলে তিনিই হবেন একমাত্র সত্য ইলাহ এবং দুনিয়ার সকলে হবে তার বান্দা। আর এটাই হলো বাস্তব সত্য। দুনিয়াতে কোন বিভক্তি ও ত্রুটি সৃষ্টি না হওয়া প্রমাণ করে যে, তার পরিচালক হলেন একজন,

তার কোন প্রতিদ্বন্দি নেই এবং তার মালিক হলেন একজন যার কোন শরীক নেই।

৩। সৃষ্টিজগতকে তাদের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করা এবং তার বৈশিষ্ট্য আঞ্জাম দেয়াঃ

দুনিয়ায় এমন কোন মাখলূক্ব নেই যে, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফেরআ'উনের প্রশ্নের উত্তরে মূসা আলাইহিস সালাম এর দ্বারাই দলীল পেশ করে ছিলেন,

{قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَامُوسَى} [طه: ٤٩]

হে মূসা তোমাদের দু'জনের রব্ব বা প্রভু কে? *সূরা ত্ব-হা ২০: ৪৯*

তখন মূসা আ. যথেষ্ট ও স্পষ্ট উত্তর দিয়ে বলেছিলেনঃ

{رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: ٥٠]

আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। *সূরা ত্ব-হা ২০: ৫০।*

অর্থাৎ আমাদের রব্ব তো তিনিই যিনি সকল মাখলুক্বাত সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি জিনিসকে তার উপযুক্ত আকৃতি দিয়েছেন। ফলে কোন জিনিসকে বড়, কোনটিকে ছোট, কোনটিকে মধ্যম আকৃতির করে তাদেরকে উপযুক্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন। এরপর প্রতিটি জিনিসকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এ হিদায়াত হলো, দিক নির্দেশনা ও আন্তরিক অনুপ্রেরণা বা ইল্‌হাম পাঠানো। আর তা হলো সেই পরিপূর্ণ হিদায়াত যা প্রত্যেক মাখলুকের মাঝে দেখা যায়। প্রতিটি মাখলুকই যে কল্যাণের জন্য সৃষ্ট হয়েছে তা অর্জনে এবং নিজ হতে ক্ষতি রোধে সচেষ্ট। এমনকি আল্লাহ তা'আলা জতুস্পদ জন্তুকেও অনুভূতি দিয়েছেন। যার দ্বারা তারাও নিজেদের উপকারী জিনিস করতে এবং অপকার রোধে সক্ষম। এ অনুভূতির মাধ্যমেই দুনিয়ায় তারা নিজেদের মিশন বা দায়িত্ব আদায় করে যাচ্ছে। এ জন্য-আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧]

যিনি (আল্লাহ) তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন। *সূরা সাজদা ৩২:৭।*

অতএব, যিনি সকল মাখলুক্ব সৃষ্টি করে তাকে এমন সুন্দর আকৃতি দিয়েছেন- মানুষের জ্ঞান যার চেয়ে সুন্দর আকৃতির প্রস্তাবও করতে পারে না- এবং প্রতিটি

জিনিসকে স্বীয় কল্যাণের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, প্রকৃত পক্ষে তিনিই হলেন রব্ব বা পালন কর্তা। সেই মহান সত্তাকে অস্বীকার করলে সবচেয়ে মহান জিনিসের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হলো।

আর এটা হলো অহংকার, গোঁড়ামী এবং মিথ্যার ক্ষেত্রে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু দান করে তার মাধ্যমে উপকার গ্রহণের পথও দেখিয়েছেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসকে উপযুক্ত আকৃতি ও গঠন দান করেছেন। বিবাহ, ভালোবাসা এবং একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নারী-পুরুষকে লিঙ্গভেদে আল্লাহ তা'আলা যথাযথ গঠন দিয়েছেন। প্রতিটি অঙ্গের মাধ্যমে উপকার গ্রহণের জন্য তাকে মানানসই আকৃতি দিয়েছেন। এসব কিছুতে আল্লাহই একমাত্র রব্ব এবং অন্যরা নয়, কেবলমাত্র আল্লাহই ইবাদতের যোগ্য এ কথার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি বলেন:

প্রতিটি জিনিসে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে,

যা প্রমাণ করে আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর একক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো: এর মাধ্যমে কেবল মাত্র শরীকহীন এক আল্লাহর ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ সাব্যস্ত করা। তা হলো, তাওহীদে উলূহিয়্যাহ্। যদি কোন ব্যক্তি তাওহীদে রুবুবিয়্যাহকে স্বীকার করে কিন্তু তাওহীদে উলূহিয়্যাহকে অস্বীকার করে বা সঠিকভাবে তা পালন না করে তবে সে মুসলিম ও আস্তিক হতে পারবে না। বরং সে কাফির, অস্বীকারকারী, নাস্তিক। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়েই আমরা আলোচনা করব। ইনশা আল্লাহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

بيانُ استلزامِ توحيدِ الرُّبوبيَّةِ لتوحيد الأُلوهيَّة

তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ তাওহীদে উলূহিয়্যাহকে আবশ্যক করে

উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা হলো, যে ব্যক্তি তাওহীদে রুবুবিয়্যাহকে এক আল্লাহর জন্য স্বীকার করতঃ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা, রিযিক্বদাতা এবং পৃথিবী পরিচালনাকারী নেই। তার জন্য এটা স্বীকার করাও আবশ্যক হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ কোন প্রকার ইবাদতের হক্বদার বা যোগ্য নয়। আর এটাই হলো তাওহীদে উলূহিয়্যাহ্। উলূহিয়্যাই হলো ইবাদত; ইলাহ্ শব্দের অর্থ হলো মাবূদ (যার ইবাদত করা হয়)।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে ডাকা যাবে না, তিনি ব্যতীত অন্যের নিকটে ফরিয়াদ করা যাবে না, এক মাত্র তার উপরই ভরসা করতে হবে, নযর-মানত এবং যাবতীয় প্রকার ইবাদত কেবল মাত্র তার জন্যই করতে হবে। তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ তাওহীদে উলূহিয়্যাহ ওয়াজিব হওয়ার দলীল। এজন্যই অনেক স্থানে মহান রব্বুল আ'লামীন স্বীকারকৃত তাওহীদে রুবূবিয়্যাহর দ্বারা তাওহীদে উলূহিয়্যাহ্ অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করেছেন। যেমন-

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢١، ٢٢]

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারীতা অর্জন করতে পারবে। যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করেছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাহাকেও সমকক্ষ কর না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান। *সূরা আল বাক্বারা ২: ২১-২২।*

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে তাওহীদে উলূহিয়্যার আদেশ দিয়েছেন, যা হলো তার ইবাদত করা। আর তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করেছেন। আর তা হলো, পূর্বাপর সকল মানুষ এবং আসমান-যমীন ও এতদ্বভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় জিনিস সৃষ্টি করা। বৃষ্টি বর্ষণ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করা, গাছ হতে ফল-ফলাদি বের করা যাতে বান্দার রিযিকের ব্যবস্থা রয়েছে।

অতএব, যারা জানে যে, তারা কোন জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় তাদের উচিত আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। তাওহীদে উলূহিয়্যাহকে প্রমাণের স্বভাব জাত পদ্ধতি হলো, তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ দ্বারা এর উপর প্রমাণ পেশ করা।

কারণ মানুষ প্রথমতঃ তার সৃষ্টি, উপকার এবং অপকারের মূল উৎসের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। এরপর সে ঐ সকল মাধ্যম খোঁজে যা তাকে স্রষ্টার নিকটবর্তী হওয়া, তার প্রতি স্রষ্টার সন্তুষ্টি এবং উভয়ের মাঝে সম্পর্ক মজবুত করতে সহযোগীতা করবে।

তাওহীদে রুবূবিয়্যাই তাওহীদে উলূহিয়্যার দ্বার উম্মুক্ত করে। সঙ্গত কারণেই মহান রব্বুল 'আলামীন এ পদ্ধতিতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করেছেন এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও এ পদ্ধতিতে দলীল পেশ করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} [المؤمنون: ٨٤- ٨٩]

বলুন, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। এখন তারা বলবে, সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? বলুনঃ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ্। বলুনঃ তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ। বলুনঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে? *সূরা আল মুমিনূন ২৩: ৮৪-৮৯।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ} [الأنعام: ١٠٢]

তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তারই ইবাদত কর। সূরা আল্ আন্'আম ৬: ১০২।

আল্লাহ তা'আলা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে স্বীয় একত্বের মাধ্যমে নিজের ইবাদতের হক্বদার ও যোগ্য হওয়ার প্রমাণ পেশ করেছেন। তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦]

কেবল মাত্র আমার ইবাদতের জন্য আমি জ্বিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি। *সূরা আয্ যারিয়াত ৫১: ৫৬।*

অত্র আয়াতে উল্লেখিত (يَعْبُدُوْنِ) শব্দের অর্থ হলো: তারা যেন কেবল মাত্র আমারই ইবাদত করে। তাওহীদে উলূহিয়্যাহকে স্বীকার ও মানা ব্যতীত শুধু মাত্র তাওহীদে রুবূবিয়্যাহকে স্বীকার করেই কোন বান্দা আস্তিক বা তাওহীদপন্থী হতে পারে না। তাইতো মক্কার মুশরিকরা তাওহীদে রুবূবিয়্যাহকে স্বীকার করা সত্ত্বেও মুসলমান বলে গণ্য হয়নি। আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিযিক্বদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা বলে স্বীকার করার পরও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে জিহাদ করেছেন। কারণ তারা তাওহীদে উলূহিয়্যাহকে মানতো না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [الزخرف: ٨٧]

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। *সূরা আয যুখরুফ ৪৩:৮৭।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ} [الزخرف: ٩]

যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এসব সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্। *সূরা আয যুখরুফ ৪৩: ৯।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ} [يونس: ٣١]

বল, আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদের রিযিক্ব দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? এবং কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। ***সূরা ইউনুছ ১০:৩১***

কুরআনে অনুরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে। যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তাওহীদ হলো শুধু আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করা অথবা এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা, দুনিয়ার পরিচালনাকারী এবং এর উপরই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সে রসূলগণ 'আলাইহিমুস্ সালামের' আহ্বানকৃত তাওহীদকে স্বীকার করল না। কারণ সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিষয়কে (তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ্) মানে কিন্তু বাধ্যতামূলক বিষয় তথা ইবাদতকে ত্যাগ করে। অথবা দলীল স্বীকার করে কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করে না।

উলূহিয়্যাহ বা ইবাদতের যোগ্য হওয়ার বিশেষত্বঃ

চতুর্দিক থেকে এমন নিরংকুশ পূর্ণ গুণের অধিকারী হওয়া যাতে কোন দিকে সামান্য পরিমাণ ত্রুটি বা ঘাটতি না থাকে। আর এগুণে গুণান্বিত হওয়াই সকল প্রকার ইবাদত, সম্মান-মর্যাদা, ভয়, দু'আ, আশা, প্রত্যাবর্তন, ভরসা এবং ফরিয়াদ এবং পূর্ণ ভালবাসার সাথে আল্লাহর নিকটে খুবই বিনয়ী-নীচু হওয়াকে আবশ্যক করে। জ্ঞান, শরী'আত এবং স্বভাবগত সকল দিক দিয়েই এসকল বিষয় একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা ওয়াজিব। জ্ঞান, শরী'আত এবং স্বভাবগতভাব সব দিক দিয়েই এসকল বিষয় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য হওয়া অসম্ভব।

توحيد الألوهية

২। তাওহীদে উলূহিয়্যাহ

এ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদগুলো রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: তাওহীদে উলূহিয়্যার সংজ্ঞা যা ছিল সকল রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: শাহাদাতাইন: তার অর্থ - রুকনসমূহ - শর্তাবলী - চাহিদা - তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শরী'আত সম্পর্কে: হালাল-হারাম আল্লাহর অধিকার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইবাদত সম্পর্কে: ইবাদতের সংজ্ঞা - প্রকার - ব্যাপকতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ইবাদতের ভুল সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে। (যেমন- ইবাদতকে সীমাবদ্ধ করা বা ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: বিশুদ্ধ ইবাদতের মূল বিষয়াবলী: ভালোবাসা - ভয় - বিনয় ও নম্রতা এবং আশা আকাঙ্খা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: আমল ও ইবাদত কবুলের শর্তাবলী: ইখলাস বা একনিষ্ঠতা এবং শরী'আত তথা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত মোতাবেক হওয়া।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: দীনের স্তর সম্পর্কে: ইসলাম - ঈমান - ইহসান। প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ও পারস্পরিক সম্পর্ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ

في بيانِ معنى توحيدِ الألوهيَّةِ وأنه موضوعُ دعوةِ الرُّسل

তাওহীদে উলূহিয়্যার সংজ্ঞা যা ছিল সকল রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

তাওহীদে উলূহিয়্যাহঃ উলূহিয়্যাই হলো ইবাদত। তাওহীদে উলূহিয়্যার সংজ্ঞা: শরী'আত সম্মত নৈকট্য অর্জনের জন্য বান্দা যে সকল ইবাদত করে তা কেবলমাত্র এক আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট করাই হলো তাওহীদে উলূহিয়্যাহ। যেমন: দু'আ, নযর-মানত, কুরবানী, আশা-আকাঙ্খা, ভয়, ভরসা, আগ্রহ, অনাগ্রহ, আল্লাহ্ মুখী হওয়া। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রসূলগণের আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল তাওহীদে উলূহিয়্যাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦]

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বগূত থেকে নিরাপদ থাক। *সূরা আন্ নাহল ১৬: ৩৬।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: ٢٥]

আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। *সূরা আম্বিয়া ২১: ২৫।*

প্রত্যেক রসূলই তাওহীদে উলূহিয়্যার নির্দেশ দিয়ে স্বীয় কওমকে দাওয়াত দেয়া শুরু করেছেন। যেমন, নূহ, হূদ, সালিহ এবং শু'আইব (আলাইহিমুস্ সালাম) প্রথমে স্বীয় জাতিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেন,

{يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: ٥٩، ٦٥، ٧٣، ٨٥]

হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। *সূরা আল্ 'আরাফ ৭: ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫।*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ} [العنكبوت: ١٦]

আর ইবরাহীমকে, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন: তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাকে ভয় কর। *সূরা 'আনকাবূত ২৯: ১৬।*

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নিম্নোক্ত বাণী নাযিল করা হয়েছে,

{قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} [الزمر: ١١]

বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। *সূরা আয্ যুমার ৩৯: ১১।*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেন,

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»

মানুষ যতক্ষণ কালিমায়ে শাহাদাত তথা আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল একথার সাক্ষ্য না দিবে ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি।[১০]

শরী'আতের দায়িত্ব অর্পিত ব্যক্তির উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব হলো কালিমায়ে শাহাদাত তথা আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল একথার সাক্ষ্য দেয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} [محمد: ١٩]

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে (এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে)। *সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: ১৯।*

---

১০. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২, নাসাঈ ৩৯৬৭, দারাকুৎনী ৮৯২।

যারা ইসলামে প্রবেশ করতে চান তাদেরকে সর্বপ্রথম যে আদেশ দেয়া হয় তা হলো কালিমায়ে শাহাদাত তথা আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকারোক্তির বাণী উচ্চারণ করা।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, তাওহীদে উলূহিয়্যাহ হলো সকল রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। উলূহিয়্যাহ আল্লাহর গুণ, যা তার নাম আল্লাহ এর উপর প্রমাণ বহন করে। এজন্যই এ প্রকার তাওহীদকে তাওহীদে উলূহিয়্যাহ বলে নাম করণ করা হয়েছে। আল্লাহ হলেন, যুল উলূহিয়্যাহ বা একমাত্র সত্য মা'বূদ।

এ প্রকার তাওহীদকে তাওহীদুল ইবাদাহও বলা হয়। কেননা, ‘উবূদিয়্যাহ তথা দাসত্ব হলো বান্দার গুণ। বান্দার উপর ওয়াজিব হলো, স্বীয় প্রয়োজন ও দারিদ্রতার দরুন সে একনিষ্ঠভাবে কেবল মাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ জেনে রাখুন, আল্লাহর নিকটে বান্দার প্রয়োজন হলোঃ বান্দা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করবে তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। এর কোন উপমা নেই যার সাথে তাকে তুলনা করা যায়।

তবে মানুষের শরীরে পানাহারের যে চাহিদা আছে তার সাথে বান্দা কর্তৃক আল্লাহর ইবাদত করার কিছু দিক দিয়ে মিল পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও উভয়ের মাঝে অনেক তারতম্য রয়েছে। অর্থাৎ বান্দার পানাহারের চেয়ে আল্লাহর ইবাদত করার প্রয়োজনীয়তা অনেক গুণ বেশী। কারণ, বান্দার মূল হলো তার হৃদয় ও আত্মা। আর হৃদয় ও আত্মার স্রষ্টা ব্যতীত এতদুভয়ের কোন কল্যাণ হতে পারে না।

অতএব, আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত দুনিয়াতে মানব হৃদয় শান্তি পেতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত দুনিয়ার কোন জিনিসে মানুষ সাময়িক আনন্দ ও শান্তি পেলেও তা স্থায়ী হয় না। বরং এক জিনিস হতে অন্য জিনিসে এবং এক ব্যক্তি হতে অন্য ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হয়। অপর দিকে সর্বদা বান্দার তার প্রভুর প্রয়োজন রয়েছে। যা পানাহার বা অন্য যে কোন প্রয়োজনের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবেও মানুষ যখন যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন আল্লাহ তার সাহায্য সহযোগীতা এবং দেখা-শুনা ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তার সাথে রয়েছেন।[১১]

---

১১. মাজমূ' ফতোয়া ১/২৪।

তাওহীদে উলূহিয়্যাহ্ ছিল রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কারণ এটা হলো সেই মূল বা শিকড় যার উপর আমলসমূহের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে। এ প্রকার তাওহীদ বাস্তবায়ন না করলে কোন আমলই বিশুদ্ধ হবে না। কারণ, তাওহীদ বাস্তবায়িত না হলে তার বিপরীতে শিরক সংঘটিত হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨، ١١٦]

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তার সাথে শরীক করে। *সূরা আন্ নিসা ৪: ৪৮,১১৬।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: ٨٨]

যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ হয়ে যেত। *সূরা আল্ আন্ 'আম ৬: ৮৮।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: ٦٥]

যদি তুমি শিরক করো তাহলে তোমার আমাল-কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। *সূরা আয্ যুমার ৩৯: ৬৫।*

তাওহীদে উলূহিয়্যাহ হলো বান্দার উপর আল্লাহর প্রথম হক্ব বা অধিকার। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الآية [النساء: ٣٦]

আর উপাসনা কর আল্লাহর, তার সাথে অপর কাউকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। *সূরা আন্ নিসা ৪: ৩৬।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الآية [الإسراء: ٢٣]

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্বব্যবহার কর। *সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:২৩।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [الأنعام: ١٥١– ١٥٣]

আপনি বলুন: এসো আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই, নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না- প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন- তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। ইয়াতীমদের ধনসম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্য ব্যতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও। *সূরা আল 'আন্‌আম ৬:১৫১-১৫৩।*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

في بيان معنى الشَّهادتين وما وقعَ فيهما من الخطأ

وأركانهما وشروطهما ومقتضاهما ونواقضهما

শাহাদাতাইনের (কালিমায়ে শাহাদাতের) অর্থ, এক্ষেত্রে পঠিত ভুল-ত্রুটি, শাহাদাতাইনের রুকনসমূহ, শর্তাবলী এবং চাহিদা ও তা ভঙ্গকারী বিষয়াবলী:

প্রথমত: معنى الشَّهادتين শাহাদাতাইনের অর্থ

১। শাহাদাতু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ:

এ কথা বিশ্বাস ও স্বীকার করা যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের হক্বদার নয়। এটা গ্রহণ করতঃ সে অনুযায়ী আমল করা। অতএব, (লা-ইলাহা তে) আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকলের ইবাদতের হক্বদার হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। (ইল্লাল্লাহ এ) একমাত্র আল্লাহই সকল ইবাদতের হক্বদার তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। সর্বোপরি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সঠিক অর্থ হলো- **আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই।**

বিহাক্কিন (بحق) শব্দটিকে উহ্য হিসাবে লা (لا) এর খবর মানা অবশ্যক। মউজূদুন (موجود) শব্দটিকে লা এর খবর মানা জায়িয হবে না। কারণ তা বাস্তবতার বিপরীত। পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত অসংখ্য মাবূদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। যদি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ করি আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ বা ইলাহ নেই তবে এর অর্থ দাঁড়ায় তিনি ব্যতীত যে সকল দর্গা, দূর্গা ও প্রতিমাসহ ইত্যাদির ইবাদত করা হচ্ছে তা মূলতঃ আল্লাহর ইবাদতেরই শামিল!! অথচ তা হলো সবচেয়ে বড় বাতিল এবং অহদাতুল অজুদে (সর্বেশ্বরবাদী) বিশ্বাসীদের আক্বীদাহ[১২]। অহদাতুল অজুদে বিশ্বাসীরাই পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় কাফির।

---

১২. তাদের বিশ্বাস হলো অস্তিত্বমান প্রতিটি জিনিসই আল্লাহ্।

কালিমায়ে শাহাদাতের অনেক বাতিল ও বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা করা হয় যার কিছু আমরা নিচে উল্লেখ করলামঃ

ক. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ হলোঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। এটা বাতিল। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায় সত্য বা মিথ্যা যারই ইবাদত করা হয় সেই হলো আল্লাহ্!!! যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ হলোঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন স্রষ্টা নেই। এটা এ কালিমার অর্থের কিয়দংশ। কিন্তু এ কালিমা দিয়ে শুধু এ উদ্দেশ্য করা হয়নি। কারণ, এর মাধ্যমে শুধু তাওহীদে রুবূবিয়্যাহকে সাব্যস্ত করা হয়। আর শুধু তাওহীদে রুবূবিয়্যাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে যথেষ্ট হবে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের মুশরিকরা এ প্রকার তাওহীদকে বিশ্বাস করত তথাপি তাদেরকে মুমিন বলে গণ্য করা হয়নি।

গ. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ হলোঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বিধান মানা যাবে না। এটাও এ কালিমার অর্থের কিয়দংশ। এ কালিমা দিয়ে শুধু এটাই উদ্দেশ্য নয় এবং মুমিন হওয়ার জন্য তা যথেষ্টও নয়। কারণ, কেউ যদি বিধানদাতা হিসাবে এক মাত্র আল্লাহকেই মানে, সাথে অন্যকে আহ্বান করে অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য ইবাদতের সামান্য অংশ ব্যয় করে তবে সে মুঅহ্হিদ বা আস্তিক নয়, বরং নাস্তিক। উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলো বাতিল অথবা অপূর্ণ। প্রচলিত কিছু বইয়ে এসকল বাতিল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বলে আমরা এবিষয়ে জনগণকে সতর্ক করলাম।

সাল্ফে সালিহীন এবং গবেষকগণের নিকটে এ কালিমার সঠিক ব্যাখ্যা হলোঃ (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই। পূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি)।

২। শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ এর অর্থঃ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে এ সাক্ষ্য দেয়া যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং বিশ্ব মানবতার জন্য তার প্রেরীত রসূল। সাথে এ সাক্ষ্যের চাহিদানুযায়ী আমল করা। আর সে চাহিদা হলোঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদিষ্ট বিষয়ের আনুগত্য করা, তিনি যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে মেনে নেওয়া, তিনি যে সকল জিনিস থেকে নিষেধ বা সতর্ক করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং তার দেখানো পথ ব্যতীত আল্লাহর ইবাদত না করা।

দ্বিতীয়ত: أركان الشهادتين শাহাদাতাইনের রুকন বা স্তম্ভসমূহ

ক. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহঃ এর দু'টি রুকন রয়েছেঃ না বাচক এবং হ্যাঁ বাচক। প্রথম রুকন না বাচক, আর তা হলো লা-ইলাহাঃ এটা আল্লাহর সাথে সকল প্রকার শিরক বা অংশীদারিত্বকে বাতিল করতঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদের পূজা করা হয় তা অস্বীকার করা ওয়াজিব করে।

দ্বিতীয় রুকন হ্যাঁ বাচক, আর তা হলো ইল্লাল্লাহঃ এটা এ কথা সাব্যস্ত করে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের হক্বদার বা যোগ্য নয়। সাথে সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব করে। একাধিক আয়াতে এ দু'টি রুকনের অর্থের বর্ণনা এসেছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: ٢٥٦]

অতএব, যে ব্যক্তি ত্বগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। *সূরা আল বাক্বারা ২:২৫৬।*

আল্লাহর বাণী: (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ) প্রথম রুকন তথা লা- ইলা-হার অর্থ। আল্লাহর বাণী: (وَيُؤْمِن بِاللهِ) দ্বিতীয় রুকন তথা ইল্লাল্লাহ্ এর অর্থ। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম আ. এর উক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

{إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} [الزخرف: ٢٦، ٢٧]

তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তার সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। *সূরা যুখরুফ ৪৩:২৬-২৭।*

ইবরাহীম আ. এর উক্তি "তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই " প্রথম রুকন তথা না বাচক লা-ইলাহার সারমর্ম। আর "আমার সম্পর্ক তার সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন" উক্তিটি দ্বিতীয় রুকন তথা হ্যাঁ বাচকের সারমর্ম।

শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ এর রুকনসমূহ

এটার দু'টি রুকন রয়েছে। আর তা হলো শাহাদাতের উক্তি: আব্দুহু ও-রসূলুহু। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

এটা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতাকে প্রত্যাখ্যান করে। অতএব, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহর বান্দা ও রসূল। মর্যাদাবান এ দু'টি সিফাত বা গুণের মাধ্যমেই তিনি সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। এখানে আব্দের অর্থ হলো: আল্লাহর ইবাদতকারী ও তার অধিনস্থ দাস। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন একজন মানুষ, আর মানুষ যে পদার্থ হতে সৃষ্টি তিনি ও তা থেকেই সৃষ্ট। দুনিয়ার অন্য মানুষদের জীবনে যেমন ভাল-মন্দ ও বিপদাপদ আসে তিনিও তার আওতাভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} [الكهف: ١١٠]

বলো, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। ***সূরা কাহ্ফ ১৮: ১১০।***

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণভবে দাসত্বের হক্ব আদায় করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে নাবীর প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر:٣٦]

আল্লাহ কি তার দাসের পক্ষে যথেষ্ট নন? ***সূরা আয্ যুমার ৩৯: ৩৬।***

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ} [الكهف: ١]

সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন। ***সূরা কাহ্ফ ১৮: ১।*** আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الإسراء: ١]

পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় দাসকে রাত্রি বেলায় মসজিদে হারাম থেকে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। ***সূরা বানী ইসরাঈল ১৭: ০১।***

রসূলের অর্থ: সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে বিশ্ব মানবতাকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার জন্য প্রেরীত ব্যক্তিত্ব।

এদু'গুণের মাধ্যমে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তার ক্ষেত্রে কোন বাড়াবাড়ি বা মর্যাদাহানী করা যাবে না। রসূলের উম্মাতের দাবীদার অনেক ব্যক্তিই তার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করে। এমনকি তাকে দাসত্বের স্তর থেকে উপরে উঠিয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারই ইবাদত করা শুরু করেছে!!! ফলে অনেকেই তার নিকটে ফরিয়াদ করে! তার নিকটে এমন জিনিস প্রার্থনা করে যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ দিতে সক্ষম নয়!! যেমন, প্রয়োজন মিটানো এবং বিপদাপদ দূর করা ইত্যাদী।

অপর দিকে আরেক দল আবার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতকে অস্বীকার বা তার আনুগত্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি ও শিথিলতা করেছে। সাথে তার মতামত ও উক্তি বিরোধী বিষয়ের উপর নির্ভর করতঃ তার হাদীছসমূহ ও বিধানাবলীর অপব্যাখ্যা করে বিপথগামী হয়েছে।

তৃতীয়ত: شروط الشهادتين শাহাদাতাইনের শর্তাবলী

ক। **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্তাবলী:** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্যের মাঝে সাতটি শর্ত পাওয়া আবশ্যক। এই সাতটি শর্ত এক সাথে পাওয়া না গেলে তা পাঠে কোন উপকার হবে না। সংক্ষিপ্তাকারে সেই সাতটি শর্ত হলো:

প্রথম: ইল্‌ম বা জ্ঞান যা অজ্ঞতা-মূর্খতার বিপরীত।

দ্বিতীয়: দৃঢ় বিশ্বাস যা সন্দেহের বিপরীত।

তৃতীয়: গ্রহণ করা যা প্রত্যাখ্যানের বিপরীত।

চতুর্থ: আনুগত্য করা যা ছেড়ে দেয়ার বিপরীত।

পঞ্চম: ইখলাস বা একনিষ্ঠতা যা শিরকের বিপরীত।

ষষ্ঠ: সত্যনিষ্ঠা যা মিথ্যার বিপরীত।

সপ্তম: ভালোবাসা যা ক্রোধের বিপরীত।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্তাবলীর ব্যাখ্যা

প্রথম শর্ত: العلم বা জ্ঞানার্জন করা- অর্থাৎ এ কালিমার দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ, এর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক দিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। যা এই কালিমা সম্পর্কে অজ্ঞতার বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: ٨٦]

তবে তারা ব্যতীত যারা জেনেশুনে সত্য সাক্ষ্য দেয়। *সূরা যুখরুফ ৪৩:৮৬।*

'সাক্ষ্য দেয়া' বলতে এখানে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর" সাক্ষ্য দেয়া বোঝানো হয়েছে। আর 'জেনে শুনে' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের মুখে তারা যে সাক্ষ্য দিয়েছে তা তারা হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করে। যদি কেউ অর্থ না বুঝে বা না জেনে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" পাঠ করে তবে এটা তার উপকারে আসবে না। কারণ এই কালিমা যেসব অর্থ বহন করছে তার প্রতি সে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, নিছক একটি বাক্য উচ্চারণ করেছে মাত্র।

দ্বিতীয় শর্ত: اليقين বা দৃঢ় বিশ্বাস- এ কালিমার স্বীকৃতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচল প্রত্যয় সহকারে দিতে হবে যাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকবে না। যদি এর সার্বিক বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে তবে এ কালিমা তার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} [الحجرات: ١٥]

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না। *সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১৫।*

যদি কেউ এ কালিমার প্রতি সামান্য সন্দেহ পোষণ করে তবে সে মুনাফিক্ব বলে গণ্য হবে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

﴿فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ﴾

এই প্রাচীরের বাহিরে এমন যার সাথেই তোমার দেখা হবে যে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর" সাক্ষ্য দেয় তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও।[১৩]

অতএব, যে ব্যক্তি এ কালিমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে না সে জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য নয়।

তৃতীয় শর্ত: القبول বা গ্রহণ করা: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছুর ইবাদত (পূজা অর্চনা) পরিত্যাগ করাসহ এ কালিমার যাবতীয় চাহিদাকে গ্রহণ করা।

অতএব, কোন ব্যক্তি যদি এ কালিমা মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু বাস্তবে তা গ্রহণ করতঃ সে অনুযায়ী আমল না করে তবে সে ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

{إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ} [الصافات: ٣٥، ٣٦]

তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব। সূরা সফ্ফাত ৩৭:৩৫-৩৬।

কবরপূজারীদের অবস্থা এমনই। কারণ তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা সত্ত্বেও কবর পূজা পরিত্যাগ করে না। তাই তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থকে গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে না।

চতুর্থ শর্ত: الانقياد বা আনুগত্য করা: এ কালিমার দাবির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [لقمان: ٢٢]

যে ব্যক্তি স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্ অভিমূখী করে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। *সূরা লুক্বমান ৩১:২২।*

---

১৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩১, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৫৪৩।

এখানে 'মজবুত হাতল' বলতে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কে বোঝানো হয়েছে। 'আত্মসমর্পণ করে' অর্থাৎ ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে।

পঞ্চম শর্ত: الصدق বা সত্যনিষ্ঠা: হৃদয় বা অন্তরের সত্যতা সহকারে এ কালিমা পাঠ করতে হবে। যদি অন্তরে সত্যায়ন না করে শুধু মুখে এ কালিমা উচ্চারণ করে তবে সে ব্যক্তি মিথ্যুক ও মুনাফিক্ব বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [البقرة: ٨– ١٠]

আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে ধোকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন। *সূরা আল বাক্বারা ২:৮-১০।*

ষষ্ঠ শর্ত: الإخلاصُ বা একনিষ্ঠতা: তা হলো, বান্দার সকল কর্মকে শিরকের যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করা। সুতরাং বান্দা এ কালিমা উচ্চারণের মাধ্যমে দুনিয়ার কোন লোভনীয় বস্তু, সুনাম ও সুখ্যাতির উদ্দেশ্য করবে না।

ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

{فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ}

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে, আল্লাহ জাহান্নাম তার জন্য হারাম করে দিবেন (ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না)।[১৪]

১৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪০১, ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমা হা/১৬৫৩।

সপ্তম শর্ত: المحبة বা ভালবাসা- এ কালিমার প্রতি, তার অর্থের প্রতি এবং এ কালিমার দাবি অনুযায়ী যারা আমল করেন তাদেরকে ভালোবাসা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} [البقرة: ١٦٥]

আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। ***সূরা আল বাকারা ২:১৬৫***

খ। শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহর শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১। স্বীকারোক্তিসহ আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতকে বিশ্বাস করা।

২। প্রকাশ্যে এ কালিমাটুকু মুখে উচ্চারণ করা।

৩। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা। তিনি যে সত্য নিয়ে এসেছেন সে অনুযায়ী আমল করা। যে সকল বাতিল থেকে নিষেধ করেছেন তা হতে দূরে থাকা।[১৫]

৪। তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের যে সকল অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ণ করা।

৫। নিজের জীবন, ধন-সম্পদ, সন্তানাদি, পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ থেকেও তাকে বেশী ভালোবাসা।[১৬]

৬। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাকে সকলের কথার উপর প্রাধান্য দেয়া এবং তার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা।[১৭]

---

১৫. সূরা আল হাশর ৫৯:৭, সূরা আন নিসা ৪:৫৯
১৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪, ১৫।
১৭. সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১-৩।

চতুর্থঃ

مقتضى الشهادتين

শাহাদাতাইনের দাবি

ক। শাহাদাতু আল লা-ইলাহার দাবিঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সব বাতিল মাবূদ আছে তাদের ইবাদত ত্যাগ করা। কালিমায়ে তাওহীদের না বোধক বাণী "লা-ইলাহা" দ্বারা এটা বোঝানো হয়েছে। আর কালিমায়ে তাওহীদের হাঁ বোধক বাণী "ইল্লাল্লাহ" দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর সাথে কোন কিছুর শরীক না করে একমাত্র তারই ইবাদত করা। অনেক লোক এ কালিমা উচ্চারণ করে ঠিক, কিন্তু বাস্তবে তার চাহিদার বিপরীত কাজ করে।

ফলে মুখে সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের মাবূদ হওয়া অস্বীকার করলেও বাস্তবে তা অনেক সৃষ্টিজীব, কবর, মাযার, ত্বগূত, গাছ-পালা এবং পাথরের জন্য স্বীকার করে। এ সমস্ত লোকেরাই বিশ্বাস করে যে, তাওহীদ হলো নবাবিস্কৃত বিষয় (বিদ'আত)। যারা তাদেরকে এ পথে আহ্বান করে তাদেরকে তারা অস্বীকার করতঃ তাদের প্রতিবাদ করে। যারা এক আল্লাহর জন্য যাবতীয় ইবাদতকে নিষ্ঠার সাথে পালন করে তাদেরকে তারা দোষারোপ ও ঘৃণা করে।

খ। শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহর দাবিঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা, তাকে সত্যায়ন করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা, নবাবিস্কৃত সকল তরীকা বাদ দিয়ে কেবল মাত্র তার সুন্নাত মোতাবেক আমল করা এবং তার কথাকে সকল মানুষের কথার উপর প্রাধান্য দেয়া।

পঞ্চম:

نواقض الشهادتين

শাহাদাতাইন নষ্ট বা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

শাহাদাতাইন নষ্ট হলো ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ। কারণ, শাহাদাতাইনের উচ্চারণের মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করে। এ কালিমা উচ্চারণ করার অর্থ হলো এর নির্দেশিত পথকে স্বীকার করা এবং এ কালিমার চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন ইসলামী নিয়ম কানুন মেনে চলা। যদি কেউ এ সকল নিয়ম কানুন মেনে না চলে তবে শাহাদাতাইন উচ্চারণের সময় সে যে অঙ্গিকার করেছিল তা ভঙ্গ করল।

ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ অনেক। ফিক্বাহবিদগণ ফিক্বাহ্ শাস্ত্রে **"বাবুর রিদ্দাহ্"** নামে পৃথক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় হলো দশটি। শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহহাব রহিমাহুল্লাহ তা তার নিম্নোক্ত বাণীতে উল্লেখ করেছেন:

১। আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ١١٦]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। *সূরা আন্ নিসা আয়াত ৪: ১১৬।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: ٤٨﴾

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। *সূরা আন্ নিসা আয়াত ৪: ৪৮।*

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: ٧٢]

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। *সূরা আল মায়িদা ৫: ৭২।*

শিরকের অন্যতম হলো, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য পশু জবাই করা। যেমনঃ জ্বিন বা মাজারের নামে কোন কিছু জবাই করা।

২। আল্লাহ্ এবং বান্দার মাঝে মাধ্যম তৈরী করে তাদেরকে ডাকা, তাদের নিকটে সুপারিশ তলব করা এবং তাদের উপর ভরসা করা:

যারা এরূপ করবে তারা উলামাগণের সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যাবে।

৩। যারা মুশরিকদেরকে কাফির মনে করে না এবং তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের পথকেও সঠিক মনে করে:

এরূপ আক্বীদা পোষণকারী ব্যক্তিও কাফির।

৪। যারা দাবি করে যে, অন্যের হিদায়াত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **এর হিদায়াত অপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ অথবা অন্যের হুকুম (বিচার ফায়ছালা) রসূল** ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **এর বিচার ফায়ছালা থেকে উত্তম।**

যেমন: ঐ সমস্ত লোক যারা ত্বগুতের (আল্লাহ দ্রোহী শক্তির) বিধানকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়। ঐ সমস্ত লোকেরাও এর আওতার অন্তর্ভুক্ত যারা মানব রচিত মতবাদকে ইসলামী বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়।

৫। যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **যা নিয়ে এসেছেন সে অনুযায়ী আমল করা সত্ত্বেও এর কোন বিষয়ের প্রতি ক্রোধ বা ঘৃণা পোষণ করবে সে কাফির হয়ে যাবে।**

৬। যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **এর দীনের কোন অংশ, নেকী অথবা শাস্তি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ বা উপহাস করবে সে কাফির হয়ে যাবে।**

দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী,

{قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: ٦٥، ٦٦]

আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার হুকুম আহ্কামের সাথে এবং তার রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। *সূরা আত তাওবা ৯: ৬৫-৬৬।*

৭। যাদু করা: এর অন্তর্ভুক্ত হলো, দু'ব্যক্তির মাঝে বিচ্ছেদ অথবা ভালবাসা সৃষ্টি করা। (সম্ভবত শাইখ এর দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন, এমন কাজ যার দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ বা তাদের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি হয়)। যে এরূপ করবে অথবা এতে সন্তুষ্ট থাকবে সে কাফির। এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলা র বাণী:

{وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة: ١٠٢]

তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে যাদু শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তোমরা কাফির হয়ো না। *সূরা আল্ বাক্বারা ২: ১০২।*

৮। মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করা। এ ব্যক্তি কাফির হওয়ার দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: ٥١﴾

হে মুমিণগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। *সূরা মায়িদা ৫:৫১।*

৯। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, এমনও কিছু লোক রয়েছেন যারা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **এর শরী'আত মানতে বাধ্য নয়।**

যেমন, খিজির আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালাম এর শরী'আতের আওতাভুক্ত ছিলেন না। এরূপ আক্বীদা (বিশ্বাস) পোষণকারী ব্যক্তি কাফির।

শাইখ সালিহ আল ফাওযান বলেন: এর আওতাভুক্ত হবে অতিরঞ্জণকারী সূফীদের আক্বীদা বা বিশ্বাস। তারা এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছে যে, ঐ স্তরে তাদের জন্য রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না!! এমন আক্বীদা পোষণকারী সূফীরাও কাফির।

১০। আল্লাহর দীন (ইসলাম) হতে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকা, ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ না করা। আর শিক্ষা গ্রহণ করলেও সে অনুযায়ী আমল না করা। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} [الأحقاف: ٣]

আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। *সূরা আল আহকাফ ৪৬: ৩।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} [السجدة: ٢٢]

যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালিম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিব। *সূরা আস সাজদাহ ৩২: ২২।*

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব রহিমাহুল্লাহ বলেন:

উপরোক্ত ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়াবলীতে রসিকতাকারী, স্বেচ্ছাগ্রহী এবং ভীত শঙ্কিতের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে যাকে এসকল বিষয় করতে বাধ্য করা হয় তার বিষয়টি ভিন্ন। ইসলাম বিনষ্টকারী প্রতিটি বিষয়ই কঠিন ও মারাত্মক। এ সকল বিষয় অধুনা বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে সংঘটিত হচ্ছে। অতএব, মুসলিম ব্যক্তির উচিত এগুলো থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজেও এসকল বিষয়ে ভয় করা। আমরা আল্লাহর নিকটে তার ক্রোধ ও কঠিন শাস্তি আবশ্যককারী বিষয়াবলী হতে আশ্রয় চাচ্ছি।[১৮]

১৮. মাজমূ আত তাওহীদ আন্ নাজদিয়্যাহ্ ৩৭-৩৯।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

في التشريع

শরী'আত প্রণয়ন সম্পর্কে

শরী'আত প্রবর্তন করা একমাত্র আল্লাহর অধিকার: শরী'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বান্দার আক্বীদা ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং করণীয়-বর্জণীয় বিধানসমূহ যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। আল্লাহ কর্তৃক হালাল-হারাম করা বিষয়াদীও এ শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ কোন বিষয়কে হালাল বা হারাম বলে সাব্যস্ত করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [النحل: ١١٦]

তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। সূরা আন্ নাহল **১৬: ১১৬।**

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: ٥٩]

বল, আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক্ব হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বল, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করছ? *সূরা ইউনূস ১০: ৫৯।*

আল্লাহ কুরআন-হাদীছের দলীল ব্যতীত হারাম হালালের সিদ্ধান্ত বা ফতোওয়া দিতেও নিষেধ করেছেন। অন্যথায় আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা এসংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি দলীল ব্যতীত কোন জিনিসকে ফরয ও হারাম করে সে শরী'আত প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নিজেকে আল্লাহর সাথে শরীক (অংশীদার) সাব্যস্ত করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: ٢١]

তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? ***সূরা আশ্ শুরা ৪২: ২১।***

যে ব্যক্তি জেনে শুনে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত এ শরী'আত প্রবর্তকের আনুগত্য করবে এবং তার কাজকে মেনে নিবে সে ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর সাথে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করলো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: ١٢١]

যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। সূরা আন'আম **৬: ১২১।**

অর্থাৎ যারা আল্লাহর হারামকৃত মৃত বস্তুকে হালাল বলে সিদ্ধান্ত দেয় এবং যারা এ বিষয়ে তাদের আনুগত্য করে তারা মুশরিক। আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল এবং হালালকৃত বিষয়কে হারামের ক্ষেত্রে যারা নিজেদের ধর্মীয় আলিম ও আবেদদের অনুসরণ করবে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে রব্ব বা মা'বূদ হিসাবে গ্রহণ করলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: ٣١]

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, তারা তার শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। ***সূরা আত্ তাওবা ৯: ৩১।***

আদী ইবনে হাতিম রাদ্বিয়াল্লাহু উপরোক্ত আয়াত শুনার পর বললেন:

«يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم –: أليسوا يُحلون ما حرَّم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى، قال: فتلك عبادتهم»

হে, আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমরা (খ্রিষ্টান থাকাকালীন সময়ে) ধর্মজাযক ও পূরোহিতদের ইবাদত করতাম না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তারা আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল করলে তোমরা কি তা হালাল বলে মেনে নিতে না এবং আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে তারা হারাম বললে তোমরা কি তা হারাম বলে মেনে নিতে না? আদী ইবনে হাতিম রাদ্বিয়াল্লাহু বললেন, হ্যাঁ, এ কাজ আমরা করতাম। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: (এটাইতো তাদের ইবাদত করা)।[১৯]

শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান রহি. বলেন: উপরোক্ত হাদীছে এ দলীলই সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহর অবাধ্য হয় এমন কাজে ধর্মজাযক ও পূরোহিতদের আনুগত্য করলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত করা হয়। আর এটা এমন বড় শিরক ও পাপ যা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেন না। উপরোক্ত আয়াতের শেষাংসে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]

অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তার শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। সূরা আত্ তাওবা ৯: ৩১। অনুরূপ অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: ١٢١]

যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গুনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে-যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। *সূরা আন্ 'আম ৬: ১২১।*
নিজেদের অন্ধ অনুসরণকারীদেরকে নিয়ে অনেকেই এ বড় পাপে পতিত হয়েছে। কারণ কুরআন-হাদীছের কোন বিধান তাদের অনুকরণীয় ব্যক্তিবর্গের উক্তির

---

১৯. হাসান: সুনানে তিরমিযী হা/৩০৯৫।

বিপরীত হলে তারা তা আমলে না নিয়ে পীর-বুযুর্গ বা নিজেদের নেতাদের কথাকেই গ্রহণ করেছে। অথচ তা উল্লেখিত শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, আল্লাহর শরী'আত মেনে চলা এবং এতদভিন্ন যে কোন পথ ত্যাগ করা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবির আওতাভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা সকল ভাল কাজে সহযোগী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

العبادةُ: معناها، شُمولها

ইবাদতের অর্থ ও তার ব্যাপকতা সম্পর্কে

১। ইবাদতের অর্থ (সংজ্ঞা): ইবাদতের মূল অর্থ হলো- বিনয়, নম্রতা, বশীভূত হওয়া এবং আনুগত্য করা। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ইবাদতের অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। সবগুলো সংজ্ঞা প্রায় একই অর্থবোধক। ইবাদতের দু'টি সংজ্ঞা আমরা পেশ করব।

ক) রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাতু অস্ সালাম) ভাষায় আল্লাহর আদিষ্ট বিষয়ে তার আনুগত্য করাই হলো ইবাদত।

খ) ইবাদতের অর্থ হলো আল্লাহর নিকটে বিনয়, নম্রতা ও বশ্যতা স্বীকার করা। আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবেসে তার কাছেই নত হওয়া এবং তার বশ্যতা স্বীকারই হলো ইবাদত।

ইবাদতের সর্বাধিক পূর্ণ সংজ্ঞা হলো: ইবাদত হলো, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কথা ও কাজের সমন্বয়ের এক বিশেষ নাম, যে কথা ও কাজগুলো আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন এবং তাতে সন্তুষ্ট হন। এ ইবাদতের তিনটি প্রকারভেদ রয়েছে:

(১) অন্তরের ইবাদত,
(২) জিহ্বা দ্বারা বা কথাবার্তার ইবাদত এবং
(৩) অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে ইবাদত।

অতএব ভয়, আশা, ভালোবাসা, নির্ভরতা বা ভরসা, পুরস্কারের আশা-আকাঙ্খা এবং শাস্তির ভয়-এ সবই হচ্ছে অন্তরের ইবাদত।

জিহ্বা ও অন্তর দ্বারা তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা), তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা), তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা), আল্লাহর প্রশংসা এবং শুকরিয়া আদায় করা মৌখিক ও অন্তরের ইবাদত।

এছাড়া ছ্বলাত, যাকাত, হাজ্জ এবং জিহাদ- হচ্ছে শারীরিক ও অন্তরের ইবাদত। এছাড়াও অনেক ইবাদত রয়েছে যা অন্তর, জিহ্বা এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ইবাদতের জন্যই আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলুক্বকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: ٥٦– ٥٨]

আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তা'আলাই তো রিযিক্ব দাতা, পরাক্রমশালী শক্তির আধার। *সূরা আয্ যারিয়াত ৫১: ৫৬-৫৮।*

আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দিয়েছেন যে, জ্বিন এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা। তবে বান্দার ইবাদতের কোন প্রয়োজনীয়তা আল্লাহর নেই। বরং আল্লাহর নিকটে মুখাপেক্ষী হওয়ার দরুন বান্দারই উচিত আল্লাহর শরী'আত মোতাবেক তার ইবাদত করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে অস্বীকার করে সে অহংকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং তার সাথে অন্য কাহারো ইবাদত করলো সে মুশরিক। আর যে ব্যক্তি শরী'আত বহির্ভূত পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করলো সে বিদ'আতী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর শরী'আত মোতাবেক তার ইবাদত করলো সে মুমিন ও তাওহীদপন্থী।

২। ইবাদতের প্রকারসমূহ এবং ব্যাপকতা: ইবাদত অনেক প্রকার। বাহ্যিকভাবে জিহ্বা, অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং আত্মা কেন্দ্রীক আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যশীল যাবতীয় কাজই ইবাদত। যেমন: যিকির, তাসবীহ্, তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াত, ছ্বলাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, জিহাদ, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে বাধা দেয়া, নিকটাত্মীয়-ইয়াতীম-ফকীর-মিসকীন এবং মুসাফিরের প্রতি দয়া করা, আল্লাহ এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালোবাসা, আল্লাহকে ভয় করা এবং তার অভিমুখী হওয়া, দীনকে কেবলমাত্র তার জন্য একনিষ্ঠ করা, আল্লাহর হুকুমের ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধারণ করা এবং তার ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহর উপরই ভরসা করা, তার রহমত বা দয়ার আশা করা, তার শাস্তি হতে ভয় করা ইত্যাদি।

মোট কথা, মুমিন ব্যক্তি যদি তার কার্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন বা এ কাজে সহযোগীতা হোক এমন উদ্দেশ্য করে তবে তার চলা-ফেরা, উঠা-বসা ইত্যাদি সব কিছুই ইবাদত বলে গণ্য হবে। এমনকি অভ্যাস বা মানবিক বিষয়াদি দ্বারা যদি মুমিন ব্যক্তি আনুগত্যের কাজে শক্তি অর্জন উদ্দেশ্য করে থাকে তবে তাও ইবাদত বলে গণ্য হবে।

যেমন: ঘুমানো, পানাহার, কেনা-বেচা, রিযিক্ব অন্বেষণ, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি। এ অভ্যাস বা মানবিক প্রয়োজনগুলোর ক্ষেত্রে সৎ নিয়্যাত রাখলে তা ইবাদতে

পরিণত হয় এবং মুমিন বান্দাকে এর বিনিময়ে ছাওয়াব দেয়া হয়। পরিচিত ও নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতা, প্রতীক এবং কার্যাদির মধ্যে ইবাদত সীমাবদ্ধ নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

في بيانِ مفاهيمَ خاطئةٍ في تحديد العبادة

ইবাদতের সংজ্ঞায়নে ভুল ত্রুটি বিষয়ে

ইবাদত তাওক্বীফী তথা আল্লাহ ও তার রসূলের কথায় সীমাবদ্ধ। অন্য ভাষায়, কুরআন হাদীছের দলীল ব্যতীত কোন বিষয়কে ইবাদত বলে গণ্য করা যাবে না। কুরআন হাদীছ দ্বারা যা প্রমাণিত নয় তা বিদ'আত ও প্রত্যাখ্যাত।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (صحيح مسلم ١٧١٨)

যারা এমন কোন কাজ করে যা আমাদের শরী'আত অনুমোদিত নয় তা পরিত্যাজ্য।[২০]

অর্থাৎ তার এ কাজ তার প্রতিই প্রত্যাখ্যাত হবে। এটা তার পক্ষ হতে গ্রহণ করা হবে না, বরং এ জন্য সে গুনাহগার হবে। কারণ তাতে আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য হবে না, বরং হবে অবাধ্যতা।

শারঈ ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে সঠিক নীতি হলো, ঢিলেমী-অলসতা এবং অতিরঞ্জন-বাড়াবাড়ির মাঝে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আল্লাহ তা'আলা তার নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন,

{فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا} [هود: ١١٢]

অতএব, তুমি এবং তোমার সাথে যারা তাওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলো, যেমন তোমায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। ***সূরা হুদ ১১: ১১২।***

উপরোক্ত আয়াতে ইবাদত আদায়ের সঠিক নীতি তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো, ইবাদত আদায়ে মধ্যপথের উপর স্থায়ী থাকা। তাতে বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন এবং অবহেলা বা শিথিলতা থাকবে না। অর্থাৎ শরী'আত যেভাবে আদেশ করেছে সেভাবেই ইবাদত করবে। এর পর আল্লাহ তা'আলা তার বাণী **ولا تطغوا** (বাড়াবাড়ি করবে না) দ্বারা এ বিষয়টিকে আরো তাগিদ যুক্ত করেছেন।

---

২০. ছ্বহীহ্ মুসলিম ১৭১৮, ছ্বহীহ বুখারী ২১৪২ হাদিছের অধ্যায়ে, দারাকুৎনী ৪৫৩৭।

“তুগইয়ান” বা বাড়াবাড়ি হলো, কঠোরতা ও রূঢ়তার সহিত সীমাতিক্রম করা। আর এটাই হলো গুলু বা অতিরঞ্জন।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার তিনজন ছাহাবী কর্তৃক নিজেদের আমলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কথা জানতে পারলেন, [যাদের একজন বলেছিলেন, আমি সারা জীবন সিয়াম রাখবো কোন দিন সিয়াম ছাড়বো না, অন্যজন বলেছিলেন, আমি সারা রাত ছ্বলাত আদায় করবো, রাত্রে কখনো ঘুমাবো না, তৃতীয় জন বলেছিলেন, আমি কখনো বিয়ে করবো না] তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেছিলেনঃ তোমরা এমন কথা বলেছো! কিন্তু আমি সিয়াম রাখি এবং সিয়াম ছাড়ি, আমি বিয়েও করেছি। অতএব, যারা আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২১] অথচ ইবাদতের ক্ষেত্রে বর্তমানে পরস্পর বিরোধী দু’টি দল দেখা যায়।

প্রথম দলঃ এরা ইবাদতের সংজ্ঞা বা মর্ম বুঝতে ত্রুটি করতঃ তা আদায়ে অবহেলা করেছে এমনকি অনেক ইবাদতকে তারা বাদই দিয়েছে। এরা কিছু নির্দিষ্ট কাজ ও কৃষ্টি-কাল্চারে ইবাদতকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে যা শুধু মসজিদে আদায় করা হবে। এদের নিকটে বাড়ি, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বানিজ্য, রোড-ঘাট, লেনদেন, রাজনীতি, মতোবিরোধ মূলক বিষয়ের সমস্যা সমাধান এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইবাদতের কোন স্থান নেই। হ্যাঁ, মসজিদের ফযীলত রয়েছে, মসজিদেই পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত আদায় করা ওয়াজিব, কিন্তু ইবাদত মসজিদের ভিতরে বাহিরে এক জন মুসলিমের পুরো জীবনকে শামিল (অন্তর্ভুক্ত) করে।

দ্বিতীয় দলঃ তারা ইবাদত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এত বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা করেছে যে তাকে চরম পন্থায় নিয়ে গেছে। মুস্তাহাব আমলকে ওয়াজিবের পর্যায়ে উন্নিত করেছে। কিছু হালাল বস্তুকেও হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছে।

আর যারা তাদের এ নীতির বিপরীতে যাবে তাদের চিন্তা-ধারা ও নীতিকে পথ ভ্রষ্ট বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সবচেয়ে উত্তম দিক নির্দেশনা হলো মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ নির্দেশনা, এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো দীনের মাঝে নতুন কিছু সংযোজন করা।

---

২১. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০৬৩ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪০১, সুনানে নাসাঈ হা/৩২১৭।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

في بيان ركائز العبودية الصحيحة

সঠিক ইবাদতের খুঁটি বা রুকনসমূহ

ইবাদত তিনটি খুঁটি বা স্তম্ভের উপর স্থাপিত। স্তম্ভ তিনটি হলো:

১। الحبُّ বা ভালোবাসা (বিনয় ও নম্রতাসহ),

২। الخوفُ বা ভয়

৩। الرجاء বা আশা-আকাঙ্খা।

অতএব, ইবাদতের মাঝে নতি ও বশ্যতাসহ ভালোবাসা এবং ভীতিসহ আশা-আকাঙ্খা থাকা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

{يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة: ٥٤]

তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারা তাকে ভালোবাসে। *সূরা আল্ মায়িদা ৫: ৫৪।*

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} [البقرة: ١٦٥]

যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। *সূরা আল্ বাক্বারা ২: ১৬৫।*

আল্লাহ তার রসূল ও নাবীগণের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

{إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ}

তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত। *সূরা আম্বিয়া ২১: ৯০।*

সালাফ তথা পূর্ববর্তী কতোক বিজ্ঞ আলিম বলেন: যে ব্যক্তি শুধু ভালোবাসা সহকারে আল্লাহর ইবাদত করে সে যিন্দিক্ব বা নাস্তিক। যে ব্যক্তি শুধু আশা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে সে মুরজিয়াহ (আমল করে না) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর যে শুধু ভয়-ভীতি নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে সে হারুরী (খারিজী সম্প্রদায়ভুক্ত)। অপরদিকে যে ব্যক্তি ভালোবাসা, ভয় এবং আশা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে সে মুমিন এবং তাওহীদপন্থী।[২২]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ তার আল উবূদিয়াহ গ্রন্থে বলেন: "আল্লাহর দীন হলো- তার ইবাদত এবং আনুগত্য করা। বিনয়ী হয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করা।

ইবাদতের মূল অর্থ হলো- বিনয়ী হওয়া, নতি ও বশ্যতা স্বীকার করা। বলা হয়- طريق معبد (ত্বরীক্বুন মু'আব্বাদুন-রাজ পথ), এটা ঐ রাস্তাকে বলা হয় যে রাস্তা দিয়ে সর্বদা লোক চলাচল করে তাকে পদদলীত ও পূরোনো করে দেয়। তবে আমাদেরকে যে ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে তা বশ্যতা-নম্রতা এবং ভালোবাসাকে শামিল করে।

অতএব, ইবাদতে আল্লাহর জন্য নিরঙ্কুশ আনুগত্য স্বীকার ও ভালোবাসা থাকতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি কারো বশ্যতা স্বীকার করা সত্ত্বেও অন্তরে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তাহলে সে তার আনুগত্যশীল হতে পারে না। অনুরূপ কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে কিন্তু তার প্রতি বিনয়ী না হয় তাহলে সেও তার আনুগত্যশীল বলে গণ্য হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি তার ছেলে এবং বন্ধুকে ভালোবাসে। এজন্য আল্লাহর ইবাদতে বশ্যতা এবং ভালোবাসার কোন একটি গুণ থাকলেই যথেষ্ট হবে না। বরং বান্দা কর্তৃক আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসতে ও সম্মান করতে হবে। এরচেয়েও সত্য যে, পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও বিনয় নম্রতার একমাত্র হক্বদার হলেন মহান রব্বুল আলামীন।"[২৩]

এগুলো ইবাদতের রুকন যার উপর তা পরিচালিত ও সম্পাদিত হয়। আল্লামাহ ইবনুল ক্বাইয়িম রহি. তার তাওহীদ বিষয়ক নূনিয়্যাহ কবিতায় বলেন:

وعبادة الرحمن غاية حُبّه ... مع ذُلِّ عابده هما قُطْبان

وعليهما فَلَكُ العبادة دائر ... ما دار حتى قامت القُطْبان

---

২২. রিসালাতুল উবূদিয়্যাহ, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ।
২৩. মাজমু'আতুত্ তাওহীদ আন্ নাজদিয়্যাহ ৫৪৯ পৃষ্ঠা।

ومداره بالأمر أمر رسوله ... لا بالهوى والنفس والشيطان

[إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ١/ ٤٦]

সর্বোচ্চ বিনয়ের সাথে সর্বাধিক ভালোবাসাই হলো আল্লাহর ইবাদত।

বিনয় ও ভালোবাসা হলো ইবাদতের অক্ষ দন্ড।

এর উপরই ইবাদতের কক্ষপথ (চাকি) ঘূর্ণায়মান।

এ অক্ষদন্ড ঠিক না হলে কক্ষপথ চলবে না।

এর ভাল-মন্দ রসূলের নির্দেশ উপর নির্ভরশীল।

খেয়াল-খুশী, আত্মপ্রবৃত্তি এবং শয়তানির উপর ইবাদতের ভাল-মন্দ নির্ভরশীল নয়।

ইবনে ক্বাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর জন্য বিনয় ও ভালোবাসার উপর ইবাদতের নির্ভরতাকে অক্ষ দন্ডের উপর চাকার নির্ভরতার সাথে তুলনা করেছেন।

তিনি বলেন, ইবাদতের সীমারেখা রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ এবং নির্ধারণের উপর স্থাপিত। খেয়াল খুশী, আত্মপ্রবৃত্তি এবং শয়তানের উপর ইবাদত নির্ভর করে না। খেয়াল খুশী অনুযায়ী কিছু করলে তা ইবাদত হবে না।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা শরী'আত সম্মত করেছেন তাই ইবাদতের চাকাকে ঘুরাবে। বিদ'আত, অপসংস্কৃতি, আত্মপ্রবৃত্তি এবং বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ইবাদতের চাকাকে পরিচালনা করে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

في بيان شروط قَبولِ العبادة والعمل: وهي الإخلاصُ ومتابعة الشرع

আমল ও ইবাদত কবুলের শর্তাবলী:

ইখলাস বা একনিষ্ঠতা এবং শরী'আত তথা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত মোতাবেক হওয়া।[২৪]

---

২৪. **ইখলাস বা একনিষ্ঠতা:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

"জেনে রাখুন! আল্লাহর জন্যই নিষ্ঠাপূর্ণ দীন" (ইবাদত)। *সূরা যুমার: ৩*

﴿فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾

"অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন" *। সূরা যুমার: ২*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

(أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)

যে ব্যক্তি অন্তর থেকে নিষ্ঠার সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফাআত পেয়ে সবচেয়ে বেশী ধন্য হবে। ***ছ্বহীহ বুখারী ৯৯।***

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন:

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

"যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন"। ***ছ্বহীহ বুখারী ৪২৫, ছ্বহীহ মুসলিম ৩৩।***

শরী'আত তথা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত মোতাবেক হওয়া:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

রসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। ***সূরা আল হাশর ৫৯:৭।***

নাবী কারীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد

যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। *ছ্বহীহ বুখারী* ২৬৯৭, *ছ্বহীহ মুসলিম* ১৭১৮, *আবূ দাউদ* ৪৬০৬, *ইবনে মাজাহ* ১৪

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [٤:٦٥]

অতএব তোমার রবের কসম তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তার তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়। *সূরা আন নিসা ৪:৬৫*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [٤٧:٣٣]

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না। *সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৩*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হই। *ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪-১৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৪।*

অষ্টম পরিচ্ছেদ

في بيان مراتب الدين وهي: الإسلام – والإيمان – والإحسان. تعريفها وما بينها من عموم وخصوص

দীনের স্তর সম্পর্কে: ইসলাম - ঈমান - ইহসান। প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ও পারস্পরিক সম্পর্ক।[২৫]

ইসলাম: ইসলাম হলো তাওহীদ (একত্ব) ও আনুগত্যের সহিত এক আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করা এবং শিরক থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে নিজেকে সোপর্দ করে, তার চাইতে উত্তম দীন আর কারো নিকট আছে কি? *সূরা আন নিসা:* ১২৫

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾

"আর যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল"। *সূরা লুকমান:* ২২

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾

"তোমাদের সত্য মা'বূদ হচ্ছেন মাত্র একজন (আল্লাহ)। সুতরাং তোমরা তারই জন্য অনুগত হও। আপনি বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন"। *সূরা হজ্জ:* ৩৪

ইসলাম শব্দটি যখন এককভাবে ব্যবহৃত হবে, তখন দীনের সকল স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করবে

---

২৫. দীনের স্তর হচ্ছে তিনটি:

(১) ইসলাম (الاسلام)

(২) ঈমান (الإيمان)

(৩) ইহসান (الاحسان)। এগুলো থেকে কোন একটি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলে পূর্ণ ইসলামকে বুঝাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الأِسْلاَمُ﴾

"আল্লাহর নিকট ইসলাম হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দীন"। *সূরা আল-ইমরান: ৩:১৯*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ

"গরীব অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছে। আর অচিরেই যেভাবে তার সূচনা হয়েছিল, সে রকম গরীবঅবস্থায় ফেরত আসবে"। *ছ্বহীহ মুসলিম ১৪৫, ইবনে মাজাহ ৩৯৮৬।*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

أَفْضَلُ الإِسْلاَمِ إِيْمَانٌ بِاللهِ

"ইসলামের সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা"। *ছ্বহীহ বুখারী* ২৬, *ছ্বহীহ মুসলিম ৮৩, মুসনাদে আহমাদ ৭৫৯০।*

ইসলামের পাঁচটি রুকন

জিবরীল আ. যখন দীন সম্পর্কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, তখন উত্তরে তিনি বললেন,

الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

"ইসলাম হচ্ছে এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রসূল। ছ্বলাত কায়েম করা। যাকাত আদায় করা। রামাদ্বানে ছিয়াম পালন করা। সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘরের হাজ্জ আদায় করা।" ***ছ্বহীহ বুখারী ৮, ছ্বহীহ মুসলিম ৮।***

ঈমান: ঈমান হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আমলের নাম। অর্থাৎ অন্তর ও জবানের স্বীকারোক্তি এবং অন্তর, জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মকে ঈমান বলা হয়। আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপ কাজের মাধ্যমে তা কমে যায়। ঈমানের ক্ষেত্রে মুমিনগণ পরস্পর সমান নয়; বরং তাদের একজন অপরজনের চেয়ে কম বা বেশী মর্যাদার অধিকারী।

স্বীকারোক্তি এবং আমল-এ দু'টির সমষ্টির নাম ঈমান:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

"কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ঈমানের মুহাব্বত সৃষ্টি এবং তা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন"। *সূরা আল হুজুরাত: ৭*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

"তোমরা আল্লাহ এবং তার রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর"। *সূরা আল আ'রাফ: ১৫৮*

এটিই হচ্ছে (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং (محمد رسول الله- মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ) এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ। এ দু'টি বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়া ব্যতীত কোন বান্দাই ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। বিশ্বাসের দিক থেকে উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়া অন্তরের কাজ এবং উচ্চারণের দিক থেকে বিচার করলে এ দু'টি জবানের কাজ। অন্তর এবং জবানের স্বীকারোক্তি ও আমল এক সাথে পাওয়া না গেলে ঈমান হবে মূল্যহীন।

আমলের অপর নাম যে ঈমান সে দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾

"আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করবেন না"। *সূরা আল বাকারা: ১৪৩*

অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে তোমাদের আদায়কৃত ছ্বলাতকে নষ্ট করবেন না। আল্লাহ তা'আলা এখানে ছ্বলাতকে ঈমান বলে নামকরণ করেছেন। আর ছ্বলাত হল অন্তর, জবান এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মের সমষ্টিগত নাম।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদ, লাইলাতুল কদরের ইবাদত, রমাদ্বানের সিয়াম, তারাবীর ছ্বলাত এবং গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ দান করে দেয়া এবং অন্যান্য আমলকে ঈমান হিসাবে গণ্য করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল:

أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

"কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন: আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। *ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫১৯, মুসলিম হা/৮৩।*

ঈমান শব্দটি এককভাবে উল্লেখিত হলে তা দ্বারা পূর্ণ দীন উদ্দেশ্য:

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ

"আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমন করল, তখন তিনি তাদেরকে বললেন: আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিচ্ছি। তারপর তিনি বললেন: "এক আল্লাহর প্রতি ঈমান কাকে বলে তোমরা

কি জান? তারা বলল: আল্লাহ এবং তার রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন: এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হল এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। ছ্বলাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রামাদ্বানের সিয়াম রাখা এবং গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা। *ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩।*

ঈমানের ছয়টি রুকন:

জিবরীল ফেরেশতা যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন: আমাকে বলুন ঈমান কি? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেস্তাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তার রসুলদের প্রতি, আখিরাত বা শেষ দিবসের প্রতি এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি। *ছ্বহীহ বুখারী, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮।*

'ইহসান': আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

তোমরা ইহ্সান কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইহ্সানকারীদের ভালবাসেন। *সূরা বাকারা:* **১৯৫**

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার (আল্লাহ ভীরু) এবং যারা সৎকর্ম করে।" সূরা নাহাল:১২৮

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾

"আর যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ন হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল"। *সূরা লুকমান:* ২২

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾

"যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম বস্তু (জান্নাত) এবং আরও অতিরিক্ত নিয়ামত (আল্লাহর দীদার)"। *সূরা ইউনুস:* ২৬

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ﴾

"উত্তম কাজের পুরস্কার উত্তম (জান্নাত) ব্যতীত আর কি হতে পারে"? *সূরা আর্ রাহমান: ৬০*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

"আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর ইহসান আবশ্যক করেছেন"। *ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৫৫।*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ، وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَهُ»

"ঐ ক্রীতদাসের জন্যে সৌভাগ্য, যে ইহ্সানের সাথে (উত্তম ভাবে) আল্লাহর ইবাদত এবং একনিষ্ঠতার সাথে স্বীয় মনিবের খেদমত করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। সে কতই না সৌভাগ্যবান"। ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ১৬৬৭

জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে বলুন: তখন তিনি বললেন:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"ইহসান হল, এমন ভাবে তুমি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে যেন তাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। যদি তাকে দেখতে না পাও তবে বিশ্বাস করবে যে, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন"। *ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০, মুসলিম হা/৮, আবূদাউদ হা/৪৬৯৫।*

সুতরাং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ইহসানের দু'টি স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তরটি হচ্ছে, আপনি অন্তর দিয়ে এ বিশ্বাসে আল্লাহর ইবাদত করবেন, যেন আপনি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন। এটি হচ্ছে আল্লাহকে চাক্ষুষ দর্শনের স্তর। তা হলো, বান্দা অন্তর দিয়ে আল্লাহকে দেখার দাবী অনুযায়ী তার ইবাদত করবে এবং ঈমানের মাধ্যমে অন্তরকে এমন আলোকিত করবে, যাতে অনুপস্থিত বস্তুকেও তার সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। এটিই হচ্ছে ইহ্সানের আসল স্তর।

আর **দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে,** মুরাকাবার স্তর। তা হচ্ছে বান্দা এতটুকু আন্তরিকতা নিয়ে আমল করবে যে, সে মনে করবে আল্লাহ তাকে দেখছেন, তার প্রত্যেক আমল সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তার অতি নিকটেই আছেন। কেননা বান্দা যখন ইবাদতে এই পরিমাণ মনোযোগ তৈরী করবে, তখন ইবাদতে একনিষ্ঠ হবে। তার এই মনোযোগ তাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করা হতে এবং আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করা হতে বিরত রাখবে।

توحيد الأسماء والصفات

৩। তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত

এ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে:

প্রথমত: আল্লাহর নাম ও গুণাবলী প্রমাণে কুরআন, হাদীছ এবং জ্ঞানগত (যুক্তিগত) দলীল।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্তে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের নীতি।

তৃতীয়ত: যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বা তার কিছু অংশকে অস্বীকার করে তাদের প্রতিবাদ।

প্রথমত:

الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء والصفات

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী প্রমাণে কুরআন, সুন্নাহ এবং জ্ঞানগত দলীল

কুরআন সুন্নাহ হতে দলীল: আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তাওহীদ তিন প্রকার: তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ, তাওহীদে উলূহিয়্যাহ্ এবং তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাত। তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ ও উলূহিয়্যাহ এর কিছু দলীল আমরা পেশ করেছি। এখানে আমরা তৃতীয় প্রকার তাওহীদ তথা তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাতের কিছু দলীল পেশ করব।

ক। কুরআন হতে তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাতের দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف: ١٨٠]

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। *সূরা আল 'আরাফ ৭: ১৮০।*

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের জন্য নামসমূহ সাব্যস্ত করে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, ঐ নামগুলো সবই উত্তম। ঐ নামসমূহ দ্বারা তাকে আহ্বান করারও আদেশ দিয়েছেন। যেমন: ইয়া আল্লাহ, ইয়া-রহমান, ইয়া-রহীম, ইয়া-হাইয়্যু, ইয়া ক্বাইয়্যুম, ইয়া রব্বাল আলামীন বলা। আর যারা অস্বীকার অথবা অপব্যাখ্যা বা অন্য কোন পন্থায় তার নামের ক্ষেত্রে বাঁকা পথে চলে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা করুণ পরিণতির ওয়াদা দিয়েছেন। **আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى [طه: ٨]﴾

আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য-ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমন্ডিত নাম তারই। *সূরা ত্বহা ২০: ৮।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الحشر: ٢٢– ٢٤]

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তারই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তার পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। *সূরা আল্ হাশর ৫৯:২২-২৪।* উপরোক্ত আয়াতগুলো আল্লাহর নামসমূহ সাব্যস্তের প্রমাণ বহন করে।

খ। সুন্নাতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী প্রমাণের দলীল: আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

আল্লাহর এক কম একশটি তথা নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো হিফাযত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৬]

আল্লাহর নামসমূহ নিরানব্বইয়ে সীমিত নয়। এর প্রমাণ হলো প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ

---

২৬. ছ্বহীহ বুখারী ২৭৩৬, ৭৩৯২, মুসলিম ২৬৭৭, ইবনে মাজাহ ৩৮৬০।

عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي - [مسند أحمد٣٧١٢]

কোন ব্যক্তি চিন্তা-দূঃখ-কষ্ট ও উৎকণ্ঠায় নিমজ্জিত হয়ে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়লে আল্লাহ তা'আলা তার চিন্তা ও কষ্ট দূর করে তথায় শান্তি ও খুশী দান করবেন। দু'আটি নিম্নরূপ:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي

হে আল্লাহ, আমি তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দা-বান্দির সন্তান। আমার ভাগ্য তোমার হস্তে, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফায়ছালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির মাধ্যমে যে নাম তুমি তোমার জন্য রেখেছো, অথবা সেই নাম যা তোমার সৃষ্টজীবের মধ্যে কাহাকেও শিখিয়ে দিয়েছো, অথবা সেই নাম যা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো, অথবা স্বীয় ইলমের ভান্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছো তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআন মাজীদকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জন্য জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী।[২৭]

আল্লাহর প্রত্যেকটি নামই তার গুণকে শামিল করে। আল্লাহর নাম আলীম (মহাজ্ঞানী-সর্বোজ্ঞ) তার ইলম বা জ্ঞানের, হাকীম (প্রজ্ঞাময়) তার প্রজ্ঞার, সামী' (সর্বশ্রোতা)-বাসীর (সর্ব দ্রষ্টা) তার শোনা ও দেখা প্রমাণ করে। এমনিভাবে আল্লাহর প্রত্যেকটি নাম তার একেকটি গুণ প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [سورة الإخلاص: ١ – ٤]

---

২৭. মুজামুল কাবীর তাবারানী ১০৩৫২, মুসনাদে আহমাদ ৩৭১২।

বলুন, তিনি আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। সূরা ইখলাস ১১২: ১-৪।

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত:

كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا أَتَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ [صحيح البخاري ٢٣٣/٣]

একজন আনসারী ব্যক্তি মসজিদে কুবাতে তাদের ইমামতি করতেন। তিনি যখনি সূরা ফাতিহার পরে কোন সূরা মিলাতেন তখন প্রথমে সূরা ইখলাস পড়তেন। এর পর তার সাথে অন্য আরেকটি সূরা পড়তেন। প্রত্যেক রাকাতেই তিনি এরূপ করতেন। তার সাথীগণ এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বললেন: আপনি প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখলাস দিয়ে কিরাত শুরু করেন, এর পর তা যথেষ্ট মনে না করে অন্য সূরা তার সাথে মিলান। হয় আপনি শুধু সূরা ইখলাস পাঠ করুন। আর না হয় এটা বাদ দিয়ে অন্য সূরা দিয়ে ছ্বলাত পড়ান। ঐ ছাহাবী বললেন: আমি প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করা ছাড়বো না। তোমরা চাইলে আমি তোমাদের ইমামতি করব। আর আমার এরূপ করা তোমাদের অপছন্দ হলে আমি তোমাদের ইমামতি থেকে ইস্তফা দিবো। আর কুবাবাসী তাকেই তাদের মধ্যে ভাল জানতেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তাদের ইমামতি করুক তা তাদের পছন্দও নয়। তারা যখন নাবী কারীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে আসলেন তখন তাকে ঐ ঘটনাটি খুলে বললেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে অমুক ব্যক্তি! তোমার সাথীরা তোমাকে যা আদেশ দেন তা করতে তোমাকে কিসে বাধা দেয়? কেন তুমি প্রত্যেক রাকাতে এ সূরা পাঠ কর? ঐ ছাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু বললেন: আমি এ সূরাটিকে ভালোবাসি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এ সূরাটিকে ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[২৮] আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট মুজাহিদ দলের নেতৃত্ব দিয়ে একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদের ছ্বলাত পড়াতে গিয়ে প্রত্যেক রাকাতে কিরাতের শেষে সূরা ইখলাস পড়তেন। অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সাথীরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে তা উল্লেখ করলেন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাকে জিজ্ঞাসা করো কেন সে এরূপ করতো? তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: এ সূরাটি আল্লাহর গুণাবলী সম্বলিত। তাই প্রত্যেক রাকাতে কিরাতের শেষে তা পাঠ করতে আমি ভালোবাসি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাকে বল, আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন।[২৯] আল্লাহ তা'আলার মুখমণ্ডল আছে এ সংবাদ জানিয়ে তিনি বলেন,

{وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: ٢٧]

একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারাই কিয়ামতের দিন অবশিষ্ট থাকবে (দুনিয়ার উপর বিদ্যমান সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে)। *সূরা আর্ রহমান ৫৫: ২৭।*

আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তার দু'হাত আছে। তিনি বলেন,

{لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: ٧٥]

আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি। *সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৫।* অপর আয়াতে তিনি বলেন:

{بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: ٦٤]

---

২৮. ছ্বহীহ বুখারী ৭৭৪ নং হাদীছ পরবর্তী অধ্যায়।
২৯. ছ্বহীহ বুখারী ৭৩৭৫।

বরং তার উভয় হস্ত উম্মুক্ত। *সূরা আল মায়িদা ৫: ৬৪।*

আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, ভালোবাসেন, রাগান্বিত-ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হন। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা নিজেকে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করেছেন।

গ। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী প্রমাণে জ্ঞানগত (যুক্তিগত) দলীল:

১। বিভিন্ন প্রকার বৃহদাকার সৃষ্টিজীবসমূহ, তাদের বিভিন্ন ধরণের হওয়া, নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিজেদের কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেওয়া, তাদের জন্য নির্ধারিত পথে চলা আল্লাহর বড়ত্ব, শক্তি, ইলম, হিকমাত, ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় বা বাসনার প্রমাণ বহন করছে।

২। ইহসান ও নিয়ামত দেয়া, দয়া করা, বিপদাপদ ও ক্ষতি দূর করা এ সমস্ত কাজ আল্লাহর রহমত, দানশীলতা এবং মহানুভবতার প্রমাণ বহন করছে।

৩। অবাধ্য ও পাপীদেরকে শাস্তি দেওয়া এবং তাদের বদলা গ্রহণ করা তাদের উপর আল্লাহর রাগ-ক্রোধ এবং তাদের প্রতি তার ঘৃণার প্রমাণ বহন করছে।

৪। আনুগত্যশীলদেরকে মর্যাদা ও ছাওয়াব প্রদান তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ভালোবাসার প্রমাণ বহন করছে।

দ্বিতীয়ত:

منهجُ أهل السّنَّة والجماعة في أسماء الله وصفاته

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতি

সালফে সালিহীন এবং তাদের অনুসারীসহ সকল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতি হলো: কুরআন ও হাদীছে যেভাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে ঠিক সেভাবেই স্বীকার করা।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাদের নীতি নিম্নোক্ত নিয়মের উপর স্থাপিত:

১। কুরআন ও সুন্নাতে যেভাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী এসেছে বাহ্যিকভাবে সেগুলোর শব্দ ও অর্থকে তারা সেভাবেই সাব্যস্ত করেন। তার বাহ্যিক স্থান, শব্দ এবং উদ্দিষ্ট অর্থ হতে পরিবর্তন এবং অপব্যাখ্যা করেন না।

২। আল্লাহর গুণের সাথে মানুষের গুণের সাদৃশ্য হওয়াকে তারা অস্বীকার করেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: ١١]

আল্লাহর সাদৃশ্য কোন জিনিস নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। *সূরা আশ্ শূরা ৪২: ১১।*

৩। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করতে গিয়ে তারা কুরআন ও সুন্নাহর গন্ডি অতিক্রম করেন না। ফলে আল্লাহ তা'আলা ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন তারা কেবল সে নামগুলোই সাব্যস্ত করেন।

আল্লাহ ও রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিষেধ বা অস্বীকার করেছেন তারাও তা নিষেধ বা অস্বীকার করেন। আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ে চুপ থেকেছেন তারাও সে বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেন।

৪। তারা বিশ্বাস করেন আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর দলীলগুলো এমন মুহকাম বা দ্ব্যর্থহীন যার অর্থ বুঝা যায় এবং তার ব্যাখ্যাও করা যায়। এ দলীলগুলো মুতাশাবিহ্ বা সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তারা এগুলোর অর্থ আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করেন না। (অর্থাৎ এমন বলেন না যে, এগুলোর অর্থ মানুষের জানা সম্ভব নয়, আল্লাহই জানেন)।

অথচ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা তাদেরকে এ অপবাদই দিয়ে থাকে। তারা কি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কতোক গ্রন্থকার এবং আধুনিক লেখকদের লিখনী থেকে তাদের নীতি জানতে পারেনি?[৩০]

৫। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত আল্লাহর গুণের ধরণ ও গঠন আল্লাহর দিকেই সোপর্দ করেন এবং এ ব্যাপারে খুঁটি-নাটি খোঁজ করেন না।

---

৩০. মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশনী এ বিষয়ে অনেকগুলো বই প্রকাশ করেছে। যেমন-শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া, শারহুল আক্বীদা আত ত্বহাবীয়া।

তৃতীয়ত

الرَّدُّ على من أنكَرَ الأسماءَ والصِّفاتِ، أو أنكر بعضها

যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বা তার কিছু অংশকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে তারা তিন শ্রেণীর লোক:

১। জাহমিয়া: এরা জাহম ইবনে সফওয়ানের অনুসারী। তারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী উভয়টিকেই অস্বীকার করে।

২। মু'তাযিলা: এরা অ-সিল ইবনে আতার অনুসারী। এ আতাই হাসান বসরী রহি. এর মজলিস ত্যাগ করেছিল। তারা আল্লাহর নামের অর্থ বাদ দিয়ে শুধু শব্দগুলো স্বীকার করে এবং আল্লাহর সকল গুণাবলীকে তারা অস্বীকার করে।

৩। আশা'ইরা, মাতুরীদি ও তাদের অনুসারীরা: এরা আল্লাহর নামসমূহ এবং কিছু গুণাবলী স্বীকার করে। আর কিছু গুণাবলী অস্বীকার করে। এ সকল বিপথগামী দল যে সংশয়ের উপর নিজেদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে তা হলো:

তাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর সাথে তার সৃষ্টি জীবের সাদৃশ্য থেকে মুক্ত থাকা। কারণ সৃষ্টি জীবকেও আল্লাহর কিছু নামে নাম করণ এবং তার কিছু গুণে গুণান্বিত করা হয়। ফলে নাম, গুণ ও অর্থে মিল বা অংশীদার হওয়ার কারণে বাস্তবেও আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা হয়। তাদের দৃষ্টিতে এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে মাখলুককে সাদৃশ্য করণ আবশ্যক হয়ে যায়।

আর এ থেকে বাঁচার জন্য তারা দু'পথের একটিকে বেছে নিয়েছে:

ক। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর দলীলসমূহকে বাহ্যিক অর্থ থেকে ঘুরিয়ে তার অপব্যাখ্যা করা। যেমন: আল্লাহর চেহারাকে সত্তা এবং হাতকে নিয়ামতের অর্থে ব্যবহার করা।

খ। অথবা এ দলীলগুলোর অর্থ আল্লাহর উপর ন্যাস্ত করা। ফলে তারা বলে: এ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কি উদ্দেশ্য করেছেন তা তিনিই ভাল জানেন। সাথে তারা এ বিশ্বাসও করে যে, এ দলীলগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

সর্ব প্রথম আরবের কিছু মুশরিক আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তার নিম্নোক্ত বাণী নাযিল করেন,

{كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} [الرعد: ٣٠]

এমনিভাবে আমি আপনাকে একটি উম্মাতের মধ্যে প্রেরণ করেছি। তাদের পূর্বে অনেক উম্মাত অতিক্রান্ত হয়েছে। যাতে আপনি তাদেরকে ঐ নির্দেশ শুনিয়ে দেন, যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বলুনঃ তিনিই আমার পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কারও উপাসনা নাই। আমি তার উপরই ভরসা করেছি এবং তার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। *সূরা আর্ রা'দ আয়াত ৩০।*

এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণঃ মক্কার কুরাইশরা যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহর নাম "রহমান" (অতিদয়ালু) উল্লেখ করতে শুনলো তখন তারা তা অস্বীকার করল। তাই আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করে বললেন: "তারা রহমানকে অস্বীকার করে"।

ইবনে জারীর রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেনঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় এ ঘটনা ঘটেছিল। কুরাইশ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাঝে সন্ধি (চুক্তি) লিখার সময় লেখক আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লিখলেনঃ "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম"। তখন কুরাইশরা বলেছিল "রহমানকে" আমরা চিনি না। ইবনে জারীর রহি. আরো বলেনঃ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় গিয়ে দু'আতে বলতেনঃ (ইয়া-রহমান ইয়া রাহীম)।

তখন মুশরিকরা বললঃ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করেন তিনি এক আল্লাহকে ডাকেন অথচ তাকে দেখছি দু'মাবুদকে আহ্বান করছেন।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করে বললেন,

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: ١١٠﴾

বলুন, আল্লাহ বলে আহবান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহবান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তারই। *সূরা বানী ইসরাঈল ১৭: ১১০।*

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ} [الفرقان: ٦٠]

তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সিজদা কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? *সূরা আল্ ফুরক্বান ২৫: ৬০।*

এ সকল মুশরিকরা হলো জাহমিয়্যাহ, মুতাযিলাহ, আশা'ইরা এবং আল্লাহ তা'আলা ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন তার অস্বীকারীদের পূর্বসুরী। এরা কতইনা নিকৃষ্ট পূর্বসূরী নিকৃষ্ট উত্তরসূরীদের জন্য।

এদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের জবাব কয়েকভাবে দেয়া যেতে পারে-

প্রথম জবাব: আল্লাহ তা'আলা এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর জন্য নাম ও গুণাবলীসমূহ সাব্যস্ত করেছেন। এ সকল নাম ও গুণাবলী বা তার কিছু অংশকে অস্বীকার করলে আল্লাহ্ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাব্যস্ত করা জিনিসকে অস্বীকার করা হয়। আর নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধাচরণ করারই নামান্তর।

দ্বিতীয় জবাব: আল্লাহর গুণাবলীগুলো সৃষ্টিকুলের মাঝে থাকা অথবা কোন মাখলুককে যদি আল্লাহর কোন নামে নামকরণ করা হয় তবে আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে সাদৃশ্য আবশ্যক হয় না। কারণ, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী তার সাথে খাস এবং সৃষ্টি জীবের নাম ও গুণাবলী তাদের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন আল্লাহর যাত বা সত্বা রয়েছে কিন্তু এ যাত বা সত্বার সাথে মাখলুকের সত্বার কোন সাদৃশ্য নেই। এমনিভাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর সাথে সৃষ্টিজীবের নাম ও গুণাবলীর কোন সাদৃশ্য হয় না। নাম ও সাধারণ অর্থে মিল থাকা বাস্তবে অংশীদার হওয়াকে আবশ্যক করে না।

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে "আলীম" (সর্বজ্ঞ), "হালীম" (বড় সহনশীল) বলে নামকরণ করেছেন। তদ্রুপ তার কতোক বান্দাকেও তিনি আলীম নামে আখ্যায়িত করে বলেন,

﴿وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الذاريات: ٢٨]

ফেরেশতাগণ ইবরাহীমকে এক জ্ঞানী সন্তানের (অর্থাৎ ইসহাক্ব এর) সুসংবাদ দিলেন। *সূরা আয্ যারিয়াত ৫১: ২৮।*

আল্লাহ তার অপর বান্দাকে হালীম (সহনশীল) নামে আখ্যায়িত করে বলেন:

{فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ} [الصافات: ١٠١]

আমি ইবরাহীমকে এক সহনশীল সন্তানের (অর্থাৎ ইসমাঈল এর) সুসংবাদ দিলাম। *সূরা আস্ সফ্ফাত ৩৭:১০১।*

ইসহাক্ব ও ইসমাঈল আলাইহিমাস্ সালামের ক্ষেত্রে যে আলীম ও হালীম নাম ব্যবহার করা হয়েছে তার সাথে আল্লাহর নাম "আলীম ও হালীমের" কোনই মিল নেই। আল্লাহ তাআ'লা নিজের ক্ষেত্রে "সামী' ও বাসীর" নাম ব্যবহার করে বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: ٥٨]

নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা সর্ব শ্রোতা ও সর্ব দ্রষ্টা। *সূরা আন্ নিসা ৪: ৫৮।*

তেমনি আল্লাহ তাআ'লা তার কতেক বান্দাকে "সামী ও বাসীর" নামে আখ্যায়িত করে বলেন,

{إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [الإنسان: ٢]

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে-এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন। *সূরা আল্ ইনসান বা দাহর ৭৬: ২।*

অথচ বান্দার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন হওয়া ও আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির সাথে কোন তুলনাই নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে "রউফ এবং রাহীম" নামে আখ্যায়িত করে বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحج: ٦٥]

নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান। *সূরা আল্ হাজ্জ ২২: ৬৫।*

আল্লাহ তার কতোক বান্দাকে রউফ ও রাহীম নামে নাম করণ করেছেন,

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: ١٢٨]

তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। *সূরা আত-তাওবা ৯:১২৮।*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্নেহশীল ও দয়ালু তার সাথে আল্লাহর করুনা ও দয়ার কোন মিল ও তুলনা নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআ'লা নিজেকে এমন কিছু গুণে গুণান্বিত করেছেন যেগুলো দিয়ে তার বান্দাদেরকেও গুণান্বিত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ} [البقرة: ٢٥٥﴾

তার জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টন করতে পারে না। *সূরা আল বাক্বারা ২: ২৫৫।*

আল্লাহ নিজেকে ইলমের গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তার বান্দাদেরকেও ইলমের গুণে গুণান্বিত করে বলেন,

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। *সূরা বানী ইসরাঈল ১৭: ৮৫।* তিনি আরো বলেন,

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: ٧٦﴾

এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছে অধিকতর এক জ্ঞানীজন। *সূরা ইউসুফ ১২: ৭৬।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [القصص: ٨٠﴾

আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল। *সূরা আল্ ক্বাসাস ২৮: ৮০।*

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে শক্তির গুণে গুণান্বিত করে বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج: ٤٠﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর। *সূরা আল্ হাজ্জ ২২: ৪০।*

অন্য স্থানে তিনি বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: ٥٨﴾

আল্লাহ্ তাআ'লাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত। *সূরা আয্ যারিয়াত ৫১: ৫৮।*

আল্লাহ নিজের বান্দাকে শক্তির গুণে গুণান্বিত করে বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً} [الروم: ٥٤﴾

আল্লাহ তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। *সূরা আর্ রূম ৩০: ৫৪।* এছাড়াও অনুরূপ অনেক আয়াত আছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী তার সাথে খাস এবং উপযোগী। সৃষ্টি জীবের নাম ও গুণাবলী তাদের সাথে খাস ও উপযোগী। নাম ও অর্থে মিল থাকার দরুন বাস্তবিক যাবতীয় বিষয়ে অংশীদার হওয়া আবশ্যক নয়।

কারণ, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী এবং মানুষের নাম ও গুণাবলীর মাঝে কোন সাদৃশ্য ও উপমা নেই। আর তা স্পষ্ট। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

তৃতীয় জবাব: যার পূর্ণতার গুণ নেই, তিনি ইলাহ (মা'বূদ) হওয়ার যোগ্য নয়। এ জন্য ইবরাহীম আ. তার পিতাকে বলেছিলেন,

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا} [مريم: ٤٢﴾

যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা, যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার ইবাদত কেন কর? *সূরা মারইয়াম ১৯: ৪২।*

আল্লাহ তাআ'লা মূসা আ. এর কওমের গো-বৎস পূজারীদের প্রতিবাদে বলেন,

﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا} [الأعراف: ١٤٨﴾

তারা কি একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পথও বাতলে দিচ্ছে না! তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। *সূরা আল আ'রাফ ৭: ১৪৮।*

চতুর্থ জবাব: গুণ থাকা পূর্ণতা, না থাকা অপূর্ণতা ও কমতি। আর যার কোন গুণ নেই সে হয় অস্তিত্বহীন অথবা অপূর্ণ ও ত্রুটি যুক্ত। আল্লাহ তাআ'লা সকল ত্রুটি-অপূর্ণতা ও অস্তিত্বহীন হওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

পঞ্চম জবাব: বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহর গুণ গুলোকে অন্য দিকে ফিরানো বা তার অপব্যাখ্যা করার কোন দলীল নেই তাই তা বাতিল। আর যদি কেউ বলে এ সকল শব্দের অর্থ আল্লাহ জানেন আমরা জানি না! তাহলে এ কথা আবশ্যক হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআ'লা আমাদিগকে এমন সকল শব্দ দিয়ে সম্বোধন করেছেন যার অর্থ আমরা বুঝি না। অথচ তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন আমরা যেন তার নামের অসীলায় তাকে আহ্বান করি।

তাহলে যার অর্থ আমরা বুঝি না, তা দিয়ে আমরা কি করে আল্লাহকে আহ্বান করব? আল্লাহ আমাদেরকে পূরা কুরআন মাজীদ অনুধাবন করতে আদেশ দিয়েছেন। যদি ঐ সকল শব্দের অর্থই আমরা না বুঝি তবে কি করে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআন অনুধাবনের আদেশ দেন?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহর সাথে উপযুক্ত পদ্ধতিতে তার নাম ও গুণাবলী স্বীকার করা ওয়াজিব। সাথে সৃষ্টি জীবের সাথে তার সাদৃশ্যকে অস্বীকার করতে হবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]

আল্লাহর মতো কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা *(সূরা আশ শূরা ৪২: ১১)।*

আল্লাহ তা'আলা নিজের সাথে অন্য জিনিসের সাদৃশ্য হওয়াকে অস্বীকার করেছেন এবং নিজের জন্য শোনা ও দেখার গুণ সাব্যস্ত করেছেন। তাহলে বুঝা যায় আল্লাহর জন্য গুণ বা সিফাত সাব্যস্ত করলেই তাতে সাদৃশ্য আবশ্যক হয় না। তাই আল্লাহর নাম ও গুণাবলী স্বীকার করা ওয়াজিব এবং তার সাথে কাহাকেও সাদৃশ্য স্থাপন করা যাবে না।

আর এটাই হলো আল্লাহর নাম ও গুণাবলী স্বীকার ও অস্বীকার করার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতির মূল কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

في بيان الشرك والانحراف في حياة البشرية
ولمحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والنِّفاق

শিরক এবং মানুষের জীবনে ভ্রষ্টতা-বিপর্যয়: কুফরী, নাস্তিকতা, শিরক এবং মুনাফিক্বী

এ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: মানব জীবনে বিপর্যয় ও ভ্রষ্টতা।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: শিরকের পরিচয় ও প্রকার।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কুফরীর পরিচয় ও প্রকার।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মুনাফিক্বীর পরিচয় ও প্রকার।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: নিম্নের প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃতির বিবরণ:

- জাহিলিয়্যাত
- ফাসিক্বী
- পথ ভ্রষ্টতা
- রিদ্দাহ-মুরতাদের প্রকারভেদ ও তার বিধিবিধান ।

প্রথম পরিচ্ছেদ
الانحراف في حياة البشرية
মানব জীবনে বিপর্যয়-ভ্রষ্টতা

আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিজীবকে কেবলমাত্র তার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর এ ইবাদতের জন্য রিযিক্বসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস মানুষের জন্য প্রস্তুত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: ٥٦– ٥٨]

আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ্ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত। *সূরা আয্ যারিয়াত ৫১:৫৬-৫৮।*

মানুষের আত্মাকে তার নিজ গতিতে ছেড়ে দিলে তা আল্লাহর দাসত্বকে নির্দিধায় স্বীকার করতঃ তাকেই ভালোবাসবে, তারই ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। কিন্তু মানুষ ও জ্বিন শয়তানেরা নিজেদের চাক-চিক্যময় ও ধোকার বাণী দ্বারা আত্মাসমূহকে নষ্ট এবং পথভ্রষ্ট করে। স্বভাগতভাবে মানুষের হৃদয়ে তাওহীদ সু-প্রতিষ্ঠিত। আর শিরক বহিরাগত নতুন বিষয় যা তাওহীদের উপর সংযোজন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: ٣٠]

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। *সূরা আর্ রূম ৩০:৩০।* রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

প্রত্যেক নবজাতক স্বভাবজাত ধর্ম তথা তাওহীদের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।[৩১]

---

৩১. ছ্বহীহ বুখারী ১৩৮৫, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান ১২৯।

এতে বুঝা যায় আদম সন্তানের মূল হলো তাওহীদ এবং দীন ইসলাম। আদম আলাইহিস সালাম এবং তার পরে অনেক যুগ পর্যন্ত তার সন্তান-সন্ততিরা এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ} [البقرة: ٢١٣]

সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরী হিসাবে। *সূরা আল বাক্বারা **২:২১৩।***

নূহ আ. এর জাতিতে সর্ব প্রথম শিরক এবং সঠিক আক্বীদা হতে বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে। শিরকে লিপ্ত হওয়ার পর নূহ আলাইহিস সালাম হলেন তাদের প্রতি প্রেরিত প্রথম রসূল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} [النساء: ١٦٣]

আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়ে ছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যারা তার পরে প্রেরিত হয়েছেন। *সূরা আন্ নিসা **৪:১৬৩।***

ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু **বলেন:** আদম এবং নূহ্ আলাইহিস সালাম এর মাঝে দশ যুগের (এক হাজার বছরের) ব্যাবধান ছিল, এ সময়ের সকল মানুষেরা তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: (ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত কথা নির্ভেজাল সত্য। কারণ, সূরাতুল বাকারাতে উবাই ইবনে কাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ক্বিরাতে এসেছে: মানুষেরা মতভেদে লিপ্ত হয়ে শিরক করতে শুরু করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে নাবী ও রসূল প্রেরণ করেন)।[৩২]

এ ক্বিরাতের সমর্থনে প্রমাণ পাওয়া যায় সূরা ইউনুসে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে:

{وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا} [يونس: ١٩]

আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে। *সূরা ইউনুস **১০:১৯।***

এর মাধ্যমে ইবনে ক্বাইয়িম রহি. বুঝাতে চেয়েছেন: নাবী ও রসূল প্রেরণের কারণ হলো, সঠিক দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পরে সে বিষয়ে মানুষদের মতভেদে

৩২. ইগাসাতুল্ লাহ্ফান ২/১০২।

লিপ্ত হওয়া। যেমন: অনেক যুগ ধরে আরবরা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীনের উপর ছিল। পরিশেষে আম্‌র ইবনে লুহাই আল্ খুযায়ী এসে দীনে ইবরাহীমকে পরিবর্তন করতঃ আরব ভূখন্ডে মূর্তির আবির্ভাব ঘটায়। বিশেষতঃ হেজায তথা মক্কা-মদীনায়।

তখন থেকে আবারও গাইরুল্লাহর ইবাদত বা পূজা করা শুরু হয়ে যায়। ফলে এ সকল পবিত্র ভূমি ও পার্শ্ববর্তী এলাকা শিরকে ছেয়ে যায়। অবশেষে আল্লাহ তা'আ'লা তার শেষ নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রেরণ করলে তিনি মানুষদেরকে তাওহীদ ও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীনের প্রতি আহ্বান করেন। আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস ও দীনে ইবরাহীম পুনরায় ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি আল্লাহর রাস্তায় যথাযথ জিহাদ পরিচালনা করেন। তিনি মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে ফেলেন, আল্লাহ তার মাধ্যমে দীন ইসলাম পূর্ণ করতঃ তার দ্বারাই বিশ্ববাসির উপর তার নিয়ামত পরিপূর্ণ করেন।

এ উম্মাতের শুরুর দিকের মর্যাদাপূর্ণ যুগের লোকেরা তার দেখানো পথে চলেন। পরবর্তী সময়ে অজ্ঞতা-মূর্খতা প্রসার লাভ করতঃ নির্ভেজাল ইসলাম ধর্মে ভিন্ন ধর্মের অনেক ভেজাল প্রবেশ করে। অনেক পথ ভ্রষ্ট দাঈদের কারণে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার মাঝে আবারো নতুন করে বহু শিরকের প্রচলন শুরু হয়।

এ উম্মাতের শিরকে পতিত হওয়ার আরো অনেক কারণ রয়েছে। যেমন: ওলী-আওলিয়া ও সৎ ব্যক্তিদের সম্মানের পথ ধরে কবর পাকা করণ ও তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা, তাদের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা, এমনকি তাদের কবরের উপর মাযার-গম্বুজ ইত্যাদি তৈরী করতঃ এগুলোকে প্রতিমা (মূর্তি) হিসাবে গ্রহণ করে তার ইবাদত করা শুরু হয়।

তাদের নিকটে প্রার্থনা, ফরিয়াদ বা বিপদ হতে মুক্তি কামনা, তাদের জন্য যবেহ্ ও নযর মানত করাসহ আরো অনেক শিরকের সূত্রপাত ঘটে। যারা এসব করে তারা এ শিরকগুলোকে সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা অসীলা করা এবং তাদের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ বলে নাম দেয়। তাদের ধারণা অনুযায়ী এটা মৃত ব্যক্তিদের ইবাদত নয়। অথচ তারা বেমালুম ভুলে গেছে, এটাই ছিল পূর্বের মুশরিকদের উক্তি। তারা বলত,

{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: ٣]

আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। *সূরা আয্ যুমার ৩৯:৩।*

প্রাক ও বর্তমান যুগে মানুষদের মাঝে এ সকল শিরক পতিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ্ তথা আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস করে। তবে তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক বা অংশিদার সাব্যস্ত করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক। *সূরা ইউসুফ ১২:১০৬।*

অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত কেউ আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি। যেমনঃ ফেরআ'উন, দাহ্‌রী নাস্তিকরা (এরা বিশ্বাস করে যে, সময়ের আবর্তেই তারা আসে যায়), বর্তমান যুগের সাম্যবাদী কমিউনিস্টরা। তবে এরা অহংকার বশতঃ আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। অন্যথায় অভ্যন্তরীণ ও আত্মিকভাবে তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النمل: ١٤]

তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। *সূরা আন্ নামল ২৭:১৪।*

কিন্তু বিবেক স্বীকার করে যে, প্রত্যেক সৃষ্টির একজন স্রষ্টা আবশ্যক। প্রত্যেক অস্তিত্বমান বস্তুর একজন অস্তিত্বদাতা আবশ্যক। আর সূক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিক নীতির উপর পরিচালিত এ পৃথিবীর অবশ্যই একজন বিজ্ঞ ব্যবস্থাপক রয়েছেন। যিনি সব কিছু করতে সক্ষম ও সর্বজ্ঞ। যে ব্যক্তি এ সর্বজ্ঞ স্রষ্টাকে অস্বীকার করে সে হয় জ্ঞান শূন্য অথবা এমন অহংকারী যে, তার জ্ঞান হারিয়ে নিজেকে নির্বোধে পরিণত করেছে। আর এরূপ লোকদের কথার কোন গুরুত্ব নেই এবং তারা গণনারও অযোগ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الشرك: تعريفه، أنواعه

শিরকের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ

ক। শিরকের সংজ্ঞাঃ আল্লাহর প্রভুত্ব এবং ইবাদতে শরীক বা অংশিদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে। ইবাদতের ক্ষেত্রেই অধিকাংশ শিরক হয়ে থাকে। যেমনঃ আল্লাহর সাথে অন্যকে আহ্বান করা বা তার জন্য ইবাদতের কোন অংশকে নির্দিষ্ট করা। যেমনঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য জবাই করা, নযর-মানত, ভয়, আশা-আকঙ্খা, ভালোবাসা।

নিম্নোক্ত কারণে শিরক সবচেয়ে বড় যুলুমঃ

১। এতে মাবূদের গুণের ক্ষেত্রে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে সাদৃশ্য করা হয়ঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে সে তাকে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে। আর এটাই সবচেয়ে বড় যুলুম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]

নিশ্চয় শিরক হলো মহা বা বড় যুলুম। *সূরা লুক্বমান ৩১:১৩।*

যুলুমের সংজ্ঞাঃ কোন বস্তুকে তার অপাত্রে স্থাপন করা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে সে ইবাদতকে তার অপাত্রে স্থাপন করতঃ অযোগ্যের জন্য তা সম্পাদন করে। আর এটাই হলো সর্বাপেক্ষা বড় যুলুম বা অত্যাচার।

২। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শিরক করার পর তাওবা না করে মারা যাবে তিনি তাকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য ইচ্ছা করেন। *সূরা আন্ নিসা ৪:৪৮।*

৩। আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: ٧٢﴾

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৭২।*

৪। শিরক সকল আমল ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: ٨٨﴾

যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজ কর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত। *সূরা আল্ আন আম ৬:৮৮।* অপর আয়াতে তিনি বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: ٦٥﴾

আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। *সূরা আয্ যুমার ৩৯:৬৫।*

৫। মুশরিকের জান ও মাল হালাল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। *সূরা আত্ তাওবা ৯:৫।*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا (صحيح مسلم -٢١)

মানুষেরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই) না বলা পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি। যখন তারা এ কালিমা পাঠ করবে তখন তাদের জান ও মালকে ইসলামের অধিকার ব্যতীত আমার নিকট হতে নিরাপদ করে নিল।[৩৩]

৬। **শিরক সবচেয়ে বড় কাবীরা গুনাহ**। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

﴿أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ﴾

আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দিব না? ছাহাবায়ে কিরাম বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বললেন: সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।[৩৪]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, মাখলূক্ব সৃষ্টি এবং বিভিন্ন নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহর নাম ও গুণাবলীসহকারে মানুষেরা যেন তাকে চিনে, একমাত্র তারই যেন ইবাদত করা হয় এবং তার সাথে শরীক বা অংশিদার সাব্যস্ত করা না হয়। মানুষ যেন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর এটা সেই ইনসাফ যার দ্বারা আসমান ও যমীন স্থাপিত। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}

আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। *সূরা হাদীদ ৫৭:২৫।*

অতএব, আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দিয়েছেন যে, মানুষকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যই তিনি তার রসূলগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। আর এটাই হলো আদ্‌ল বা ইনসাফ। আর সবচেয়ে বড় ন্যায় বা ইনসাফ হলো: তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ব। এটা আদ্‌ল বা ইনসাফের মূল এবং তার খুঁটি। আর শিরক হলো যুলুম বা অত্যাচার।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৩৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১, ইবনে মাজাহ হা/৩৯২৮, তিরমিযী হা/২৬০৬।
৩৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৯৭৬।

{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } [لقمان: ١٣]

নিশ্চয় শিরক হলো মহা (বড়) যুলুম। *সূরা লুক্বমান ৩১:১৩।*

সুতরাং শির্‌ক হলো সবচেয়ে বড় যুলুম। তাওহীদ হলো সবচেয়ে বড় আদ্‌ল বা ইনসাফ। অতএব, যা কিছু এটার বিরোধী হবে তা সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

এমনকি আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: শিরক যখন তার মূলেই দুনিয়া সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যের বিরোধী তখন স্বভাবতই তা সাধারণভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ। প্রত্যেক মুশরিকের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তাওহীদপন্থীদের জন্য তার জান ও মাল হালাল করেছেন। যখন মুশরিকরা আল্লাহর দাসত্বকে অস্বীকার করেছে তখন মুসলমানদের জন্য তাদেরকে দাস হিসাবে গ্রহণের হুকুম দেয়া হয়েছে। মুশরিকের কোন আমল আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেন না। তার ব্যাপারে কোন শাফা'আত গ্রহণ করা হবে না। পরকালে তার কোন আহ্বানে সাড়া দেয়া হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন আশা কবুল করবেন না। কারণ, মুশরিক আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জাহিল বা অজ্ঞ। ফলে সে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য থেকেই তার শরীক স্থাপন করেছে। আর এটা তার সম্পর্কে সর্বোচ্চ পর্যায়ের অজ্ঞতা। আর মুশরিকের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ যুলুম বা অত্যাচার। তবে প্রকৃত পক্ষে মুশরিক আল্লাহর উপরে নয় বরং নিজেই নিজের উপর যুলুম করে।[৩৫]

৭। শিরক হলো অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত বিষয়: আর আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি থেকেই নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে সে আল্লাহর জন্যই তাই সাব্যস্ত করলো যা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। আর এটা আল্লাহর সাথে চরম বিরোধীতা, শত্রুতা এবং অবাধ্যতা।

খ। শিরকের প্রকারভেদ: শিরক দু'প্রকার। প্রথম প্রকার: শিরকে আকবার বা বড় শিরক- যা মানুষকে দীন ইসলাম থেকে বের করে তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী করে দেয়, যদি সে তাওবা না করে শিরকের উপর মারা যায়।

আর শিরকে আকবার হলো- ইবাদতের কোন অংশকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করা। যেমন: আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকটে প্রার্থনা করা, পশু জবাই এবং নযর-মানতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে কবর, জ্বিন এবং শয়তানের নৈকট্য

---

৩৫. আল্ জাওয়াবুল কাফী ১০৯ পৃষ্ঠা।

অর্জন করা। মৃত ব্যক্তি বা জ্বিন-শয়তানের ক্ষেত্রে এ ভয় করা যে তারা ক্ষতি করতে বা অসুখে পতিত করতে পারে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কারো নিকটে প্রয়োজন পূরণের এবং বিপদাপদ দূরের আশা রাখা যা তারা আদৌ করতে সক্ষম নয়। অথচ বিভিন্ন ওলী ও সৎব্যক্তিদের কবরকে মাযার ও গম্বুজ বানিয়ে নামধারী মুসলমানেরা এ কর্ম অহরহ করে চলেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [يونس: ١٨]

আর তারা উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ। তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত বিষয় থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। *সূরা ইউনুস ১০:১৮।*

দ্বিতীয় প্রকার শিরক: শিরকে আসগার বা ছোট শিরক- যা কোন মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তবে তা তাওহীদকে ক্রটিযুক্ত করে। আর এটা ব্যক্তিকে ক্রমান্বয়ে শিরকে আকবারে পতিত করে।

শিরকে আসগার বা ছোট শিরক দু'প্রকার:

ক। প্রথম প্রকার: জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা শিরক করা। কথা ও কাজের মাধ্যমে এ শিরক হতে পারে।

কথার মাধ্যমে শিরকের উদাহরণ হলো: আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম/শপথ করে সে কুফরী বা শিরক করে।[৩৬]

---

৩৬. ছ্বহীহ: সুনানে তিরমিযী ১৫৩৫।

ما شاء الله وشئت 'আল্লাহ এবং তুমি যেমন চেয়েছ'- এমন কথা বলাও শিরক। কোন এক ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এরূপ কথা বললে, তিনি তাকে বললেন: তুমি আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক (অংশিদার) করে দিলে? বরং বল, **ما شاءَ الله وحده** আল্লাহ একাই যা চান।[৩৭]

এমন কথা বলাও শিরক যে, **لولا الله وفلان** আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যদি না থাকতেন বা না হতেন (তাহলে আমার বড় ক্ষতি হয়ে যেত)। বরং বলা উচিত:

ما شاءَ الله ثُمَّ شاء فلان؛ ولولا الله ثمّ فلان

আল্লাহ যা চান অতঃপর অমুকে যা চান। আল্লাহ অতঃপর অমুক ব্যক্তি যদি না হতেন। কারণ, আরবীতে সুম্মা (অতঃপর) শব্দটি ধারাবাহিকতা ও সময়ের ব্যবধান অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বান্দার চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার আওতাভুক্ত হবে, তবে পর্যায়ক্রমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না। *সূরা আত্ তাকভীর ৮১:২৯।*

অপর দিকে আরবি الواو ওয়াও অর্থ ও বা এবং : সাধারণ একত্রিকরণ এবং শরীকানার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যা ধারাবাহিকতা বা দূরত্ব বুঝায় না। অনুরূপ আরো উক্তি হলো: "মা লি ইল্লাল্লাহু ওয়া-আনতা **ما لي إلا الله وأنت** (আমার জন্য তো আল্লাহ ও তুমি আছো), হাযা মিন বারাকাতিল্লাহি ওয়া-বারাকাতিকা **هذا من بركات الله وبركاتك** (এ তো আল্লাহ ও তোমার বরকতে হয়েছে)।

কাজের মাধ্যমে যে সকল ছোট শিরক হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ: বালা-মুছীবত দূর বা প্রতিহত করার জন্য রিং বা তাগা বাঁধা, বদ নযর বা অন্য কোন ভয়ে তাবীজ কবচ লটকানো, যদি এরূপ বিশ্বাস করে যে, এগুলো রোগ মুক্তি, বালা-মুছীবত দূর অথবা প্রতিহত করার কারণ তবে তা শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে বালা-মুছীবত দূরের কারণ করেননি। অপরদিকে কেউ যদি এমন বিশ্বাস করে স্বয়ং এগুলোই বালা-মুছীবত বা রোগ দূর

---

৩৭. ছ্বহীহ: সুনানে নাসায়ী আল্ কুবরা ১০৭৫৯।

করে তবে তা শিরকে আকবার বা বড় শিরক বলে গণ্য হবে। কারণ, সে নিজেকে আল্লাহ ব্যতীত এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

খ। দ্বিতীয় প্রকার শিরকে আসগার: শিরকে খাফী বা গোপন শিরক। যা ইচ্ছা ও নিয়্যাতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন: লোক দেখানো বা শুনানোর জন্য কোন কাজ করা। যেমন: আল্লাহর নৈকট্য লাভের কোন কাজ করে মানুষের প্রশংসা চাওয়া। যেমন, কেউ সুন্দরভাবে ছ্বলাত আদায় করে বা দান-ছ্বদাক্বা করে যাতে মানুষ তার প্রশংসা করে।

অথবা অন্য মানুষকে শুনিয়ে বিভিন্ন যিকিরের শব্দ বলে বা তিলাওয়াতে তার সূর তথা কণ্ঠ সুন্দর করে যাতে মানুষেরা তা শুনে তার প্রশংসা করে। আমলে রিয়া (লোক দেখানো বা শুনানো) প্রবেশ করলে ঐ আমল বাতিল হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]

যারা তাদের পালনকর্তার সাথে (কিয়ামতের দিন) সাক্ষাত করতে চায় তারা যেন সৎকর্ম করে এবং তাদের পালনকর্তার ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে। *সূরা আল্ কাহফ ১৮:১১০।*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ

আমি তোমাদের উপরে শিরকে আসগারের সবচেয়ে বেশী ভয় করি। ছাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহর রসূল শিরকে আসগার কি? তিনি বললেন: রিয়া বা লোক দেখানো আমল করা।[৩৮]

শিরকে খাফীর অন্তর্ভুক্ত হলো: দুনিয়াবী লোভে কোন আমল করা। যেমন, সম্পদের জন্য কেউ হাজ্জ করে বা ইমামতি করে বা দীনি ইলম শিক্ষা করে অথবা জিহাদ করে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

---

৩৮. হাসান: মুসনাদে আহমাদ ২৩৬৩০।

ধ্বংস হোক দিনার-দিরহামের দাস বা বান্দা। ধ্বংস হোক মখমল ও খামীসার (এক প্রকার চাদর) দাস, যদি সে কিছু পায় তবে খুশী হয়, অন্যথায় অসন্তুষ্ট হয়।[৩৯]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ ইচ্ছা ও নিয়্যাতের ক্ষেত্রের শিরক এমন এক মহাসাগর যার কোন কুল কিনারা নেই। খুব কম সংখ্যক লোকই এ থেকে বাঁচতে পারে। অতএব, যে ব্যক্তি স্বীয় আমলের মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি চায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য করতঃ তার নিকটে প্রতিদান চাই সে ব্যক্তি নিয়্যাত ও ইচ্ছায় শিরক করে।

ইখলাস হলোঃ যাবতীয় কথা, কাজ, ইচ্ছা ও নিয়্যাত কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য একনিষ্ঠ করা। এটিই হলো ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর একনিষ্ঠ দীন যার আদেশ আল্লাহ তা'আলা তার সকল বান্দাকে দিয়েছেন। এ ছাড়া অন্য কোন দীন আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে গ্রহণ করবেন না। এটাই ইসলামের আসল রূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: ٨٥]

যারা ইসলাম ছাড়া অন্য দীন অনুসন্ধান করবে তা তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর সে ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *সূরা আলে ইমরান ৮৫।*

এটাই হল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীন। যে ব্যক্তি তা থেকে বিমুখ হবে সে নিরেট বোকা ও নির্বোধ।[৪০]

৩৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৮৬, ৬৪৩৫; বাগাবী ফি শারহিস্ সুন্নাহ ৪০৫৯।
৪০. আল্ জাওয়াবুল কাফী ১১৫ পৃষ্ঠা।

বড় ও ছোট শিরকের মাঝে পার্থক্যসমূহ

১। বড় শিরক দীন ইসলাম থেকে বের করে দেয়। অপর দিকে শিরকে আসগার দীন থেকে বের করে দেয় না। তবে তাওহীদের কমতি ও ত্রুটি করে।

২। শিরকে আকবারকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী। শিরকে আসগারকারী জাহান্নামে প্রবেশ করলেও সেখানে চিরস্থায়ী হবে না।

৩। শিরকে আকবার যাবতীয় আমল বাতিল করে দেয়। শিরকে আসগার সকল আমল নষ্ট করে না। তবে রিয়া ও দুনিয়ার উদ্দেশ্যে যে কাজ করা হয় শিরকে আসগার কেবল ঐ আমলকেই নষ্ট করে।

৪। শিরকে আকবার জান মাল হালাল করে দেয়। অপর দিকে শিরকে আসগার জান মাল হালাল করে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الكفر: تعريفه – أنواعه

কুফরীর পরিচয় ও প্রকারভেদ

ক। কুফরীর পরিচয়: কুফরীর শাব্দিক অর্থ: ঢাকা বা গোপন করা। শরী'আতের পরিভাষায় কুফরী হলো: ঈমানের বিপরীত বিষয়। কারণ, কুফরী হলো: আল্লাহ তা'আলা ও রসূলের প্রতি ঈমান না রাখা। এর সাথে তাদের প্রতি মিথ্যারোপ থাকুক বা না থাকুক তা দেখার বিষয় নয়। বরং আল্লাহ ও রসুলের ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহ, সংশয় বা বিমুখতা বা তাদের প্রতি সামান্য বিদ্বেষ বা অহংকার অথবা এমন প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতে বাধা দেয় তাই কুফরী। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ ও রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করা উপরে উল্লেখিত বিষয়াবলির মাধ্যমে কুফরী করার চেয়েও মারাত্মক ও বড় কুফরী। অনুরূপভাবে কেউ যদি রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাতু অস্সালাম) সত্যতা জানা সত্ত্বেও হিংসা ও বিদ্বেষ বশতঃ তাদেরকে অস্বীকার এবং মিথ্যারোপ করে তবে সেও বড় কুফরীতে লিপ্ত হলো।[৪১]

খ। কুফরীর প্রকারসমূহ: কুফরী দু'প্রকার:

১। প্রথম প্রকার: কুফরে আকবার (বড় কুফরী) যা মানুষকে দীন (ইসলাম) থেকে বের করে দেয়। বড় কুফরী পাঁচ প্রকার:

(১) আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরআন হাদীছকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে কুফরী করা। এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ} [العنكبوت: ٦٨]

যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফিরের আশ্রয় স্থল হবে? *সূরা আল আনকাবূত ২৯: ৬৮।*

---

৪১. মাজমূ ফতোওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহি.) ১২/৩৩৫।

(২) সত্য জানা সত্ত্বেও অহংকার ও অস্বীকার করার মাধ্যমে কুফরী করা। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} [البقرة: ٣٤]

আর যখন আমি আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইব্লীস ব্যতীত সবাই সিজ্দা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। *সূরা আল্ বাক্বারা ২: ৩৪।*

(৩) সন্দেহ ও সংশয় বশতঃ কুফরী করা। এটাকে ধারণা প্রসূত কুফরীও বলা হয়। এর দলীলে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا} [الكهف: ٣٥- ٣٨]

নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল: তুমি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না। *সূরা আল্ কাহ্ফ ১৮: ৩৫-৩৮।*

(৪) বিমুখতা বা মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে কুফরী করা। এর দলীল আল্লাহর বাণী:

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} [الأحقاف: ٣]

আর কাফিররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। *সূরা আহক্বাফ ৪৬: ৩।*

(৫) মুনাফিক্বির মাধ্যমে আল্লাহ ও রসূলের সাথে কুফরী করা।

এর দলীল হলো আল্লাহর বাণী,

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ} [المنافقون: ٣]

এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। *সূরা মুনাফিক্বূন ৬৩: ৩।*

২। **দ্বিতীয় প্রকার কুফরী হলোঃ** কুফরে আসগার (ছোট কুফরী) যা মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। এটা আমলগত কুফরী। এটা ঐ সকল গুনাহ যেগুলোকে কুরআন-হাদীছে কুফরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে তা বড় কুফরীর সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে না।

যেমন আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত নিয়ামতের কুফরী বা অস্বীকার করা,

{وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ} [النحل: ١١٢]

আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। *সূরা আন্ নাহল আয়াত* **১১২।**

মুসলমানের সাথে মুসলমানের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও এ প্রকার কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (صحيح البخاري:٤٨)

মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিক্বী এবং হত্যা করা কুফরী।[৪২]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (صحيح البخاري-:١٢١)

আমার পরে তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে হত্যা করিও না।[৪৩]

৪২. ছ্বহীহ বুখারী ৪৮, ৬০৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম ৬৪, ইবনে মাজাহ ৬৯, তিরমিযী ১৯৮৩।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করাও এ ধরণের কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ (سنن الترمذى:١٥٣٥)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করে সে কুফরী করে বা শিরক করে।[৪৪]

আল্লাহ তা'আলা কাবীরা গুনাহকারীকে মুমিন বলে উল্লেখ করে বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى..} [البقرة: ١٧٨]

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। *সূরা আল বাক্বারা ২: ১৭৮।*

আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীকে মুমিনদের তালিকা থেকে বের করে দেননি। বরং তাকে নিহতের অভিভাবকদের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{..فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨]

অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। *সূরা আল বাক্বারা ২:১৭৮।*

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ভ্রাতৃত্ব দ্বারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: ٩]

যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। *সূরা হুজুরাত ৪৯: ৯।*

---

৪৩. ছ্বহীহ বুখারী ১২১, ছ্বহীহ মুসলিম ৬৫, ইবনে মাজাহ ৩৯৪২।
৪৪. ছ্বহীহঃ সুনানে তিরমিযী ১৫৩৫।

পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: ١٠]

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। *সূরা হুজুরাত ৪৯: ১০।* শরহে ত্বহাবিয়া থেকে সংক্ষেপায়িত।

বড় কুফরী ও ছোট কুফরীর মাঝে মূল পার্থক্য:

১। কুফরে আকবার দীন ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং সকল আমল নষ্ট করে। কুফরে আসগার ইসলাম থেকে বের করে না এবং সকল আমল নষ্টও করে না। তবে পাপ অনুযায়ী ইসলামের ঘাটতি হয় এবং এটা উক্ত পাপীকে শাস্তির মুখোমুখি করবে।

২। কুফরে আকবার এই কুফরকারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কুফরে আসাগারকারী জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাতে চিরস্থায়ী হবে না। আবার কখনও আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলে তাকে জাহান্নামেই প্রবেশ করাবেন না।

৩। কুফরে আকবার জান ও মাল হালাল করে দেয়। (অর্থাৎ কুফরে আকবারকারী কাফির তাই যুদ্ধের সময় তার জান মালে হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের জন্য জায়িয)। কিন্তু কুফরে আসগারে জান-মাল হালাল হয় না।

৪। কুফরে আকবারকারী ব্যক্তির সাথে মুমিনদের শত্রুতা পোষণ করা ওয়াজিব। নিকটাত্মীয় হলেও মুমিনদের জন্য তার সাথে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং চলাফেরা করা জায়িয নয়। অপরদিকে কুফরে আসগার ব্যাপকভাবে বন্ধুত্ব ও ভালবাসাকে নিষেধ করে না। বরং কুফরে আসগারকারীকে তার ঈমান অনুযায়ী ভালোবাসতে এবং বন্ধুত্ব রাখতে হবে। তার গুনাহ অনুযায়ী তার সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতে হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

النفاق: تعريفه، أنواعه

মুনাফিক্বির পরিচয় ও তার প্রকারভেদ

ক) মুনাফিক্বির পরিচয়: নিফাক্ব শব্দটি نَافَقَ শব্দের মাসদার বা মূল। বলা হয় نَافَقَ يُنَافِقُ نفَاقًا وَمُنَافَقَة। নিফাক্ব শব্দটি النافقاء 'না-ফিক্বা-উন' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যার অর্থ হলো ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর গর্ত হতে বাহির হওয়ার অনেকগুলো পথের একটি পথ। কারণ যখন তাকে এক বহির্গমন পথ দিয়ে খোঁজা হয় তখন সে অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

অনেকে বলেছেন: নিফাক্ব শব্দটি আন্ নাফ্‌ক্ব থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা ঐ গর্ত যেখানে সে লুকিয়ে থাকে।[৪৫]

শরী'আতের পরিভাষায় নিফাক্বের সংজ্ঞা: বাহ্যিকভাবে ইসলাম ও কল্যাণ প্রকাশ করা এবং হৃদয়ে কুফরী ও খারাবি লুকিয়ে রাখা। মুনাফিক্বকে মুনাফিক্ব বলে নাম করণের কারণ হলো সে এক দরজা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

মুনাফিক্বী থেকে আল্লাহ তা'আলা তার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা সতর্ক করেছেন:

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة: ٦٧]

নিশ্চয় মুনাফিক্বরাই হলো ফাসিক্ব। *সূরা আত্ তাওবা ৯:৬৭।*

এখানে ফাসিক্ব বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা শরী'আত তথা ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক্বদেরকে কাফেরের চেয়ে খারাপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন:

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} [النساء: ١٤٥]

নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। *সূরা আন্ নিসা ৪:১৪৫।*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৪৫. আন্ নিহায়া লি-ইবনিল আসীর ৫/৯৮।

[﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢

অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, আল্লাহ্ তাদেরকে এ প্রতারণার বদলা (শাস্তি) দিবেন। *সূরা আন্ নিসা ৪:১৪২।* অন্য স্থানে তিনি বলেন,

{يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [البقرة: ٩، ١٠]

তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের মিথ্যাচারের দরুন তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব। *সূরা আল্ বাক্বারা ২:৯-১০।*

খ) নিফাক্বির প্রকার: নিফাক্বি দু'প্রকার।

প্রথম প্রকার: আক্বীদা বা বিশ্বাসগত নিফাক্ব।

এটা বড় নিফাক্বি, এ প্রকার মুনাফিক্ব বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে এবং হৃদয়ে কুফরী গোপন রাখে। এ প্রকার নিফাক্বী মানুষকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের করে দেয়। এ মুনাফিক্ব জাহান্নামের সর্বনিম্ন ও অতল গহ্বরে অবস্থান করবে। এ প্রকার মুনাফিক্বকে আল্লাহ তা'আলা খারাপির যাবতীয় গুণে গুণান্বিত করেছেন। যেমন: কুফরী, বে-ঈমান, দীন ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রকাশে অংশ গ্রহণের জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে সম্পূর্ণ একাত্বতা ঘোষণা করা ইত্যাদি।

এ প্রকার মুনাফিক্ব সর্বদা পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যখন ইসলাম শক্তিশালী থাকে এবং বাহ্যিকভাবে তারা এর প্রতিরোধ করতে পারে না। তখন এসকল মুনাফিক্বরা ইসলামে প্রবেশের ভান করে। যাতে গোপনে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে এবং নিজেদের জান ও মালের নিরাপত্তা নিয়ে মুসলমানদের সাথে বসবাস করতে পারে। তাই তারা আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, রসূলগণ এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বাহ্যত ঈমান প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ভাবে তারা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, বরং একে তারা মিথ্যা মনে করে। বাস্তবে তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না। তারা এও বিশ্বাস করে না যে, আল্লাহ স্বীয় বাণী একজন মানুষের উপরে নাযিল করে তাকে বিশ্ববাসীর জন্য রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যাতে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি মানুষদেরকে

হিদায়াত করেন এবং তার শাস্তি ও আযাব হতে তাদেরকে ভয় দেখান ও সতর্ক করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এদের চেহারা ও গোপনীয়তা উম্মুক্ত করেছেন। তাদের সকল বিষয় আল্লাহ মুমিনদের নিকটে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে তারা নিফাক্বী ও মুনাফিক্বদের থেকে সদা সজাগ ও সতর্ক থাকেন।

সূরা বাক্বারার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করেছেন: মুমিন, কাফির, মুনাফিক্ব।[৪৬]

এতে মুমিনদের ক্ষেত্রে চারটি এবং কাফিরদের ক্ষেত্রে দু'টি আয়াত নাযিল করা হলেও মুনাফিক্বদের ক্ষেত্রে তেরটি আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তাদের সংখ্যা অনেক, তাদের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানগণ চরম নির্যাতন, ফিতনা, ভোগান্তি ও কষ্টের শিকার হয়ে থাকেন। তাদের দ্বারা ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি হয়। কেননা, তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। নিজেদেরকে ইসলামের ধারক বাহক ও সাহায্যকারী হিসাবে জাহির করে। কিন্তু বাস্তবে তারা এর শত্রু। সুযোগ পেলেই তারা মুর্খদের নিকটে জ্ঞানী ও কল্যাণকামীর বেশে ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করে। কিন্তু বাস্তবে তা চরম পর্যায়ের অজ্ঞতা এবং গোল-যোগ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই না।

বড় নিফাক্বী ছয় প্রকার:

১। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিথ্যারোপ করা।

২। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু অংশকে মিথ্যারোপ করা।

৩। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিদ্বেষ রাখা।

৪। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু অংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

৫। রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীন নিচু, অপমানিত বা পরাজিত হলে খুশী হওয়া।

৬। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীন বা ধর্ম বিজয়ী হলে মন খারাপ হওয়া।

---

৪৬. সূরা আল্ বাক্বারা ২:১-২০।

দ্বিতীয় প্রকার নিফাক্বী: নিফাক্বে আমালী বা কার্যক্ষেত্রে মুনাফিক্বী।

এটা হলো: মুনাফিক্বদের কোন আমল করা। এ প্রকার নিফাক্বে হৃদয়ে ঈমান বাকী থাকে এবং তা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তবে এটা দীন ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার অসীলা বা মাধ্যম। এ প্রকার মুনাফিক্বের হৃদয়ে ঈমান ও নিফাক্বী উভয়টি থাকে। নিফাক্বী যখন বেশী হয় তখন কোন ব্যক্তি আসল মুনাফিক্বে পরিণত হয়। এর দলীল- রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

﴿ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ﴾ (صحيح البخاري:٣٤)

চারটি গুণ যে ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক্ব। আর যার মাঝে এগুলোর কোন একটি গুণ পাওয়া যাবে তা না ছাড়া পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিক্বীর গুণ বিদ্যমান থাকবে। সে চারটি গুণ হলো: তার নিকটে আমানত রাখলে খিয়ানত করে, যখন কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে, যখন অঙ্গিকার করে তা ভঙ্গ করে এবং ঝগড়ার সময় গালি-গালাজ করে ও খারাপ কথা বলে।[৪৭]

যে ব্যক্তির মাঝে এ চারটি গুণ রয়েছে তার মাঝে সকল খারাবি এবং মুনাফিক্বের সকল গুণাবলী একত্রিত হয়েছে। যার মাঝে এর একটি গুণ রয়েছে তার মাঝে মুনাফিক্বীর একটি গুণ রয়েছে। কখনো বান্দার মাঝে ভাল-মন্দ গুণের সংমিশ্রণ হতে পারে। আবার অনেকের মাঝে ঈমান ও কুফরী এবং মুনাফিক্বীর গুণাবলী একত্রিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে ব্যক্তি যেমন ছওয়াব ও পাপের কাজ করবে তদনুযায়ী সে নেকী বা শাস্তির হক্বদার হবে। এ প্রকার নিফাক্বীর উদাহরণ হলো মসজিদে জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায়ে অলসতা করা। এটা মুনাফিক্বদের গুণাবলীর একটি। মুনাফিক্বী অত্যন্ত ভয়ানক ও খারাপ জিনিস। ছাহাবাগণ মুনাফিক্বীতে জড়িয়ে যাওয়াকে খুব ভয় করতেন।

ইবনে আবী মুলাইকাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি আল্লাহর রসূলের ত্রিশ জন ছাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছি তাদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে নিফাক্বীর ভয়ে সদা শঙ্কিত থাকতেন।

---

৪৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪, ২৪৫৯, ৩১৭৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৮,৫৯

বড় এবং ছোট নিফাক্বির মাঝে পার্থক্যসমূহ

১। বড় বা নিফাক্বে ইতিক্বাদ মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। বিপরীতে ছোট নিফাক্বির দরুন কোন ব্যক্তি ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায় না।

২। বড় নিফাক্বী হলো আক্বীদাগত বিষয়ে কোন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অবস্থা দু'রকম হওয়া।

৩। মুমিন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বড় নিফাক্বী সংঘটিত হয় না। অপর দিকে ছোট নিফাক্বী মুমিন ব্যক্তির পক্ষ থেকেও হয়ে যেতে পারে।

৪। বড় নিফাক্বীতে লিপ্ত ব্যক্তি সাধারণত তাওবা করে না। যদিও সে তাওবা করে তবে বিচারকের নিকটে তার তাওবা গ্রহণের ব্যাপারে দ্বি-মত রয়েছে। বিপরীতে ছোট নিফাক্বকারী ব্যক্তি কখনো তাওবা করতে পারে এবং আল্লাহও তার তাওবা গ্রহণ করবেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহি. বলেন: অনেক সময় মুমিন নিফাক্বীর কোন খারাবিতে জড়িয়ে যেতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। মুমিনের হৃদয়ে নিফাক্বী আবশ্যককারী কোন কারণ উপস্থিত হলে আল্লাহ তা তার নিকট হতে দূর করে দেন। মুমিন শয়তান ও কুফরীর এমন বিভ্রান্তির দ্বারা পরীক্ষিত হয় যা তার হৃদয় সংকুচিত করে দেয়।

যেমন: ছাহাবাগণ একদা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেন: হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের অনেকের হৃদয়ে এমন কিছু চিন্তা ভাবনা উদিত হয় যা বলার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়াই উত্তম মনে হয়। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«ذلك صريح الإيمان»

এটাই হলো স্পষ্ট ঈমানের পরিচয়।[৪৮]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: আমাদের হৃদয়ে এমন সব কথা উদ্রেক হয় যা বলা বা ভাষায় প্রকাশ করা খুব বড় পাপের কাজ বলে মনে হয়। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: «الحمدُ لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة» সে আল্লাহর সকল প্রশংসা যিনি তার শাস্তিকে কু-মন্ত্রনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।[৪৯]

৪৮. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ ও ছ্বহীহ মুসলিম।

৪৯. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবূ দাউদ হা/৫১১২।

অর্থাৎ হৃদয় থেকে প্রতিরোধ এবং এ কঠিন ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও এরূপ কুমন্ত্রনা আসা স্পষ্ট ঈমানের পরিচায়ক।

পক্ষান্তরে বড় নিফাক্বী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٨]

তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। *সূরা বাকারা ২:১৮*

অর্থাৎ অভ্যন্তরীণভাবে তারা ইসলামের দিকে ফিরে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে আরো বলেন,

{أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ} [التوبة: ١٢٦]

তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে। অথচ তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না। *সূরা আত তাওবা ৯:১২৬।*

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ রহিমাহুল্লাহ বলেন: বাহ্যিকভাবে তাদের তাওবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কারণ সত্যিকার অর্থে মুনাফিক্ব ব্যক্তি তাওবা করেছে কি-না তা জানা যায় না। কেননা মুনাফিক্ব বাহ্যিকভাবে সব সময় ইসলাম প্রকাশ করে থাকে।[৫০]

---

৫০. মাজমূ' ফাতাওয়া (২৮/৪৩৪-৪৩৫)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

بيان حقيقة كل من الجاهلية – الفسق – الضلال – الردة: أقسامها، أحكامها

প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা: জাহিলিয়াত-ফাসিক্বী-পথ ভ্রষ্টতা ও রিদ্দাহ: মুরতাদের প্রকারভেদ ও বিধিবিধান

১। জাহিলিয়্যাত (الجاهلية)

ইসলাম আগমনের পূর্বে আরববাসী যে পরিস্থিতিতে ছিল তাকে জাহিলিয়্যাত বলা হয়। যেমন: আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং দীনের বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা, বংশ নিয়ে দম্ভ করা, অহংকার ও জবর দখল করা ইত্যাদি।[৫১]

এর সাথে ছিল অজ্ঞতা-মূর্খতা এবং ইলমের অনুসরণ না করা। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন: যে ব্যক্তি সত্য জানে না সে সাধারণ জাহেল/অজ্ঞ। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতার সাথে ইলমের বিপরীত আক্বীদা পোষণ করে সে নিরেট মূর্খ। সত্য জেনে বা না জেনে যে ব্যক্তি সত্যের বিপরীতে কথা বলে সেও অজ্ঞদের তালিকাভুক্ত। যখন জাহিলিয়্যাত বা অজ্ঞতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে গেল তখন জানা দরকার যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পূর্বে মানুষ মূর্খ ও অজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যে সকল কথা ও কাজে তারা লিপ্ত ছিল তা কোন অজ্ঞ ব্যক্তিরই আবিষ্কার ছিল এবং তাতে জাহিল (অজ্ঞ) ব্যক্তিরাই লিপ্ত থাকতো। রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাতু অস্সালাম) আনীত বিধানাবলীর বিরোধীতা করাও অজ্ঞতা। তা হতে পারে ইয়াহূদীবাদ বা খ্রিষ্টীয় ধর্ম বা অন্য কিছু।

আর জাহিলিয়্যাত যুগে এসকল জাহিলিয়্যাত বা অজ্ঞতাই ব্যাপক আকার ধারণ করে ছিল। অপর দিকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবূয়ত লাভের পর কোন কোন এলাকায় জাহিলিয়্যাত ছিল। যেমন: কাফির রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা। আবার কিছু ব্যক্তির মাঝেও অজ্ঞতা ছিল, যেমন ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে ইতিপূর্বে জাহিলিয়্যাতে ছিল, যদিও সে ইসলামী রাষ্ট্রে থাকুক না কেন। তবে যামানা বা সময়গত দিক দিয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

৫১. আন্ নিহায়া লি-ইব্নিল আসীর (১/৩২৩)।

এর নবূয়ত লাভের পর ব্যাপক জাহিলিয়াতের বিদায় ঘটেছে। কারণ, ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার উম্মাতের একটি দল সত্যের উপর অবিচল থাকবে।

স্বল্প পরিসরে কোন মুসলিম এলাকায় এবং অনেক মুসলিম ব্যক্তির মাঝে মুর্খতা ও অজ্ঞতা পাওয়া যেতে পারে। যেমনঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

﴿أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ﴾ (صحيح مسلم: ٩٣٤)

আমার উম্মাতের মাঝে জাহিলিয়াতের চারটি বিষয় রয়েছে যা তারা ত্যাগ করতে পারবে না। বংশ নিয়ে গর্ব করা, অন্যের বংশকে দোষারোপ করা, তারকার মাধ্যমে প্রার্থনা করা এবং মৃতের জন্য বিলাপ করা।[৫২]

আবূ যার রা. কে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

তোমার মাঝে জাহিলিয়্যাত রয়েছে।[৫৩] অনুরূপ আরো অনেক হাদীছ রয়েছে।[৫৪]

উপরোক্ত আলোচনার সার কথা হলোঃ জাহ্‌ল তথা অজ্ঞতা বা মূর্খতার দিকে সর্ম্পৃক্ত করে জাহিলিয়্যাত বলা হয়। আর ইলম বা জ্ঞান শূন্যতাই হলো জাহিলিয়্যাত।

জাহিলিয়্যাত দু'প্রকারঃ

(১) আম/ব্যাপক জাহিলিয়্যাতঃ এটা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবূয়ত লাভের পূর্বে ছিল, তার নবূয়ত লাভের পর এ জাহিলিয়্যাত বিদায় নিয়েছে।

(২) কোন দেশ, শহর বা ব্যক্তি কেন্দ্রীক জাহিলিয়্যাত (অজ্ঞতা): এটা এখনও বিদ্যমান। এর মাধ্যমে যারা বর্তমান বা বিংশ শতাব্দির জাহিলিয়্যাতকে আম তথা ব্যাপকভাবে উল্লেখ করে তাদের কথা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সঠিক হলো এরূপ

---

৫২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৩৪।
৫৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৬১, আবূ দাউদ হা/৫১৫৭।
৫৪. ইকতিযাউস্ সিরাতুল মুস্তাক্বীম ১/২২৫-২২৭।

বলা যে, বর্তমান শতাব্দির কিছু লোকের বা অধিকাংশ লোকের জাহিলিয়্যাত বা অজ্ঞতা। কিন্তু বর্তমান যুগে জাহিলিয়্যাতকে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা সঠিক ও জায়িয নয়। কারণ, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবূওয়াতের পর আম বা ব্যাপক জাহিলিয়্যাত বিদায় নিয়েছে।

২। আল্ ফিস্ক্ব (الفسق) বা ফাসিক্বী

ফিস্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ: বের হওয়া। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ফিস্ক বা ফাসিক্বী হলো: আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া। আল্লাহর আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বের হওয়া উভয়কে ফিস্ক বা ফাসিক্বী বলা হয়। যেমন: পূর্ণ বের হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কাফিরকে ফাসিক্ব বলা হয়। আর আল্লাহর আনুগত্য থেকে আংশিক বের হওয়ার ক্ষেত্রে কবীরা গুনাহকারী মুমিন ব্যক্তিকে ফাসিক্ব বলা হয়। অতএব, বুঝা গেল ফাসিক্বী দু'প্রকার:

ক) এমন ফাসিক্বী যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়: আর এটা হলো কুফরী। এক্ষেত্রে কাফিরকেও ফাসিক্ব বলা হয়। ইবলিসের উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]

সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। *সূরা আল্ কাহ্ফ ১৮:৫০।*

আর শয়তানের এ ফাসিক্বী ছিল কুফরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ}

পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। *সূরা আস সাজদা:২০*

এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ কাফিরদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন। যার প্রমাণ বহন করে ঐ আয়াতেরই পরবর্তী অংশ,

{كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} [السجدة: ٢٠]

যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর। *সূরা আস্ সাজদা ৩২:২০।*

খ) এমন ফাসিক্বী যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় নাঃ মুসলমানদের মাঝে যারা কবীরা গুনাহ করে তাদেরকে ফাসিক্ব বলা হয়। তবে তার এ ফাসিক্বী তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: ٤]

যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না-ফারমান। *সূরা আন নূর ২৪:৪।*

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧]

(হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত) এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার জন্য উক্ত সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ করা জায়েজ নয়। *সূরা আল্ বাক্বারা ২:১৯৭।* অত্র আয়াতে আলিমগণ ফুসূক্বের অর্থ করেছেন পাপ কাজ।[৫৫]

৩। দ্বলাল বা পথভ্রষ্টতা (الضلال)

পথ ভ্রষ্টতা হলো সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে চলা। এটা হলো হিদায়াত বা সঠিক পথের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} [الإسراء: ١٥]

যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথ ভ্রষ্ট হয়। *সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১৫।*

---

৫৫. কিতাবুল ঈমান, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহি.) ৩৭৮ পৃষ্ঠা।

দ্বলাল শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়:

১। কুফরী অর্থে: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: ١٣٦]

যে আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে। সূরা আন্ নিসা ৪:১৩৬।

২। শিরক অর্থে: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: ١١٦]

যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। সূরা আন্ নিসা ৪:১১৬।

৩। কখন কুফরীর চেয়ে ছোট ইসলাম বিরোধী কাজের অর্থে ব্যবহৃত হয়: যেমন বলা হয়: **الفرق الضالة** অর্থাৎ সঠিক পথ বিরোধী (পথভ্রষ্ট) দলসমূহ।

৪। কখনও ভ্রান্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়: যেমন মূসা আ. বলেছিলেন:

﴿فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ} [الشعراء: ٢٠﴾

মূসা বলল, আমি সে অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম। সূরা আশ্ শুআ'রা ২৬:২০।

৫। কখনও ভুলে যাওয়া (বিস্মৃতি) অর্থে ব্যবহৃত হয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢﴾

যাতে তাদের উভয়ের একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সূরা আল্ বাক্বারা ২:২৮২।

৬। হারিয়ে যাওয়া ও অনুপস্থিতির অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে: যেমন আরবরা বলে: **ضالة الإبل** (উটের হারিয়ে যাওয়া)।[৫৬]

---

৫৬. আল্ মুফরাদাত লির রাগিব ২৯৭-২৯৮।

৪। রিদ্দাহ-الردة: স্বধর্মত্যাগ করা

রিদ্দাহ এর প্রকারভেদ ও তার বিধান (وأقسامها وأحكامها)

রিদ্দাতুন শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো: الرجوع। আর রুজূ' বা প্রত্যাবর্তন বা ফিরে আসা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة : ٢١]

আর তোমরা পেছনের দিকে প্রত্যাবর্তন কর না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সূরা আল্ মায়িদা ৫:২১। অর্থাৎ তোমরা ফিরে আসিও না।

শরী'আতের পরিভাষায় রিদ্দাতুন শব্দের অর্থ হলো: ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧]

তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। সূরা আল্ বাকারা ২:২১৭।

রিদ্দাহ বা স্বধর্মত্যাগের প্রকার: ইসলাম ভঙ্গকারী কোন একটি কাজ করার ফলে মুসলিম ব্যক্তি মুরতাদ (স্বধর্মত্যাগকারী) হয়ে যায়। ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় অনেক। তবে সংক্ষেপে তা চার প্রকারে সীমাবদ্ধ। **যা নিম্নরূপ:**

১। কথার মাধ্যমে মুরতাদ হওয়া: যেমন, আল্লাহ তা'আলা, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ফেরেশতাগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) বা আল্লাহর কোন রসূলকে গালি দেওয়া। অথবা ইলমে গায়িব বা নবূয়ত দাবী করা। অথবা যারা নবূয়ত দাবী করে তাদেরকে সত্যায়ণ করা। অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকটে দুয়া (প্রার্থনা) করা। অথবা আল্লাহ্ ছাড়া যা অন্য কেউ দিতে সক্ষম নয় সে বিষয়ে গাইরুল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং এ বিষয়ে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের আশ্রয় চাওয়া।

২। কর্মের মাধ্যমে মুরতাদ হওয়াঃ যেমন, মূর্তি, গাছ, পাথর, কবরকে সিজাদা করা এবং এগুলোর উদ্দেশ্যে জবাই করা। নাপাক স্থানে কুরআন নিক্ষেপ করা। জাদু করা, এটা শিক্ষা করা এবং অপরকে শিখানো। আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইনকে বৈধ বিশ্বাস করে তা দিয়ে বিচার ফায়ছালা করা।

৩। আক্বীদা বা বিশ্বাসগত দিক থেকে মুরতাদ হওয়াঃ যেমন, আল্লাহর শরীক (অংশীদার) রয়েছে বলে বিশ্বাস করা। অথবা এ বিশ্বাস করা যে, যিনা (ব্যাভিচার), মদ, সুদ হালাল। অথবা এ বিশ্বাস করা যে, রুটি হারাম, বা ছ্বলাত ওয়াজিব নয়। অনুরূপ কুরআন-হাদীছ এবং সকল আলিমগণের ঐকমত্যে হালাল বা হারাম অথবা ওয়াজিব বিষয়ের বিরুদ্ধাচারণ করা। আর এগুলো এমন বিষয় যা অজানা নয়।

৪। উপরোক্ত বিষয়াবলীর কোনটির প্রতি সন্দেহ পোষণের মাধ্যমে মুরতাদ হওয়াঃ যেমনঃ শিরক হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা, ব্যাভিচার ও মদ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ করা। রুটি হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা। নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য কোন নাবীর রিসালাত ও নবূয়ত বা তার সত্যবাদী হওয়ায় সন্দেহ পোষণ করা। ইসলাম ধর্ম অথবা বর্তমান যুগে তা উপযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ করা। এ সকল সন্দেহ মানুষকে মুরতাদ বানিয়ে দেয়।

৫। ত্যাগ (ছেড়ে) করার মাধ্যমে মুরতাদ হওয়াঃ যেমন- যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ছ্বলাত ছেড়ে দেয় সে মুরতাদ হয়ে যায়। কারণ, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

মুসলিম বান্দাহ এবং কুফরী ও শিরকের মাঝে পার্থক্য হলো ছ্বলাত পরিত্যাগ করা।[৫৭] এছাড়াও বিভিন্ন দলীল রয়েছে যা প্রমাণ করে ছ্বলাত পরিত্যাগকারী কাফির।

৫৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮২, ইবনে মাজাহ হা/১০৭৮।

মুরতাদ (স্বধর্মত্যাগকারী) ব্যক্তির বিধান

১। মুরতাদ ব্যক্তিকে তাওবা করতে বলতে হবে। যদি তাওবা করে তিন দিনের[৫৮] মধ্যে দীন ইসলামে ফিরে আসে তবে তার এ তাওবা গ্রহণ করতঃ তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

২। যদি তাওবা করতে অস্বীকার করে তবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

কারণ, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যায় তাকে তোমরা হত্যা করো।[৫৯] (অবশ্য এটা মুসলিম সরকারের দায়িত্ব, নিজ হাতে আইন তুলে নিয়ে কাউকে হত্যা করা যাবে না-অনুবাদক।)

৩। তাওবা চাওয়াকালীন সময়ে (তিন দিন) তাকে তার মাল খরচ করতে দেয়া যাবে না। যদি তাওবা করে ফিরে আসে তবে এ মাল-সম্পদ তার। অন্যথায় তাকে হত্যা করা বা মুরতাদ অবস্থায় তার মৃত্যু হওয়ার পর হতে তা বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ হিসাবে মুসলিম বাইতুল মালে জমা হবে। অনেকে বলেছেন: উক্ত ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পর থেকে তার সম্পদগুলো মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

৪। মুরতাদ ব্যক্তি এবং তার আত্মীয়দের মাঝে উত্তরাধিকার রহিত হয়ে যাবে। ফলে মুরতাদ ও তার আত্মীয়রা পরস্পর উত্তরাধিকার হবে না।

৫। যদি ঐ ব্যক্তি মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় তবে তাকে গোসল দেয়া যাবে না, তার জানাযার ছ্বলাত আদায় করা হবে না এবং মুসলমানদের কবর স্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। তাকে কাফির তথা অমুসলিমদের কবর স্থানে দাফন করতে হবে। অথবা মুসলমানদের কবরস্থান ব্যতীত অন্য যে কোন স্থানে তার লাশ পুতে ফেলতে হবে।

---

৫৮. মুয়াত্তা মালিক (২/৭৩৭/১৬), বিচার সম্পর্কিত অধ্যায়: ইসলাম ত্যাগ করলে তার ফায়সালা পরিচ্ছেদ দেখুন। যঈফ, আল ইরওয়া ৮/১৩০ (২৪৭৪ নং হাদীছ)।
৫৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০১৭, ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৫, তিরমিযী হা/১৪৫৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

أقوال وأفعال تُنافِي التوحيد أو تُنقِصُه

এমন কিছু কথা ও কাজ যা তাওহীদ পরিপন্থী অথবা তাওহীদকে ত্রুটিযুক্ত করে।

এ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদগুলো সন্নিবেশিত হয়েছেঃ

১ম পরিচ্ছেদঃ হাতের তালু, কাপ-পেয়ালা পড়ে বা তারকা গণনার মাধ্যমে ইলমে গায়িব বা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করা।

২য় পরিচ্ছেদঃ জাদু, জ্যোতিষী এবং গণকদারী করা।

৩য় পরিচ্ছেদঃ কবর মাজারে নযর মানত, হাদিয়া ও নৈকট্যলাভের জন্য উপঢৌকন দেওয়া এবং এসকল স্থানকে সম্মান করা।

৪র্থ পরিচ্ছেদঃ বিভিন্ন মূর্তি এবং স্মৃতি স্তম্ভকে সম্মান করা।

৫ম পরিচ্ছেদঃ দীন বা ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা এবং তার সম্মানকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার কার্য ফায়ছালা করা।

৭ম পরিচ্ছেদঃ শরী‘আত পরিবর্তন এবং হালাল-হারাম করার ক্ষমতা রয়েছে বলে দাবী করা।

৮ম পরিচ্ছেদঃ নাস্তিকতা এবং জাহিলী দল ও মতের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করা।

৯ম পরিচ্ছেদঃ দুনিয়াই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে বিশ্বাস করা।

১০ম পরিচ্ছেদঃ তাবিজ-কবচ ও ঝাঁড়-ফুঁক।

১১তম পরিচ্ছেদঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা, অসীলা বা মাধ্যম গ্রহণ এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন সৃষ্টি জীবের নিকটে সাহায্য চাওয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ادِّعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما

হাতের তালু, কাপ-পেয়ালা পড়ে বা তারকা গণনার মাধ্যমে ইলমে গায়িব বা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করা

ইলমে গায়িব দ্বারা উদ্দেশ্য: মানুষ যা দেখতে পায়না এবং ভবিষ্যত ও অতীত কালের যে সকল বিষয় মানুষের অগোচরে রয়েছে তাকে ইলমে গায়িব বা অদৃশ্যের জ্ঞান বলে। গায়িবের ইলমকে আল্লাহ তা'আলা কেবল নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [النمل: ٦٥]

বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না। সূরা আন্ নাম্‌ল ৬৫।

অতএব, এক মাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ গায়িব বা অদৃশ্যের খবর জানে না। তবে হিকমত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ কখনো তার রসূলগণকে (আলাইহিমুস্ সলাতু অস্-সালাম) কিছু গায়িবের সংবাদ জানিয়ে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: ٢٦، ٢٧]

তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তার মনোনীত রসূল ব্যতীত। সূরা আল্ জ্বিন ২৬-২৭।

অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ্ রিসালাতের জন্য চয়ন করেছেন তারা ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহর ঐ গায়িবী ইলমের সামান্য কিছু জানতে পারে না। আর রিসালাতের জন্য চয়নকৃত ব্যক্তিকেও আল্লাহ্ নিজের ইচ্ছায় কিছু ইলমে গায়িব দিয়ে থাকেন।

কারণ, মুজিযার (অলৌকিক ঘটনা যা মানুষ করতে পারে না) দ্বারা ঐ রসূলের নবূয়তের সত্যতার দলীল পেশ করা হয়। মুজিযার অন্যতম প্রকার হলো গায়িবী বিষয়ে সংবাদ দেওয়া। তাই আল্লাহ তা'আলা কোন কোন রসূলকে (আলাইহিমুস্ সালাম) নিজ ইচ্ছামত কিছু গায়িবী বিষয়ে অবহিত করেন। আর এ রসূল ফেরেশতা বা মানুষ উভয়টি হতে পারেন।

আল্লাহ্ ফেরেশতা বা মানুষ রসূল ছাড়া অন্য কাউকে গায়িবী ইলমের কোন কিছু সংবাদ দেন না। সূরা জ্বিনের উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে "হাসর" তথা সীমাবদ্ধ করণ পদ্ধতি তাই প্রমাণ করে।

অতএব, আল্লাহ্ তার স্বীয় রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) যাদেরকে ইলমে গায়িবের কিছু অংশ জানিয়েছেন তারা ব্যতীত অন্য কেউ যে কোন উপায়ে ইলমে গায়িবের দাবী করলে সে মিথ্যাবাদী ও কাফির। চাই সে হাত বা পেয়ালা (চায়ের কাপ) পড়ে বা জ্যোতিষী বা জাদু বা তারকা গণনার মাধ্যমে অথবা অন্য যেকোন উপায়ে ইলমে গায়িবের দাবী করুক না কেন? ধুরন্দর এবং দাজ্জাল প্রকৃতির কিছু লোকদেরকে এমনটিই করতে দেখা যায়। ফলে তারা হারিয়ে যাওয়া বস্তুর স্থান, অনুপস্থিত দ্রব্যাদি এবং কিছু রোগের কারণ সম্পর্কে সংবাদ দেয়।

তারা বলেঃ অমুক ব্যক্তি তোমার জন্য এমন কাজ করেছে ফলে তুমি অসুস্থ্য হয়েছো। মূলতঃ এক্ষেত্রে তারা জ্বিন এবং শয়তানদেরকে ব্যবহার করে থাকে। তারা মানুষের নিকটে এমনভাব দেখায় যে, আল্লাহর বিশেষ বান্দা হওয়ার দরুন তারা এসবের সংবাদ দিতে পারে। অথচ এক্ষেত্রে তারা মানুষদেরকে ধোকা দিয়ে এবং ধুম্রজালে ফেলে জাদু, জ্যোতিষী এবং গণকের দ্বারাই কাজগুলো হাসিল করে থাকে। যা স্পষ্ট শিরক।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহি. বলেনঃ জ্যোতিষীদের প্রত্যেকের একজন করে শয়তান বন্ধু রয়েছে। এ শয়তানেরা আসমান হতে চুরি করে যা শ্রবণ করে তার সাথে আরো অসংখ্য মিথ্যা মিলিয়ে এ সকল জ্যোতিষীদেরকে বিভিন্ন গায়িবী বিষয়ে সংবাদ দিয়ে থাকে। তিনি এও বলেছেন যে, এসকল জ্যোতিষী ও গণকদের অনেকের নিকটে শয়তানেরা বিভিন্ন প্রকার খাবার, ফল-মূল এবং হালুয়া ও অন্যান্য খাবার নিয়ে আসে যা এ স্থানে পাওয়া যায় না। আবার এদের অনেককে নিয়ে শয়তান জ্বিনেরা মক্কা বা বাইতুল মোকাদ্দাস অথবা অন্য কোন স্থানে উড়ে বেড়ায়।[৬০]

কখনও তারা তারকা গণনা করে এসকল সংবাদ দিয়ে থাকে। আর তা হলো জ্যোতির্বিদ্যার উপর নির্ভর করে দুনিয়ায় ঘটমান বিষয়াদির উপর প্রমাণ গ্রহণ করা। যেমনঃ দমকা হাওয়া বওয়া এবং বৃষ্টি বর্ষন, বিভিন্ন দ্রব্যাদির মূল্য পরিবর্তন হওয়া। এছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে ধারণা করা হয় যে, তারকার চলার কক্ষ পথ, মিলন ও বিচ্ছেদ জানতে পারলে সেগুলো জানা সম্ভব।

৬০. মাজমুআতুত্তাওহীদ ৭৯৭, ৮০১।

তারা আরো বলে যে, অমুক তারকা থাকা কালীন যারা বিয়ে করবে তাদের ভাগ্যে এমন এমন ঘটবে। যারা অমুক তারকায় সফর করবে তার কপালে এমন হবে। যারা অমুক তারকা থাকাকালীন সময়ে জন্ম গ্রহণ করবে তাদের ভাগ্যে এমন শুভ লক্ষণ অথবা দুর্দশা (সুখ-দুঃখ) আসতে পারে। বিভিন্ন বাজে পত্রিকাসমূহে রাশি চক্রের গণনার মাধ্যমে কিছু উদ্ভট কথা লিখা হয়।

কতেক অজ্ঞ এবং দুর্বল ঈমানের লোক এসকল গণকদের নিকটে গিয়ে নিজেদের জীবনের ভবিষ্যত, বিয়ে শাদী ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

যারা ইলমে গায়িবের দাবী করে অথবা যারা তাদেরকে বিশ্বাস করে তারা উভয়েই মুশরিক এবং কাফির। কারণ, তারা আল্লাহর বিশেষত্ব ও খাস বিষয়ে তার শরীকানা বা অংশিদারের দাবী করে। তারকা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং তারই সৃষ্টি। কোন বিষয়ে ভাল মন্দ করার ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। আর কোন তারকা কাহারও দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, মৃত্যু এবং বেঁচে থাকার প্রমাণ বহণ করে না। সমাজে এ ধরনের যা কিছু প্রচলিত রয়েছে তার সবই শয়তানদের কাজ। শয়তানেরা আসমান থেকে কিছু শ্রবণ করতঃ তার সাথে হাজারো মিথ্যা মিশিয়ে জন সমাজে তা প্রকাশ ও প্রচার করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

السحرُ والكهانةُ والعِرافة

জাদু, ভাগ্য গণনা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা

উল্লেখিত বিষয়সমূহ সবই শয়তানী ও হারাম কাজ যা সঠিক আক্বীদার পরিপন্থী ও তাতে ত্রুটিকারী বিষয়। কারণ, শিরকী কর্ম কান্ড ছাড়া তা সম্পাদিত হয় না।

ক। জাদুর সংজ্ঞা: জাদু এমন এক বিষয়ের নাম যার কারণ গোপন, সূক্ষ্ম ও উহ্য থাকে। জাদুকে আরবীতে সেহ্‌র বলে নাম করণের কারণ হলো তা এমন কিছু গোপন বিষয়াবলীর মাধ্যমে করা হয় যা চোখে দেখা যায় না। এটা হলো কিছু মন্ত্র ও ঝাড় ফুঁক, কিছু কথা যা জাদুকর বলে, কিছু ঔষধ ও ধোঁয়া।

উল্লেখ্য জাদুর বাস্তবতা রয়েছে। কিছু জাদু হৃদয় ও শরীরে প্রভাব বিস্তার করে ফলে ঐ ব্যক্তি অসুস্থ্য হয়, কখনো মারা যায়। আবার কখনো জাদুর মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা হয়। আর জাদুর এ প্রভাব আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য ও বিধিমোতাবেকেই সংঘটিত হয়ে থাকে। (এমন নয় যে আল্লাহ যা চান না, জাদুকরেরা তা করতে পারে)।

নিঃসন্দেহে জাদু শয়তানী কাজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরক এবং খারাপ-ঘৃণিত আত্মাসমূহের চাহিদা মত নৈকট্যলাভ ছাড়া এ জাদু ও তার প্রভাব হয় না। ঐ নাপাক প্রেতাত্মাগুলোকে আল্লাহর সাথে শরীক করা ব্যতীত জাদুকরের কার্য সিদ্ধি হয় না। সঙ্গত কারণেই শরী'আত প্রবর্তক জাদুকে শিরকের সাথে সংযুক্ত করেছেন। যেমন,

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (صحيح البخاري ٢٧٦٦)

তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। ছাহাবাগণ বললেন: ঐ সাতটি বিষয় কি হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং জাদু করা, আল্লাহর হারামকৃত আত্মাকে

অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ পলায়ন করা এবং সতী সাধ্বী মুমিনা নারীদেরকে যিনার অপবাদ দেয়া।[৬১]

জাদু দু'দিক দিয়ে শিরকের অন্তর্ভুক্ত:

প্রথম দিক: জাদুতে শয়তানদেরকে ব্যবহার করা হয়। তাদের সাথে গাঢ় সম্পর্ক রাখতে হয় এবং চাহিদানুযায়ী তাদের নৈকট্য অর্জন করতে হয়। বিনিময়ে তারা জাদুকরের প্রার্থিত খেদমত আঞ্জাম দেয়। অতএব, জাদু শয়তানের শিক্ষা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: ١٠٢]

শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। *সূরা আল-বাক্বারা ২: ১০২।*

দ্বিতীয় দিক: জাদুতে ইলমে গায়িবের দাবী করা হয়। যা আল্লাহর সাথে শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর এটা হলো কুফরী ও ভ্রষ্টতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: ١٠٢]

তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। *সূরা আল-বাক্বারা ২:১০২।*

অবস্থা যদি এরূপই হয় তবে এতে কোন সন্দেহ নাই যে, জাদু করা শিরক ও কুফরী এবং সঠিক আক্বীদা নষ্টকারী বিষয়। যারা জাদু করে তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। যেমন প্রথম সারির ছাহাবাগণ জাদুকরদের একটি দলকে হত্যা করে ছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষেরা জাদুকর ও জাদুর বিষয়টিকে সাধারণ চোখে দেখে। অনেকে আবার একে শিল্পকলা ও প্রযুক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। যা দিয়ে তারা অন্যের উপর অহংকার করে। জাদুকরদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে আজ বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। এ উপলক্ষে জাদুকরদের জন্য অনেক সভা, সমিতি ও প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়।
যাতে অসংখ্য কল্যাণকামী ও উৎসাহদানকারী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে থাকে। জাদুকে মানুষ আজ সার্কাস নামে আখ্যায়িত করেছে। এটা দীন সম্পর্কে চরম

---

৬১. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৬৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৯, আবূ দাউদ হা/২৮৭৪।

অজ্ঞতা, আক্বীদার ক্ষেত্রে অবহেলা এবং খেল-তামাশাকারীদেরকে স্থান করে দেয়া ছাড়া আর কিছুই না।

খ। ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা:

এটা ইলমে গায়িব ও অদৃশ্যের বিষয়াবলী জানার দাবী করা। যেমন, পৃথিবীতে ভবিষ্যতে কি আপতিত ও সংঘটিত হবে এবং হারানো বস্তুর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। আকাশের সংবাদ চুরিকারী শয়তানদেরকে ব্যবহার করে তারা এসব সংবাদ দিয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} [الشعراء: ٢٢١ – ٢٢٣]

আমি আপনাকে বলব কি কার উপর শয়তানেরা অবতরণ করে? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গুনাহগারের উপর। তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। *সূরা আশ শু'আরা* ২৬:২২১-২২৩।

শয়তানরা ফেরেশতাদের কিছু কথা চুরি করে তা জ্যোতিষীদের কানে দেয়। জ্যোতিষী তখন ঐ একটি সত্য কথার সাথে আরো শত মিথ্যা কথা মিশিয়ে জনগণকে সংবাদ দেয়। আর আকাশ থেকে শ্রুত ঐ একটি সত্য কথা থাকার কারণে মানুষেরা উক্ত জ্যোতিষীকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। একমাত্র আল্লাহই কেবল ইলমে গায়িব জানেন।

অতএব, কেউ যদি জ্যোতিষী বা অন্য কোন উপায়ে ইলমে গায়িবে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করে অথবা যারা ইলমে গায়িব দাবী করে তাদেরকে বিশ্বাস করে তবে সে আল্লাহর বিশেষত্বে অন্যকে শরীক করলো। জ্যোতির্বিদ্যা শিরক মুক্ত নয়। কারণ এতে শয়তানের চাহিদামত বিষয় দ্বারা তার নৈকট্য অর্জন করা হয়।

আল্লাহর ইলমে শরীকানার দাবী থাকায় ইলমে গায়িবের দাবীকে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করা হয়। অপর দিকে ইবাদতের কিছু অংশ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করায় এতে ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়।

আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
(سنن ابن ماجه ٦٣٩)

যে ব্যক্তি স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় অথবা স্ত্রীর পিছনের রাস্তায় সহবাস করে অথবা জ্যোতিষীর নিকটে এসে তার বলা কথাগুলো বিশ্বাস করে সে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত বিষয়াবলীর সাথে কুফরী করে।[৬২]

একটি জরুরী সতর্কীকরণ:

জাদুকর, জ্যোতিষী এবং গণকেরা মানুষের আক্বীদা নষ্ট করে। তারা নিজেদেরকে চিকিৎসকরুপে জাহির করতঃ রোগীদেরকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে পশু জবাই করতে বলে। যেমন তারা বলে: এরূপ গুণ সম্পন্ন দুম্বা বা মুরগী জবাই করবেন। অথবা অনেক সময় তারা রোগীদেরকে বিভিন্ন শিরকী যাদু মন্ত্র এবং অবোধগম্য ও সুরক্ষিত শয়তানী তাবিজ কবচ লিখে দিয়ে তাদের গলায় ঝুলাতে বা বাক্সে অথবা বাড়ীতে রাখতে বলে।

অনেক জাদুকর ও গণক ইলমে গায়েবের খবর দিয়ে নিজে গায়েব জানার দাবী করে। লোকের হারানো বস্তুর সন্ধান স্থানসহ বলে দেয়। ফলে অজ্ঞ-মূর্খ জন সাধারণ তাদের হারানো বস্তু ফিরে পাবার আশায় তাদের নিকটে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আর এসুযোগে তারা তাদের অনুগত সহচর শয়তান দ্বারা সে সব বস্তুর সংবাদ বলে দেয় এবং তা এনে উপস্থিতও করে। এদের অনেকে আলৌকিক ঘটনা জাহিরের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর ওলী বা শিল্পী ও কারিগর হিসাবে প্রকাশ করে। যেমন, আগুনের মাঝে প্রবেশ করা, অথচ আগুন তার কোন ক্ষতি করে না।

অস্ত্র দিয়ে নিজেই নিজেকে প্রহার করা, অথবা নিজেকে গাড়ির চাকার নিচে নিক্ষেপ করা অথচ এতে তার কোন ক্ষতি হয় না। এছাড়াও তারা আরো অনেক বিস্ময়কর কাজ করে দেখায় যা শয়তানী ও জাদু ছাড়া কিছুই নয়। মানুষদেরকে ফিতনায় ফেলার উদ্দেশ্যে তারা এরূপ করে থাকে। অথবা এগুলো নিছক খেয়ালী বিষয় বাস্তবতার সাথে যার সামান্যতম মিল নেই। বরং এগুলো গোপন কিছু কৌশল যার দ্বারা জনগনের চোখে ভেলকী লাগিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, রশি ও লাঠি দ্বারা ফিরআউনের যাদুকরেরা সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল।

---

৬২. ছ্বহীহ: সুনানে ইবনে মাজাহ ৬৩৯।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ্ রহি. বাতায়িহিয়্যাহ্-আহমাদিয়্যাহ্-রিফাইয়্যাহ্ সম্প্রদায়ের সাথে সংঘটিত এক বিতর্ক সভার উল্লেখ করে বলেন:

বাতায়িহিয়্যাহ্ সম্প্রদায়ের এক বুযুর্গ গলাবাজি করে বলে যে, আমরা এমন শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতা রাখি যা অন্য কেউ রাখে না। যেমন: বিশেষ করে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী। সুতরাং সর্ব অবস্থায় আমরাই বিজয়ী।

তখন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়া রহি. রাগান্বিত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলেন:

আমি পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্তের আহমাদী জামা'আতের সকলকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, তারা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে যা করবে আমিও তাই করতে সদা প্রস্তুত। যে আগুনে জ্বলে যাবে সে হবে পরাজিত। আল্লাহর অভিশাপ তার উপর বর্ষিত হোক।

তবে শর্ত হলো এ কাজ করার আগে আমাদের উভয়দলের লোকদের শরীর সিরকা (এক প্রকার অম্লস্বাদ পানীয়) এবং গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। তখন নেতা ও জনসাধারণ এ বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাদেরকে বলেছিলাম: আগুনের তাপদাহ্ ও ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। যেমন, ব্যাঙ্গের তৈল, জামিরের (কমলালেবু জাতীয় একটি ফল) খোসা এবং ত্বলাক্ব নামী পাথরের সংমিশ্রণে তারা এমন এক পদার্থ তৈরী করে যা ব্যবহার করে আগুনে ঝাঁপ দিলে আগুন শরীরের কোন ক্ষতি করতে পারে না। এটা শুনে মানুষেরা হৈ চৈ ও চিৎকার করতে লাগলো।

এতে করে ঐ আহমাদী বুযুর্গ তার শক্তি জাহির করতে বললো, আমার এবং আপনার শরীর ম্যাচের বারুদ দিয়ে মাখিয়ে বিশেষ এক প্রকার চাটাইয়ে জড়িয়ে আমাদেরকে ঘুরানো হবে। আমি তাকে বললাম, উঠ এবং চলো আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত আছি। এ বিষয়ে আমি তাকে তাগাদা দিতে লাগলাম। সে হাত বাড়িয়ে জামা খুলার ভান করলো।

তখন আমি তাকে বললাম: আমি তোমার সাথে এ কাজ করতে রাজি আছি। তবে তার আগে সিরকা ও গরম পানি দিয়ে তোমাকে গোসল করতে হবে। তখন তাদের অভ্যাস অনুযায়ী সে মানুষদের মাঝে সংশয় সৃষ্টির জন্য বললোঃ যারা বাদশাকে ভালবাসে তারা যেন একটা করে লাঠি উপস্থিত করে। তখন আমি তাকে বললাম: এ হলো বাড়াবাড়ি এবং মানুষের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টির অপপ্রয়াস যার দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। বরং একটি মোম বাতি নিয়ে এসে জ্বালাও এবং আমাদের উভয়ের হাত ধৌত করার পর আমরা তাতে নিজেদের অঙ্গুলি

প্রবেশ করাবো। আর যার অঙ্গুলি পুড়ে যাবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক অথবা বলেছিলাম সে হবে পরাজিত। আমি এমন প্রস্তাব দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং লাঞ্ছিত হয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করে।[৬৩]

উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য: এ সকল দাজ্জালেরা এরূপ সূক্ষ্ম কৌশলে মানুষদের সামনে মিথ্যা বলে থাকে। যেমনঃ একটি চুল দিয়ে গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়া, নিজেকে গাড়ির চাকার তলে নিক্ষেপ করা, নিজের দু'চোখে লোহার শিঁক প্রবেশ করানো। এছাড়াও তারা আরো বিভিন্ন শয়তানী ভেলকী বাজী মানুষদেরকে দেখিয়ে থাকে।

৬৩. মাজমূউল ফতোয়া ১১/৪৪৫-৪৪৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها

নৈকট্য লাভের জন্য মাযার ও কবরে নযর-মানত, উপঢৌকনপেশসহ এগুলোকে সম্মান করা

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরকের দিকে ধাবিতকারী সকল রাস্তা বন্ধ করতঃ তা থেকে সর্বাত্মক সতর্ক করে গেছেন। এশিরকের আওতাভূক্ত হলো, কবরের মাসআলাটি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের ইবাদত এবং কবরস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা থেকে বাঁচার জন্য নিম্নে বর্ণিত মূলনীতিগুলো নির্ধারণ করেছেন:

১। ওলী এবং সৎ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **নিষেধ করেছেন**। কারণ পরিশেষে তা ঐসকল ব্যক্তিদের ইবাদতের দিকে ধাবিত করে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ (سنن ابن ماجه ٣٠٢٩)

দীনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে। কারণ, দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে।[৬৪]

তিনি আরো বলেন:

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (صحيح البخاري:٣٤٤٥)

তোমরা আমাকে নিয়ে তেমন বাড়াবাড়ি করিওনা যেমন খ্রিষ্টানেরা মরিয়ম তনয় ঈসা আ. কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো কেবল আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র। অতএব, তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রসূল বলো।[৬৫]

---

৬৪. ছ্বহীহ: সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৩০২৯।
৬৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫।

২। কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করতেও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **নিষেধ করেছেন।** যেমন-

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ»

আবুল হাইয়্যাজ আল্ আসাদী রহি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রা. আমাকে বললেন: আমি কি তোমাকে সেই বিষয় দিয়ে প্রেরণ করবো না যা দিয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রেরণ করে ছিলেন? আর তা হলো, তুমি যত মূর্তি পাবে তা বিলুপ্ত করবে এবং যত উঁচু কবর পাবে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।[৬৬]

৩। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা এবং তার উপর কোন কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। জাবির রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা করণ, তার উপর বসা এবং তার উপর কোন কিছু তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।[৬৭]

৪। কবরের নিকটে ছ্বলাত আদায় করতেও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **নিষেধ করেছেন।** আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا

যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু সমাগত হয় তখন তিনি একটি নকশাযুক্ত চাদর বার বার নিজের চেহারার উপর দিচ্ছিলেন। যখন বিষণ্ন হয়ে যেতেন তখন তিনি তা নিজের চেহারা থেকে সরিয়ে নিতেন। ঐ অবস্থায় তিনি বলেন: ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ!! কারণ তারা তাদের নাবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিনত করেছিল। তাদের কর্ম থেকে

---

৬৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৬৯।

৬৭. ছ্বহীহ মুসলিম ৯৭০।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মাতকে সতর্ক করেছেন।[৬৮] তিনি আরো বলেন:

وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا (مسند أحمد)

এমন যদি না হতো তবে ফাঁকা স্থানে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দাফন করা হতো। তবে তিনি তার কবরকে মসজিদ বানানোর ভয় করছিলেন।[৬৯] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ (صحيح مسلم (٥٣٢)

সাবধান এবং সতর্ক হও! তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নাবী ও সৎব্যক্তিদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল, সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করিওনা। আমি তোমাদিগকে এটা থেকে নিষেধ করছি।[৭০]

কবরকে মসজিদ বানানোর অর্থ: সেখানে ছ্বলাত আদায় করা যদিও তার উপরে মসজিদ তৈরী না করে। যে সকল স্থানে ছ্বলাত আদায় করা হয় তাকেই মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যেমন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (صحيح البخاري (٤٣٨-٣٣٥)

যমীনের সকল (পবিত্র) স্থানকে আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্র মাটিকে পবিত্রকারী করা হয়েছে।[৭১]

কবরের উপর যদি মসজিদ নির্মাণ করা হয় তবে বিষয়টি খুব কঠিনরূপ ধারণ করে। অধিকাংশ মানুষ এ সকল নিষেধ অমান্য করতঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষেধের বিরোধিতা করে চলেছে।

যার কারণে তারা শিরকে আকবারে পতিত হয়েছে। তাইতো দেখা যায় মানুষেরা আজ কবরের উপর মসজিদ, সমাধি এবং খানকা নির্মাণ করে সেগুলোকে মাযারে

---

৬৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩১।
৬৯. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ ২৪৫১৩, ২৪৮৯৫।
৭০. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩২, ইবনে আবী শাইবা হা/৭৫৪৬।
৭১. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৫, ৪৩৮, তিরমিযী হা/১৫৫৩, নাসাঈ হা/৪৩২, বাইহাকী হা/১০১৭।

পরিণত করতঃ তথায় সকল প্রকার শিরকে আকবারের চর্চা করে চলেছে। যেমন: তার জন্য জবেহ্ করা, কবর বা মাযারস্থ ব্যক্তিকে আহ্বান করা তথা তার নিকটে কিছু প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা। তাদের জন্য নযর মানত পেশ করা ইত্যাদী।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম রহি. বলেনঃ (যারা আজ কবর বিষয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ-নিষেধ, তার ছাহাবাগণের নীতি এবং বর্তমান সময়ের মানুষদের আমলের মাঝে তুলনা করবেন তারা অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, উভয়টি পরস্পর বিরোধী এবং কর্তনকারী। (তিনি এটা তার সময়ের কথা বলেছেন, যা আজ আরো কঠিনরূপ ধারণ করেছে)। এ উভয় পথ কোন দিন কোন ক্রমেই এক হতে পারে না।

কারণ, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরমুখী হয়ে ছ্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আর এরা কবরের নিকটে ছ্বলাত আদায় করে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন, আর এসকল লোকেরা কিনা কবরের উপর উপর মসজিদ বানিয়ে বসে আছে। আল্লাহর গৃহের বিরোধিতা করতে তারা এসবের নাম দিয়েছে মাশাহেদ বা তীর্থ বা পবিত্র স্থান। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপরে বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন, আর এরা তার উপর মোম বাতি ও প্রদীপ জ্বালানোর জন্য লোক নিয়োগ করে রেখেছে।

তিনি কবরকে উৎসবের স্থান বানাতে নিষেধ করেছেন। অথচ এরা সেটাকে উৎসব ও উৎস্বর্গের স্থানে পরিণত করেছে। এ সকল স্থানে তারা ঈদের মতো বা তার চেয়েও বেশী সংখ্যা ও গুরুত্বসহকারে অধিক আগ্রহ নিয়ে উপস্থিত হয়।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরকে যমীন বরাবর করতে আদেশ দিয়েছেন। যেমন ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

আবুল হাইয়্যাজ আল্ আসাদী রহি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী রা. আমাকে বললেন: আমি কি তোমাকে সেই বিষয় দিয়ে প্রেরণ করব না যা দিয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রেরণ করে ছিলেন? আর তা হলো, তুমি

যত মূর্তি পাবে তা বিলুপ্ত এবং যত উঁচু কবর পাবে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।[৭২] ছ্বহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا

সুমামাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা ফাযালাহ্ ইবনে উবাইদের সাথে রোম দেশের বেরুদিস এলাকায় থাকাকালীন সময়ে আমাদের এক সাথী ইন্তেকাল করলে ফাযালাহ রা. তার কবরকে মাটির সমান্তরাল করতে বললে তাই করা হলো। এরপর তিনি বললেন: আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কবরকে মাটির সমান্তরাল করার আদেশ দিতে শুনেছি।[৭৩]

আর এরা কিনা পূর্বোল্লেখিত হাদীছ দু'টির বিরোধীতা করতে উঠে পড়ে লেগেছে? ফলে তারা কবরসমুহকে মাটি হতে উঁচু করে বাড়ি সদৃশ্য করতঃ তার উপরে কুব্বা বা গম্বুজ নির্মান করা শুরু করেছে!!!

ইবনে ক্বাইয়িম রহি. বলেন: কবরের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধানাবলীর ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ নিষেধ এবং এদের কর্মকান্ডের মাঝের বিশাল পার্থক্যের কথা ভেবে দেখুন! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান সময়ে কবর কেন্দ্রিক যা কিছু হচ্ছে তাতে এমন ক্ষতি রয়েছে যা বান্দা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। এর পর তিনি ঐক্ষতিগুলো উল্লেখ করা শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারতের সময় যা শরী'আত সম্মত করেছেন তা হলো:

পরকালকে স্মরণ করা, যিয়ারতকৃত (কবরস্থ) ব্যক্তির জন্য দু'আ করতঃ আল্লাহর রহমত, ক্ষমা এবং নিরাপত্তা কামনা করা। এর মাধ্যমে যিয়ারতকারী নিজের ও মৃত ব্যক্তির প্রতি দয়া করে থাকে।

আর এসকল মুশরিকরা বিষয়টির পট পরিবর্তন করে দীনের বিরোধীতা করা শুরু করতঃ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য করেছে:

আল্লাহর সাথে কবরস্থ ব্যক্তিকে শরীক করা, স্বয়ং তাকে ডাকা, তার মাধ্যমে দু'আ করা, তার নিকটে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের দরখাস্ত করা, কবরস্থ ব্যক্তির

---

৭২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৬৯, মুসনাদে আহমাদ হা/৭৪১।
৭৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৬৮, আবূ দাউদ হা/৩২১৯, নাসাঈ হা/২০৩০।

পক্ষ থেকে বরকত প্রার্থনা করা এবং নিজেদের শত্রুদের উপর বিজয় চাওয়া ইত্যাদি।

ফলে তারা নিজেদের এবং মৃত ব্যক্তির প্রতি দয়া করার পরিবর্তে জঘন্য আচরণ করে। যিয়ারতকারী ও মৃত ব্যক্তি যদি উল্লিখিত দয়া হতে বঞ্চিত না হতো তবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তির জন্য রহমত, ক্ষমা চাওয়াসহ অন্যান্য দু'আ করা শরী'আত সম্মত করতেন না।[৭৪]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মাযার, ওরশ ইত্যাদির জন্য নযর, মানত, হাদীয়া, তোহফা ইত্যাদি পেশ করা শিরকে আকবার বা বড় শিরক। তার কারণ এতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর বিষয়ক দিক নির্দেশনার বিরোধীতা করা হয়। যেমনঃ মসজিদসহ কবরের উপর কোন কিছু নির্মাণ না করা। কেননা, যখন কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করতঃ তার পার্শ্বে মসজিদ ও মাযার নির্মাণ করা হয়েছে তখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা ধারণা করতে শুরু করেছে যে, অত্র কবরস্থ ব্যক্তিরা মানুষের উপকার করতে পারে অথবা অপকার করার ক্ষমতা রাখে। বিপদের সময় কেউ তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তাতে সাড়া দেন। যারা তাদের নিকটে আশ্রয় চায় তারা তাদেরকে আশ্রয় দেয়। ফলে এসকল অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিরা মৃত ব্যক্তি ও মাযারের জন্য নযর মানত পেশ করা শুরু করে। এমনকি তা এমন মূর্তিতে রুপান্তরিত হয়েছে মানুষেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার ইবাদত করতে শুরু করেছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ

হে আল্লাহ, তুমি আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না যে, মানুষেরা যার ইবাদত করা শুরু করে।[৭৫]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজন্য এ দু'আ করেছেন যে, এ উম্মাতের কিছু লোক এরূপ করবে। অনেক মুসলিম দেশে কবর কেন্দ্রিক এ সকল শিরক ব্যাপকহারে বিস্তার লাভ করেছে।

অপর দিকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে শিরক থেকে হেফাযত করেছেন। যদিও তার ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে অজ্ঞ এবং অপসংস্কৃতিতে বিশ্বাসীদের দ্বারা বেশ কিছু ইসলাম বিরোধী কাজ হতে দেখা যায়। তবে তারা তার কবর পর্যন্ত পৌঁছতে

---

৭৪. ইগাসাতুল্ লেহ্ফান (১/২১৪, ২১৫, ২১৭ পৃষ্ঠা)।
৭৫. ছ্বহীহঃ মুয়াত্তা মালিক ৫৭০ ও মুসনাদে আহমাদ।

পারে না। কারণ তার কবর তার বাড়ীতে, মসজিদে নয়। আর তা কয়েকটি প্রাচীর দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে ক্বাইয়িম রহি. বলেন: আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেছেন। তাই তো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরকে তিনটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করে রাখা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

في بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية

ভাস্কর্য ও প্রতিমা এবং স্মৃতিসৌধের প্রতি সম্মান করার বিধান

التماثيل "তামাসীল" শব্দটি تمثال তিমসাল শব্দের বহুবচন। তিমসাল (ভাস্কর্য ও প্রতিমা) হলোঃ মানুষ, জীব-জন্তু অথবা অন্য কোন প্রাণীর আকৃতি বিশিষ্ট মূর্তি।

নুসুব (স্মৃতিসৌধ) শব্দটির মূল অর্থ হলো- ঐ নিদর্শন (কোন প্রাণহীন জিনিসের আকৃতিতে নির্মিত প্রতীকী চিহ্ন) বা পাথর যার নিকটে মুশরিকরা নিজেদের পশু যবাই করতো। সুতরাং স্মৃতিসৌধ হল এমন মূর্তি যা মুশরিকরা নিজেদের নেতা বা সমাজপতির স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে ফাঁকা কোন স্থানে তৈরী করতো।

আত্মা বা প্রাণ বিশিষ্ট জিনিসের ছবি তৈরী করা থেকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক ও সাবধান করে গেছেন। বিশেষতঃ মানুষদের মাঝে যাদেরকে সম্মান করা হয়। যেমনঃ জ্ঞানী-গুণী, কোন আলেম, রাজা-বাদশাহ, আবেদ বা ধর্ম জাযক (তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পীর), নেতা এবং সমাজপতিদের মূর্তি তৈরী করা। (বিশেষ প্রয়োজনে ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা সীমিত সংখ্যক ছবিকে আলেমগণ জায়িয বলেছেন। যেমনঃ পাসপোর্ট বা এধরণের কাজের জন্য ছবি তোলা)।

এসকল মূর্তি (ছবি) বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে যার সবগুলোই নিষিদ্ধ। যেমনঃ সাইনবোর্ড, কাগজ, দেয়াল ও কাপড়ের উপর অংকিত ছবি। বর্তমান যুগে প্রচলিত ক্যামেরা বা অন্য কোন অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে তোলা ছবি। অথবা খোদাই করে কোন মূর্তি বা ছবি তৈরী করা, মূর্তির আকৃতিতে কোন ছবি নির্মাণ করা ইত্যাদি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেয়াল ও অনুরূপ স্থানসমূহে ছবি টাঙ্গাতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিষেধ করেছেন মূর্তির আকৃতিতে প্রাণ বিশিষ্ট বস্তুর দেহ তৈরী করতে। যার অন্যতম হলো স্মৃতি স্তম্ভ, কারণ তা শিরকে পতিত করার মাধ্যম। কেননা, ছবি ও প্রতিমা নির্মাণের কারণেই পৃথিবীতে সর্ব প্রথম শিরকের সূত্রপাত হয়। আর সে ঘটনা ছিল নিম্নরূপঃ

নূহ্ আ. এর ক্বওমে বেশ কিছু সৎ ব্যক্তি ছিলেন। যখন তারা ইন্তেকাল করলেন তখন তাদের ক্বওমের লোকেরা তাদের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লো। তখন শয়তান তাদেরকে এ ভ্রান্ত পরামর্শ দিল যে, যে সকল স্থানে তারা বসতেন সেখানে তোমরা তাদের মূর্তি তৈরী করে তাদের নামে নাম করণ কর। তারা তাই করল। তবে শুরুতেই তারা এ মূর্তিগুলোর ইবাদত বা পূজা শুরু করেনি। যখন এ প্রজন্মের লোকেরা ইন্তেকাল করল এবং পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা মূর্তি তৈরীর প্রকৃত কারণ ও রহস্য ভুলে গেল তখন এ মূর্তিগুলোর ইবাদত করা শুরু করে দিল।[৭৬]

যখন আল্লাহ তা'আলা তার নবী নূহ্ আ. কে এসকল মূর্তির কারণে উদ্ভূত শিরক থেকে নিষেধ করলেন তখন তারা তার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করলো। আর ঐসকল ব্যক্তির মূর্তিগুলো যা মূর্তিপূজাতে রুপান্তরিত হয়ে ছিল তার ইবাদতে তারা অবিচল রইল।

আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা তার নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন,

{وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا}

তারা বলছে- তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। সূরা নূহঃ ২৩।

এটা ঐসকল লোকদের নাম যাদের স্মরণ ও সম্মানার্থে লোকেরা তাদের আকৃতি-অবয়বে এ সকল মূর্তি তৈরী করে ছিল। আপনি লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, এ সকল স্মৃতি স্তম্ভ ও প্রতিমাসমূহ যা কেবল তাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের স্মরণে ও তাদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তৈরী করা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাথে শিরক ও তদীয় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘোর বিরোধীতারই জন্ম দিয়েছে!

সঙ্গত কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মহা প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দেন এবং আল্লাহ্ ও তার বান্দাদের নিকটে এরা ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় হয়ে যায়। (ইবরাহীম আ. এর কওমের শিরক ছিল মূর্তি পূজা এবং দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান করা। বানী ইসরাঈল কওমের শিরক ছিল গোবৎসের পূজা করা।

৭৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৯২০।

যা সামেরী নামক এক ব্যক্তি স্বর্ণ থেকে তাদের জন্য তৈরী করেছিল। নাসারা বা খ্রিষ্টানদের শিরক হলো ক্রসের পূজা করা, যাকে তারা ঈসা আ. এর মূর্তি বা আকৃতি বলে ধারণা করে)।

এটা ছবি ও মূর্তি অংকনের ভয়াবহতার প্রমাণ বহন করে। এজন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফটোগ্রাফার ও চিত্র শিল্পীদেরকে অভিশাপ করতঃ সংবাদ দিয়েছেন যে, এরা ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। যে কোন ছবি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুছে ফেলার আদেশ দিয়ে বলেছেন, যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। এসব কিছুই উম্মাতের আক্বীদা (বিশ্বাস) ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চরম ক্ষতির দরুনই তিনি বর্ণনা করেছেন। কারণ, ছবি ও মূর্তি নির্মাণ ও অংকনের দরুনই পৃথিবীতে সর্ব প্রথম শিরক উদ্ভাবন হয়ে ছিল। এসকল মূর্তি ও ছবি বিভিন্ন মজলিস, ফাঁকা ময়দান এবং বাগান যেখানেই স্থাপন করা হোক তা সর্বাবস্থাতেই শরী'আতের পক্ষ থেকে হারাম (নিষিদ্ধ)। কেননা, এটা শিরক ও আক্বীদা্ ভ্রষ্টের প্রধান কারণ।

বর্তমান সময়ে কাফিররা এ সকল নিষিদ্ধ কাজ চর্চা করে চলেছে। কারণ, তাদের এমন কোন আক্বীদা (বিশ্বাস) নেই যা তারা সংরক্ষণ করে।

অপর দিকে মুসলমানদের সৌভাগ্য ও শক্তির উৎস নিজেদের আক্বীদা (বিশ্বাস) সংরক্ষণার্থে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করতঃ এ সকল নিষিদ্ধ কাজে তাদের শরীক হওয়া জায়িয নয়। একথা বলা ঠিক হবে না যে, বর্তমান সময়ের লোকেরা এ স্তর অতিক্রম করে তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করেছে। কারণ, শয়তান ভবিষ্যত প্রজন্মের অজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগের পানে চেয়ে আছে। যেমন, নূহ্ আ. এর ক্বওমের আলেমদের মৃত্যু ও অজ্ঞতা বৃদ্ধির ফলে তাদের মাঝে মূর্তি পূজা শুরু হয়। আর জীবিত ব্যক্তির বেলায়ও ফিৎনার বিষয়ে নির্ভয় হওয়া যায় না। যেমন ইবরাহীম আ. বলেছিলেন:

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ}

আর স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন ইবরাহীম আ. বলেছিলেন, হে আল্লাহ, তুমি এ শহরকে (মক্কাকে) নিরাপদ করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততীকে মূর্তিপূজা থেকে হিফাযত করো। ***সূরা ইবরাহীম ১৪:৩৫।***

ইবরাহীম আ. নিজের উপরে ফিতনার ভয় করে ছিলেন। সালাফগণের অন্যতম ইমাম ইবরাহীম নাখঈ রহি. বলেন: ইবরাহীম আ. এর পরে কে ফিতনা থেকে নিরাপদ হতে পারে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

في بيان حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته

দীন (ইসলাম) নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং তার সম্মানহানী করার বিধান

দীন (ইসলাম) নিয়ে কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে সে মুরতাদ হয় অর্থাৎ দীন থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে -আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: ٦٥، ٦٦]

আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার হুকুম আহকামের সাথে এবং তার রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে? ছলনা করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। *সূরা আত-তাওবা ৯:৬৫-৬৬।*

অত্র আয়াত প্রমাণ করে আল্লাহ্, তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার বিধি-বিধানের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কুফরী। যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটির সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে সে যেন সবগুলোর সাথেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলো। কিছু মুনাফিক্ব লোক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ছাহাবাগণকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে আল্লাহ্ উপরোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন।

দীনি এসকল বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে আবশ্যিকভাবে ঐ ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। অতএব, যারা আল্লাহর একত্বকে হালকা ভেবে তাকে ভিন্ন অন্য কোন মৃত ব্যক্তির নিকটে দু'আ করাকে মর্যাদাকর মনে করে সে কাফির। এমনিভাবে তাওহীদের পথে আহ্বান এবং শিরক থেকে নিষেধ করলে যে সকল লোক এটাকে হালকা চোখে দেখে তারা কুফরী করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا} [الفرقان: ٤١، ٤٢]

তারা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে। বলে- এই কি সেই লোক যাকে আল্লাহ্ রসূল করে প্রেরণ করেছেন? সে

তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে না থাকতাম। *সূরা আল্ ফুরক্বান ২৫:৪১-৪২।*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফিরদেরকে আল্লাহর সাথে শিরক করা হতে নিষেধ করেন তখন তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপে মেতে উঠে। মুশরিকদের অন্তরে শিরকের সম্মান থাকার দরুন যখনি নাবী-রসূলগণ (আলাইহিমুস্ সলাতু অস্ সালাম) তাদেরকে তাওহীদের পথে আহ্বান করেছেন তখনি তারা তাদেরকে (আলাইহিমুস্ সলাতু অস্ সালাম) দোষারোপ করতঃ নির্বোধ, পথ ভ্রষ্ট এবং পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে। মুশরিক ও তাদের দোসরদের এ নীতি আজও চালু আছে। অনুরূপ যাদের নিকটে শিরক রয়েছে তারাও তাওহীদ পন্থি দায়ীগণকে দেখলে তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} [البقرة: ١٦٥]

আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। *সূরা আল্ বাক্বারা ২:১৬৫।*

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসার মতো কোন মাখলুক্ব বা সৃষ্টিজীবকে ভালবাসলে সে মুশরিক। আল্লাহর রাস্তায় ভালবাসা এবং আল্লাহর সাথে ভালবাসার মাঝে পার্থক্য করা ফরয। (আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অনুরূপ ভালবাসা শিরক ও কুফরী, আল্লাহর রাস্তায় কাউকে ভালবাসা ঈমানের পরিচয়)।

বর্তমান যুগের যে সকল লোকেরা কবরকে মূর্তিতে রুপান্তরিত করেছে তারা আল্লাহর তাওহীদ (একত্ব) ও তার খালেস ইবাদকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদেরকে সম্মান করে। অনেকে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করতে দ্বিধা করে না! অপর দিকে তার পীর বা বুযুর্গের নামে মিথ্যা শপথ করতে সাহস পায় না!

অনেক তরীক্বতপন্থীরা মনে করে বিপদ মূহুর্তে রাতের শেষ ভাগে উঠে মসজিদে আল্লাহকে আহ্বান করার চেয়ে পীরের কবরের নিকটে গিয়ে বা অন্য স্থান হতে পীরসাহেবকে আহ্বান করা অধিক উপকারী!! যারা এদের তরীক্বা থেকে সরে তাওহীদের পথে আসে তাদেরকে নিয়ে এরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে।

এদের বেশীর ভাগ লোক আজ মসজিদ পরিত্যাগ করে খানকা ও মাযার নির্মাণে ব্যস্ত। মূলতঃ এরা শিরককে সম্মান এবং আল্লাহ, তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম ও তার বিধিবিধানকে হালকা চোখে দেখার জন্যই তারা এরূপটি করে থাকে?[৭৭] বর্তমান সময়ে মাযার ভক্তদের মাঝে এটা ব্যাপক হারে প্রচলিত রয়েছে।

ঠাট্টা বিদ্রূপ দুই প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রূপঃ এ প্রকার ঠাট্টাকারীদের ব্যাপারেই সূরাহ্ তাওবার ৬৫-৬৬ নং আয়াত নাযিল হয়েছে। তারা ছাহাবাগণ এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বলেছিলঃ আমরা আমাদের এই ক্বারী বা কুরআন পাঠকদের চেয়ে (ছাহাবাগণের চেয়ে) অধিক পেটুক, মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের ময়দানে এদের মত কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি। এতদ্ব্যতীত তাদের আরো কটুক্তিসমূহ।

যেমন অনেকে বলেঃ তোমাদের এ দীন (ছ্বহীহ তাওহীদি দীন) পঞ্চম দীন। অনেকে এও বলেঃ তোমাদের দীন হলো বেআইনী ও নির্জীব। অনেকে আবার সৎ কাজের আদেশ প্রদানকারী এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধকারীদেরকে দেখলে ঠাট্টার ছলে বলেঃ তোমাদের নিকটে দীনদার লোকেরা আসছে। ঠাট্টার ছলে অনেকে এমন অনেক কথা বলে থাকে যা গণনা করা খুবই কষ্ট সাধ্য! অথচ যাদের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ঠাট্টার আয়াত নাযিল হয়েছে তাদের উক্তির চেয়ে এদের উক্তি আরো মারাত্মক।

দ্বিতীয় প্রকারঃ পরোক্ষ বা অস্পষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রূপঃ এটা এক সমুদ্র যার কোন কুল-কিনারা নেই। যেমনঃ কুরআন তিলাওয়াত বা হাদীছ পাঠ এবং ভাল কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ হতে নিষেধের সময় চোখের ইশারা বা জিহ্বা বের করে বিদ্রূপ করা, ঠোঁট ভেংচানো এবং হাতের বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।

এরই আওতাভূক্ত হবে কতেকের উক্তিঃ বিংশ শতাব্দির জন্য ইসলাম প্রযোজ্য নয়। মধ্যযুগের জন্য ইসলাম ঠিক ছিল। ইসলামে ফিরে গেলে আমরা পশ্চাতে ফিরে যাবো। শাস্তি প্রয়োগ এবং দেশান্তরসহ অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামে চরম কঠোরতা, পাশবিকতা এবং বর্বরতা রয়েছে।

ইসলাম নারীকে তার যথাযথ অধিকার দেয়নি। কারণ ইসলামে ত্বলাক্ব (বিবাহ্ বিচ্ছেদ) এবং একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

---

৭৭ মাজমূউল ফতোওয়া ১৫/৪৮-৪৯।

অনেকে আবার বলেঃ ইসলামী আইনের মাধ্যমে বিচার কার্য পরিচালনার চেয়ে মানব রচিত মতবাদ দিয়ে বিচার কার্য সম্পাদন করা অধিক উত্তম। ঠাট্টা-বিদ্রূপের আওতায় পড়বে ঐসকল লোকদের কথা যারা তাওহীদের পথে আহ্বানকারী এবং কবর, মাযার ও খানকার বিরোধীতাকারীদেরকে বলেঃ আপনি সীমালঙ্ঘনকারী, মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চান, আপনি অহ্‌হাবী, এটা পঞ্চম মাযহাব এবং অনুরূপ আরো উক্তিসমূহ যার সবগুলোই দীন ইসলাম ও সত্যিকার মুসলিমদেরকে গালি দেওয়া এবং বিশুদ্ধ আক্বীদাহ্ নিয়ে কটাক্ষ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সৎ কাজের তৌফীক্বদাতা এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার ক্ষমতা অন্য কারো নেই।

এ কটাক্ষের আওতায় পড়বে যারা সুন্নাতের উপর আমলকারী কোন ব্যক্তিকে দেখে বিদ্রূপের ছলে বলেঃ চুলের মাঝে দীন নেই। এদ্বারা তারা দাড়ি লম্বা করাকে বিদ্রূপ করে। এ নির্লজ্জ উক্তির অনুরূপ যাবতীয় কথা-বার্তা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষের অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

الحكم بغير ما أنزل الله

আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করা

আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার ইবাদতের চাহিদা হলোঃ

আল্লাহর বিধানাবলীর অনুগত হয়ে তার শরী'আতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। কথা-কাজ, আক্বীদা (বিশ্বাস), ঝগড়া-বিবাদ, রক্তপণ, সম্পদ এবং যাবতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কারণ, আল্লাহ তা'আলাই হলেন মহান বিচারক এবং সকল বিধানও তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। অতএব বিচারকদের উপর ফরয হলো আল্লাহর বিধানুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করা। প্রজাদের উপরও ফরয হলো তারা আল্লাহর কিতাব এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধান মোতাবেক বিচার কার্যের ফায়ছালা চাইবেন।

নেতা ও বিচারকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: ٥٨]

আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। *সূরা আন্ নিসা ৪:৫৮।*

প্রজাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ٥٩]

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। *সূরা আন্ নিসা ৪: ৫৯।*

এরপর আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার ফায়ছালা করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান এক সাথে থাকতে পারে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার ফায়ছালা করে সে মুমিন থাকে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۞ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء: ٦٠ - ٦٥]

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো-যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল

করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কি হল! অতঃপর তারা আপনার কাছে আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা অবগত। অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন। অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে এবং তা হৃষ্টচিত্তে মেনে না নিবে। *সূরা আন্ নিসা ৪:৬০-৬৫।*

উপরোক্ত আয়াতগুলো আল্লাহ তা'আলা শপথ দ্বারা নিশ্চিত করে বলেছেন: যারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিচারক মানে না, তার বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে তা মেনে নেয় না তারা মুমিন নয়।

এমনিভাবে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানাবলী অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা (ফায়ছালা) করে না আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কাফির, যালিম এবং ফাসিক্ব বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤]

যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারাই কাফের। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৪৪।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥]

যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করেনা তারাই যালিম। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৪৫।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٧]

যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারাই ফাসিক্ব-পাপাচারী। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৪৭।*

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করা আবশ্যক। আলিমগণের মাঝে ইজতিহাদী তথা গবেষণামূলক বিষয়ের মতবিরোধপূর্ণ যাবতীয় স্থানে আল্লাহর বিধান ও রসূলের সুন্নাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। অতএব, বিশেষ কোন মাযহাব বা ইমামের মতকে গোঁড়ামী বশতঃ গ্রহণ করা যাবে না। বরং কুরআন ও হাদীছের দলীল সম্মত কথাকেই গ্রহণ করতে হবে।

শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে নয় (যেমন ইসলামী নামধারী কিছু দেশে দেখা যায়) বরং মামলা-মোকাদ্দমা এবং অধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর বিধানকেই মানতে হবে। কারণ ইসলাম পরিপূর্ণ যা খণ্ড খণ্ড করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [البقرة: ٢٠٨]

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। *সূরা আল-বাক্বারা ২:২০৮।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة: ٨٥]

তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূর্গতি ছাড়া তাদের আর কোন পথ নেই। ক্বিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। *সূরা আল-বাক্বারা ২:৮৫।*

বিভিন্ন মাযহাব ও আধুনিক সিলেবাস বা পাঠ্যক্রমের অনুসারীদের উপর ফরয হলো, তারা যেন স্বীয় ইমামগণের উক্তিসমূহকে কুরআন ও হাদীছের সামনে পেশ করে। যা এ দু'য়ের সাথে মিলবে তা গ্রহণ করবে এবং যা বিরোধী হবে গোঁড়ামী এবং পক্ষাবলম্বন ব্যতীত তা প্রত্যাখ্যান করবে। বিশেষতঃ আক্বীদা (বিশ্বাস) বিষয়ে। কারণ ইমামগণ এরই অসিয়ত করেছেন। এটাই সকল ইমামের মত-মাযহাব ও পথ-মানহায। তাই যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে সে তাদের অনুসারী

নয়। যদিও সে নিজেকে ইমামগণের দিকে সম্বন্ধিত করুক না কেন। আর এ ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: ٣١]

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তার শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। *সূরা আত-তাওবা ৯:৩১।*

উপরক্ত আয়াতটি কেবল খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নয়। বরং যারাই তাদের অনুরূপ কাজ করবে তারই এ আয়াতের আওতায় পড়বে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের বিরোধীতা করে, তাদের বিধান ব্যতিরেকে মানুষের মাঝে ফায়ছালা করবে অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করতঃ মানব রচিত বিধান দিয়ে ফায়ছালা করার খাহেশ রাখে সে ব্যক্তি তার ঘাড় থেকে ইসলাম ও ঈমানের রজ্জুকে নামিয়ে ফেলল। যদিও সে নিজেকে মুমিন বলে দাবী করে। কারণ, যারা এরূপ করতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিবাদ করতঃ তাদের ঈমানকে নাকচ করে বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً} [النساء ٦٠]

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। *সূরা আন্ নিসা ৬০।*

উপরক্ত আয়াতে "ইয়াযউমূনা" শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ্ তাদের ঈমানকে বাতিল বলে গণ্য করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে মিথ্যা দাবী করলে বলা হয় "ইয়াযউমূনা"। কেননা, সে তার দাবীকৃত বিষয়ের চাহিদার বিপরীত ও তা নষ্টকারী কাজ করে। (অর্থাৎ, এক রকম দাবী করে তার বিপরীত কাজ করলে তাকে বলা হয় "ইয়াযউমূনা")। এর প্রমাণ বহন করে আল্লাহর বাণী:

وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ

অথচ তাদেরকে নির্দেশ হয়েছে, তাকে অস্বীকার করতে। *সূরা আন্ নিসা ৬০।*

কারণ, ত্বগূতকে (আল্লাহ দ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করা তাওহীদের অন্যতম রুকন। যেমনটি সূরা আল বাক্বারা এর ২৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে। যদি এ রুকন কোন ব্যক্তির মাঝে না পাওয়া যায় তবে সে কোন ক্রমেই তাওহীদপন্থী হতে পারে না। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব হলো, ঈমানের মূল ভিত্তি যার দ্বারা সকল আমল বিশুদ্ধ হয়। আর আমল তাওহীদ ভিত্তিক না হলে উক্ত আমল গ্রহণীয় হবে না। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [البقرة: ٢٥٦]

এখন যারা গোমরাহকারী ত্বগূতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। *সূরা আল্ বাক্বারা ২৫৬।*

আর এটা এজন্য যে, ত্বগূতের নিকটে বিচারকার্য বা ফায়ছালা চাওয়ার অর্থই হলো তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।[৭৮]

যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফায়ছালা করে না তার ঈমান না থাকা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনা করা ঈমান, বিশ্বাস এবং আল্লাহর ইবাদত। এটাকে দীন হিসাবে গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। অতএব, আল্লাহর বিধানের প্রতি ঈমান না রেখে শুধু তা মানুষের জন্য অধিক উপযোগী ও নিরাপত্তার জন্য সর্বাধিক কার্যকর বলা ও সে অনুযায়ী বিচার ফায়ছালা করা জায়িয নয়।

অনেকে প্রথম বিষয়টিকে ভুলে গিয়ে দ্বিতীয় বিষয়টিকেই (অধিক উপযোগী ও নিরাপত্তা) বেশী গুরুত্ব দেয়। ইবাদতের বিশ্বাস ব্যতীত অধিক উপযোগী হওয়ার দরুন যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফায়ছালা করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তিরস্কার করেছেন। তিনি বলেন:

৭৮. ফতহুল মাজীদ ৪৬৭-৪৬৮ পৃষ্ঠা।

{وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ} [النور: ٤٨، ٤٩]

তাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রসূলের কাছে ছুটে আসে। *সূরা আন নূর ২৪:৪৮-৪৯।*

এ সকল লোকেরা নিজেদের প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছুকে গুরুত্ব দেয় না। কোন বিষয় তাদের মনের বিপরীত হলে তা তারা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে বিচার ফায়ছালা চাওয়ার মাধ্যমে তারা ইবাদতের উদ্দেশ্য করে না।

حكم من حكم بغير ما أنزل الله

মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার ফায়ছালাকারীর বিধান

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤]

যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৪৪।*

উপরোক্ত আয়াতে এ ঘোষণাই দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করা কুফরী। হাকিম বা বিচারকের অবস্থানুযায়ী কখনো এটা বড় কুফরী হতে পারে যা মানুষকে দীন ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আবার কখনো তা ছোট কুফরী হতে পারে যা মানুষকে দীন ইসলাম থেকে বের করে না। এটি নির্ভর করবে বিচারকের অবস্থার উপর। যদি কোন বিচারক বিশ্বাস করে যে,

(১) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়ছালা করা ফরয নয়,

(২) অথবা সে এ ব্যাপারে ইচ্ছাধীন,

(৩) অথবা আল্লাহর বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করে,

(৪) অথবা বিশ্বাস করে যে, মানব রচিত বিধান আল্লাহর বিধানের চেয়ে ভাল বা তার সমপর্যায়ের,

(৫) অথবা বিশ্বাস করে যে আল্লাহর বিধান বর্তমান সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয়,

(৬) অথবা মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার ফায়ছালা দ্বারা কাফির ও মুনাফিক্বদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায় তবে এটা বড় কুফরী যার দ্বারা মানুষ ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায়।

অপর দিকে যদি কোন বিচারক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়ছালা করা ফরয এবং বিচারাধীন মামলায় তার বিধান জেনেও নিজেকে শাস্তির যোগ্য স্বীকার করে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান দ্বারা বিচার কার্য পরিচালনা করে তবে এ বিচারক অবাধ্য, অপরাধী ও পাপী।

এবিচারক ছোট কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার দরুন এক প্রকার কাফির। কিন্তু এ কুফরী তাকে ইসলাম থেকে পূর্ণ বের করে দেয় না। আর নিজের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন বিচারক চলমান মামলায় আল্লাহর বিধান জানতে অপারগ হয়ে বিচার ফায়ছালা করতে গিয়ে ভুল করে বসেন তবে এ বিচারক ভুলকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদ বা প্রচেষ্টার দরুন ছাওয়াব পাবেন এবং তার ভুল মার্জনীয়।[৭৯]

এটা ব্যক্তিগত (ব্যক্তি বিশেষের) বিষয়ে বিচারের বিধান। কিন্তু জন সাধারণের ব্যাপক বিষয়ে বিচারের বিধান ভিন্ন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ রহি. বলেন:[৮০] যে বিচারক দীনদার হওয়া সত্ত্বেও না জেনে বিচারকার্য পরিচালনা করবে সে জাহান্নামে যাবে। যদি কোন বিচারক হক্ব জানার পরও তার বিপরীত ফায়ছালা দেয় তবে সেও জাহান্নামী।

যে বিচারক ইনসাফ ও জ্ঞান ব্যতীত বিচার ফায়ছালা করে সে জাহান্নামী হওয়ার অধিক হক্বদার। আর তা ব্যক্তি বিশেষের বিচারকার্য পরিচালনার বিধান।

কিন্তু যদি কোন বিচারক মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপক বিষয়ে বিচার করতে গিয়ে হক্বকে বাতিল এবং বাতিলকে হক্ব, সুন্নাতকে বিদ'আত এবং বিদ'আতকে সুন্নাত, ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল বলে সিদ্ধান্ত দেয়,

অথবা আল্লাহ ও রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশকৃত কাজে বাধা দেয় এবং আল্লাহ ও রসূলের নিষেধকৃত কাজের আদেশ জারি করে তবে এবিচারকের বিষয়টি আলাদা।

বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, রসূলগণের ইলাহ্, বিচার দিবসের মালিক, প্রথম ও শেষে একমাত্র প্রশংসার হক্বদার আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে ফায়ছালা করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}

বিধান তারই এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। *সূরা আল্ ক্বাসাস ২৮: ৮৮।*

---

৭৯. শারহু আক্বীদা আত-ত্বহাবিয়া ৩৬৩-৩৬৪ পৃষ্ঠা।
৮০. মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৫/৩৮৮।

অপর আয়াতে তিনি বলেন,

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [الفتح: ٢٨]

তিনিই তার রসূলকে হিদায়েত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট। সূরা আল্ ফাত্‌হ ৪৮:২৮।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ রহি. আরো বলেন: এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার ফায়ছালাকে ফরয বলে বিশ্বাস করে না সে কাফির। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের অনুসরণ ব্যতীত নিজের মতানুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার ফায়ছালা করাকে বৈধ ও ইনসাফ ভিত্তিক মনে করে সেও কাফির। কারণ, প্রত্যেক জাতিই আদ্‌ল ও ন্যায় বিচার ফায়ছালা করার আদেশ দেয়।

অনেক ধর্মের লোকদের নিকটে তাদের বিজ্ঞদের রচিত দেওয়া বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করাই আদ্‌ল বলে গণ্য। বরং নিজেকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্তকারী অনেক ব্যক্তিই আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে প্রচলিত বিধান দিয়ে বিচার ফায়ছালা করে। যেমন, প্রাক গ্রাম্য বেদুঈনরা তাদের দলপতিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করতো। আর ঐ সকল দলপতি ও নেতারা তাদের মাঝে গ্রহণীয় ছিল। তারা মনে করতো কুরআন হাদীছ বাদ দিয়ে আমাদের দলপতি বা নেতাদের মত অনুযায়ী বিচার ফায়ছালা করাই অধিক উপযোগী।

আর এটাই হলো কুফরী। অনেক লোকই ইসলাম মানা সত্ত্বেও নিজেদের অনুকরণীয় নেতাদের আদেশে প্রচলিত নিয়মে বিচার ফায়ছালা করে।

এসকল লোকেরা যদি মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার কার্য পরিচালনা করা হারাম জানা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধান না মানে বরং এর বিপরীত বিধান দ্বারা বিচার কার্য ও দেশ পরিচালনা করা হালাল (বৈধ) মনে করে তবে তারা কাফির)।[৮১]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম রহি. বলেন: যদি কোন বিচারক আল্লাহর বিধানকে সঠিক এবং নিজেকে অপরাধী জেনেও কোন সময় আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মনগড়া মতবাদ দিয়ে বিচার ফায়ছালা করে তবে সে কুফরে আসগার করবে। কিন্তু যারা ধারা অনুযায়ী আবশ্যকীয় নিয়ম নীতি তৈরী করে, তা নিশ্চিত বড় কুফরী।

---

৮১. মিনহাজুস্ সুন্নাহ্ আন্ নাবাবিয়্যাহ্।

আর যদি এসমস্ত লোকেরা বলে: শরী'আতের বিধানাবলী অধিক ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক এবং আমরা ভুল করেছি তথাপিও তারা বড় কুফরী করার দরুন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।[৮২]

শাইখ মুহাম্মাদ রহি. খণ্ডকালীন সাময়িক বিধান এবং ব্যাপক এমন বিধান যা অধিকংশ বা সকল সময়ে নিয়ম-নীতি হিসাবে মানা হবে তার মাঝে পার্থক্য করেছেন।

পরিশেষে তিনি এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, এ প্রকার কুফরী যে কোন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের করে দিবে। এটা একারণে যে, যে ব্যক্তি ইসলামী নিয়মকে এক দিকে সরিয়ে রেখে মানব রচিত বিধানকে তার স্থলে গ্রহণ করে তা প্রমাণ করে যে, উক্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, মানব রচিত বিধান শরী'আতের বিধান থেকে উত্তম ও অধিক উপযোগী। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা এমন কুফরী যা মানুষকে ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয় এবং ঐব্যক্তির তাওহীদ নষ্ট হয়ে যায়।

৮২. মাজমূ' ফাতাওয়া শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ১২/২৮০।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم

শরী'আত প্রণয়ন এবং হালাল-হারাম নির্ধারণের দাবী করা

বান্দা তার যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী, লেন দেন, আদান-প্রদান, তাদের মাঝের পারস্পরিক সম্পর্ক, নিজেদের মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দ-কলহ নিরসন, মামলা-মোকাদ্দামা ইত্যাদি বিষয়ের বিচার কার্যে যে নীতি বা বিধান অনুসরণ করে চলবে তা প্রণয়নের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব একমাত্র মহান রব্বুল আলামীনেরই। যিনি মানব জাতির পরিচালক এবং সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: ٥٤]

শুনে রেখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। *সূরা আল্ আ'রাফ ৭:৫৪।*

কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বান্দার উপযোগী বিষয়াদি জানেন, বিধায় তিনিই মানুষের জন্য উক্ত বিধান প্রণয়ন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার রুবুবিয়্যাহ্ বা প্রভূত্বের যোগ্যতা বলে বান্দার জন্য শরী'আত ও বিধান প্রণয়ন করেন। মানব গোষ্ঠী যেহেতু আল্লাহরই বান্দা তাই তাদের উক্ত বিধান ও শরী'আত মানা ফরয। এর যাবতীয় কল্যাণ বান্দাই ভোগ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ٥٩]

তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তার রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। *সূরা আন্ নিসা ৪:৫৯।*

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي} [الشورى: ١٠]

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফায়ছালা আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা। *সূরা আশ্ শুরা ৪২:১০।*

বান্দাহর জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে শরী'আত প্রবর্তক গ্রহণের বিষয়টিকে আল্লাহ নাকচ করে দিয়ে বলেন,

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: ٢١]

তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? *সূরা আশ্ শুরা* **২১।**

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর শরী'আত ব্যতীত অন্য কোন শরী'আত (বিধান) গ্রহণ করবে সে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করবে। আল্লাহ এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইবাদত শরী'আত সম্মত করেননি তা নবাবিস্কৃত বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই পথ ভ্রষ্টতা।

এ প্রসঙ্গে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ (صحيح البخاري:٢٦٩٧)

যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু সংযোজন করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য।[৮৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (صحيح مسلم:١٧١٨)

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের দীনের মাঝে নেই তার ঐকাজ প্রত্যাখ্যাত।[৮৪]

রাজনৈতিক পর্যায় ও মানুষের মাঝে ফায়ছালার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা শরী'আত সম্মত করেননি তাহাই ত্বগূত (আল্লাহ দ্রোহী বিধান) ও জাহিলিয়াত (অজ্ঞতা) যুগের বিধান।

---

৮৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৯৭, আবূ দাউদ হা/৪৬০৬।
৮৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}

তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফায়ছালা কামনা করে? আল্লাহ্ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফায়ছালাকারী কে? সূরা আল্ মায়িদা ৫:৫০।

অনুরূপ হালাল-হারাম করারও একমাত্র মালিক হলেন মহান রব্বুল আলামীন। এক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক হওয়া কারও জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: ١٢١]

যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গুনাহ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে-যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। *সূরা আল্ আন আ'ম* **১২১।**

আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল করার ক্ষেত্রে শয়তান ও তার দোসরদের আনুগত্য করাকে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে শিরক করা বলে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে হারাম এবং হারামকৃত বস্তুকে হালাল করার ক্ষেত্রে যে সকল লোক উলামা এবং নেতাদের আনুগত্য করবে তারা যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকেই মাবূদ হিসাবে গ্রহণ করলো। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } [التوبة: ٣١]

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তার শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। *সূরা আত-তাওবা* **৩১।**

হাদীছে এসেছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত আয়াতটি (সদ্য খ্রিষ্টান হতে ইসলাম গ্রহণকারী ছাহাবী) আদী ইবনে হাতিম রহি. এর নিকটে পাঠ করলে তিনি বললেন: হে আল্লাহর রসূল, আমরা তো তাদের ইবাদত বা পূজা

করতাম না। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এমনটি কি হয়নি যে, আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে তারা তোমাদের জন্য হালাল বলে ফতোওয়া দিলে তোমরা তা মেনে নিতে এবং আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে তারা হারাম বলে সিদ্ধান্ত দিলে তোমরা তা সাদরে গ্রহণ করতে? তিনি বললেন: হাঁ, তা আমরা করতাম। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এটাই হলো তাদের ইবাদত করা।[৮৫]

হালাল-হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে উলামা ও নেতাদের আনুগত্য করলে নেতাদের ইবাদত এবং আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়। আর এ হলো বড় শিরক যা কালিমায়ে তাওহীদ শাহাদাতু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর চাহিদার পরিপন্থী।[৮৬]

কালিমায়ে তাওহীদের অন্যতম চাহিদা হলো, হালাল-হারাম করার একচ্ছত্র অধিপতি হলেন মহান রব্বুল আলামীন। এই যদি হয় ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে, জেনে শুনে হালাল-হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে এসকল আলিম-উলামা ও আবেদদের আনুগত্য করে। অথচ তারা সঠিক ইলম ও ধর্মের অধিক নিকটবর্তী। ইজতিহাদী বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারার কারণে তারা ভুলও করতে পারেন। তবে ভুল হলেও তারা ছাওয়াব পাবেন।

তাহলে যারা কাফির ও নাস্তিকদের রচিত বিধানের অনুসরণ করে তাদের অবস্থা কি হতে পারে? এই মানব রচিত বিধানগুলোকেই নামধারী কিছু মুসলিম ইসলামী দেশসমূহে আমদানী করে সে অনুযায়ী মানুষদের মাঝে ফায়ছালা করছে? ফা লা-হাওলা অলা-কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি!! (আল্লাহ্ ব্যতীত ভাল কাজে তৌফীক্ব দাতা এবং অসৎ কাজ হতে বাধা দানকারী কেই নেই)।

অবশ্যই এসকল লোক আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে নিজেদের রব্ব বা মাবূদ হিসাবে গ্রহণ করেছে। কাফিররাই এরূপ নামধারী মুসলিমদের জন্য বিধান তৈরী করে, হারামকে হালাল করে এবং সে অনুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়ছালা করে।

---

৮৫. হাসান: তিরমিযী ৩০৯৫, সুনানে বায়হাক্বী আল্ কুবরা ২০৩৫০-৫১।
৮৬. ফতহুল মাজীদ ১০৭ পৃষ্ঠা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية

নাস্তিক্যবাদী ও জাহিলী দলের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার বিধান

১। নাস্তিক্যবাদঃ যেমন কম্যুনিজম-সমাজতন্ত্র, সেকুলারিজম-ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদসহ অন্যান্য নাস্তিক্যবাদী কুফরী মতবাদের সাথে কোন ব্যক্তি নিজেকে সম্পৃক্ত করলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যায়। এ সকল দলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করলেও সে বড় মুনাফিক্ব। কারণ, মুনাফিক্বরা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করলেও আভ্যান্তরীণভাবে তারা কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة: ١٤]

আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। সূরা আল্ বাক্বারা ১৪। অপর আয়াতে তিনি বলেন,

{الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]

এরা এমনি মুনাফেক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওঁৎপেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না। *সূরা আন্ নিসা ৪:১৪১।*

অতএব, এ সকল ধোকাবাজ মুনাফিক্বরা প্রত্যেকে দ্বি-মূখী নীতি অবলম্বন করে। এক নীতিতে মুমিনদের সাথে মিলিত হয় আর অপর নীতিতে তারা তাদের নাস্তিক দোসরদের নিকটে ফিরে যায়। এদের রয়েছে দু'টি জিহ্বা। একটি দিয়ে বাহ্যিকভাবে সে মুসলমানদেরকে গ্রহণ করে, অপরটির দ্বারা তারা তাদের গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে। ঠিক যেমনটি আল্লাহর নিম্ন বাণীতে বর্ণিত:

{وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة: ١٤]

আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা মুসলমানদের সাথে উপহাস করি মাত্র। *সূরা আল্ বাক্বারা ২:১৪।*

এরা সব সময় কুরআন সুন্নাহ থেকে দূরে থাকে। কুরআন সুন্নাহর অনুসারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও তাদেরকে হীন চোখে দেখে। সামান্য দুনিয়াবী জ্ঞানের অহংকারে তারা কুরআন-সুন্নাহর বিধান পালন করতে অস্বীকার করে। তাদের এ দুনিয়াবী তুচ্ছ বিদ্যা তাদেরকে কেবল মন্দের দিকে ধাবিত করে। তাইতো তারা সর্বদা কুরআন সুন্নাহর অনুসারীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [البقرة:١٥]

বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। সূরা আল্ বাক্বারা ২:১৫।

আল্লাহ্ মুমিনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } [التوبة: ١١٩]

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। *সূরা আত তাওবা ৯:১১৯।*

নাস্তিক্যবাদী দলগুলো ধ্বংসাত্বক ও চরম ক্ষতিকর, কারণ তা মিথ্যা বা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতঃ আসমানী দীনসমূহের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে তা উৎখাতের জন্য চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি আক্বীদা বা বিশ্বাসহীন জীবন যাপনে সন্তুষ্ট এবং জ্ঞান দ্বারা সু-প্রমাণিত মৌলিক সত্য ও নিশ্চিত বিষয়সমূহকে অস্বীকার করে সে স্বীয় জ্ঞানকে অকেজো করে নিজেকে পাগলে পরিণত করে।

আর সেক্যুলারিজম বা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ সকল দীন বা ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বস্তুবাদের উপর (অর্থের উপর) নিজেদের ভিত গড়তে চায় যার কোন দিক নির্দেশনাকারী থাকে না। দুনিয়াতে জানোয়ারের মতো জীবন যাপন ছাড়া এদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

অন্যদিকে পূঁজিবাদের চিন্তাধারা হলো হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধের তোয়াক্কা না করে যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করা। দরিদ্র ও ফকীর-মিসকীনদের প্রতি তাদের কোন দয়া-মায়া নেই। এদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হলো আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী সুদ। এতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি দারিদ্র জনগোষ্ঠীর রক্ত পর্যন্ত চুষে নেয়।

ঈমানদার তো দূরের কথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই কি জ্ঞান, দীন-ধর্ম, জীবনের সঠিক কোন উদ্দেশ্য ও অগ্রগতি ছাড়া এ সকল মতবাদের উপর জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? আর তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে পারে?

সঠিক দীনের অনুপস্থিতি, নষ্ট ঈমান-আক্বীদা এবং বিধর্মীদের অনুচর-অনুগত হয়ে জীবন যাপনের সুযোগে এ সকল ভ্রান্ত মতবাদ ইসলামী দেশসমূহে প্রবেশ করেছে।

২। জাহিলী যুগের কোন মতবাদ, গণতন্ত্র, বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার দিকে সম্পৃক্ত হওয়া আরেক প্রকার কুফরী ও ইসলাম ত্যাগকারী বিষয়। কারণ ইসলাম সকল প্রকার জাতীয়তাবাদ এবং জাহিলী মতবাদ ও প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: ١٣]

হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। *সূরা আল্ হুজুরাত ১৩।*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ (سنن أبي داود: ٥١٢١)

যে ব্যক্তি আসাবিয়্যাহর প্রতি আহ্বান জানায়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে আসাবিয়্যাহর জন্য যুদ্ধ করে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যে আসাবিয়্যাহ[৮৭] এর জন্য মারা যায় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৮৮]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়াত যুগের অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং পিতৃ মহলকে নিয়ে অহংকার করাকে দূরীভূত করেছেন। এখন মানুষ হতে পারে পরহেযগার মুমিন অথবা দূর্ভাগা পাপিষ্ট ব্যক্তি। মানুষ হলো আদম আ. এর সন্তান। আর আদম আ. মাটির তৈরী।[৮৯]

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ----- إِلَّا بِالتَّقْوَى

আর তাক্বওয়া ব্যতীত কোন অনারবের উপর আরবীর কোন মর্যাদা নেই। (আরব-অনারবের মাঝে মর্যাদার মানদন্ড হলো "তাক্বওয়া")।[৯০]

এইসব জাহিলী দলাদলী মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন এক জাতিতে পরিণত করেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং সৎ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগীতা করতে বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন ও মতভেদ করতে নিষেধ করে ইরশাদ করেন:

---

৮৭. গোত্র, বর্ণ, দেশ, আঞ্চলিকতা, জাতীয়তা ইত্যাদি কেন্দ্রিক সংকীর্ণতাকে আসাবিয়্যাহ বলা হয়

৮৮. যঈফঃ সুনানে আবূ দাউদ হা/৫১২১, ৫১২৩। তবে অর্থের দিক থেকে ছ্বহীহ। দেখুনঃ ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৮, ছ্বহীহঃ ইবনে মাজাহ হা/৩৯৪৮, নাসাঈ ফিল কুবরা হা/৩৫৬৬।

৮৯. হাসানঃ তিরমিযী হা/৩৯৫৬।

৯০. ছ্বহীহঃ মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৪৮৯।

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران: ١٠٣]

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমুহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। *সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩।*

আল্লাহ তা'আলা চান আমরা যেন একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর নাজাত প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হই। পরিতাপের বিষয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ মুসলিম দেশগুলোর উপর আগ্রাসন করার পর মুসলিম উম্মাহ্ এ সকল রক্তক্ষয়ী উগ্রবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং স্বদেশ প্রীতির নিকটে বশ্যতা স্বীকার করেছে।

সাথে এসকল বিষয়গুলোকে মুসলমানগণ ইলমী, প্রকৃত ও বাস্তব এমন বিষয় বলে মেনে নিয়েছে যেন তা থেকে বাঁচার কোন বিকল্প পথ নেই। আশ্চর্য জনক হলেও সত্য, যে জাতীয়তাবাদ ও উগ্রবাদকে ইসলাম মিটিয়ে দিয়েছিল, আজ তা সঞ্জিবিত করার জন্য মুসলমানগণ দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। তারা জাতীয়তাবাদ ও উগ্রবাদকেই যথেষ্ট মনে করে এবং এর নিদর্শনসমূহকে পুনর্জীবিত ও ইসলামের উপর এর আগ্রাসনের সময়কালকে নিয়ে গর্ব করে। এ ধারার নামধারী মুসলমানরাই আজ ইসলামকে জাহিলিয়াত বলে নাম করণের জন্য চাপ প্রয়োগ করে।

অথচ আল্লাহ তা'আলা এ জাহিলিয়াত থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে উৎসাহিত করেছেন।

মুমিনের উচিত অতীত জাহিলিয়াতের উল্লেখ না করা। যদি উল্লেখ করতেই হয় তবে ঘৃণা-অসন্তুষ্টি, অপছন্দ, গাত্রদাহ্ ও গা শিহরণসহ উল্লেখ করবে। আটকাবস্থায় কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত ও নির্যাতিত কয়েদী বা বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলে গাত্রদাহ্ ও শিহরণ ব্যতীত কি সে তার শাস্তির কথা উল্লেখ করতে পারে? কঠিন

ও দীর্ঘ মৃত্যুরোগ হতে মুক্তি লাভকারী ব্যক্তি কি তার অসুস্থতার দিনগুলো স্মরণ করতে গিয়ে হতবিহ্বল ও অবস্থা পরিবর্তন না হয়ে পারে?

এটা জানা আবশ্যক যে, এ সকল দলাদলী ও মতবাদ এমন আযাব-শাস্তি যা আল্লাহ তা'আলা তার শরী'আত হতে বিমূখ ও বে-দীন ব্যক্তিদের প্রতি প্রেরণ করেছেন। যেমন -আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} [الأنعام: ٦٥]

আপনি বলুনঃ তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিবেন এবং এককে অন্যের উপর আক্রমনের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি যাতে তারা বুঝে নেয়। *সূরা আল্ আনআ'ম ৬:৬৫।*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

﴿وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾

ইমাম ও বিচারকরা যখন আল্লাহর কিতাব কুরআন অনুযায়ী ফায়ছালা না করে এবং আল্লাহর বিধানকে প্রাধান্য না দেয় তখন তিনি তাদের পরস্পরের মাঝেই ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে দেন।[৯১]

নিশ্চয় কোন দলের জন্য উগ্রতা ও গোঁড়ামী পোষণ করা অন্যের নিকট হতে সত্য গ্রহণে বাধা দেয়। যেমন ইয়াহূদীদের অবস্থা যাদের ক্ষেত্রে-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা পাঠিয়েছেন তা মেনে নাও, তখন তারা বলে, আমরা মানি যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ণ করে ঐ গ্রন্থের যা তাদের

---

৯১. হাসানঃ সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০১৯।

কাছে রয়েছে। বলে দিন, তবে তোমরা ইতিপূর্বে পয়গম্বরদের হত্যা করতে কেন যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে? সূরা আল্ বাক্বারা ২:৯১।

অনুরূপ জাহিলিয়াত যুগের লোকেরাও নিজেদের দাপ-দাদার মতের প্রতি গোঁড়ামী বশতঃ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকটে যে সত্য নিয়ে এসেছিলেন তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [البقرة: ١٧٠]

আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদি ও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। *সূরা আল্ বাক্বারা ২:১৭০।*

এ সব দলের অনুসারীরা নিজ নিজ দল ও দলের আদর্শকে ইসলামের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ ইসলাম বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

নবম পরিচ্ছেদ

النظرية المادية للحياة ومفاسد هذه النظرية

জীবন পরিচালনায় বস্তুবাদী চিন্তা-ধারা ও তার ক্ষতিকর দিকসমূহ

জীবন পরিচালনার দু'টি দর্শন রয়েছে। একটা হলো বস্তুবাদী দর্শন। অপরটি হলো সঠিক (ইসলামী) দৃষ্টিভঙ্গি। আর প্রত্যেকটি দর্শনের আলাদা প্রভাব রয়েছে।

ক। বস্তুবাদী জীবনদর্শনের অর্থ হলো:

কেবলমাত্র দুনিয়াবী চাহিদা, আনন্দ মিটানোতে মানুষের চিন্তা-ধারা সীমাবদ্ধ হওয়া এবং শুধু এজন্য তার কর্মকান্ড সীমিত থাকা। ফলে এর শেষ পরিণতি সম্পর্কে তার কোন চিন্তাও হয় না এবং সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে তার জন্য সে কোন কাজও করে না। সে একথাও জানে না যে, আল্লাহ দুনিয়াবী জীবনকে পরকালের জন্য ক্ষেত্রভূমি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ দুনিয়াকে করেছেন কর্মস্থান এবং আখিরাত বা পরকালকে করেছেন প্রতিফল প্রাপ্তির স্থান।

অতএব, যে ব্যক্তি তার দুনিয়াবী জীবনকে ভাল কাজে ব্যয় করবে সে উভয় জগতে লাভবান হবে। আর যে ব্যক্তি তার দুনিয়াবী জীবনকে নষ্ট করবে তথা কুরআন-হাদীছ বহির্ভূত পথে চলবে সে তার পরকালকে নষ্ট করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١]

সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। সূরা আল্ হাজ্জ ২২:১১।

অতএব আল্লাহ তা'আলা অনর্থক এ দুনিয়া সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি মহৎ এক হিকমতের জন্য (বিশেষ উদ্দেশ্য) দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? সূরা আল্ মুল্ক ২।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الكهف: ٧]

আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। *সূরা আল্ কাহ্ফ ৭।*

এ দুনিয়াতে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ সামগ্রী, সন্তান-সন্ততী, সহায় সম্পদ, মরিচিকা সদৃশ চাক্যচিক্যময়, সম্মান-মর্যাদা ও নেতৃত্ব এবং আরো আনন্দ দানকারী কত জিনিস যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার বাহ্যিক বিষয়ে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রেখে তার ফিৎনায় পতিত হয়ে এর দ্বারা আনন্দ উপভোগ করা শুরু করেছে। কিন্তু এ দুনিয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে কোন চিন্তাও করে না।

তাই এ প্রকার লোকেরা পরকাল বাদ দিয়ে দুনিয়া তথা অর্থ-সম্পদ উপার্জন এবং তা দ্বারা আনন্দ উপভোগে মত্ত রয়েছে। বরং অনেক সময় তারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনকেই অস্বীকার করে। এদের ব্যাপারেই - আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} [الأنعام: ٢٩]

তারা বলে: আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। *সূরা আল্ আনআ'ম ২৯।*

দুনিয়ার বিষয়ে যাদের এরূপ চিন্তাধারা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত ওয়াদা দিয়ে বলেন:

{إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [يونس: ٧، ٨]

অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে বেখবর। এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল। *সূরা ইউনুস ৭-৮।*

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: ١٥، ١٦]

যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। *সূরা হুদ ১৫-১৬।*

উল্লিখিত চিন্তা-ধারায় বিশ্বাসী সবাইকেই এ শাস্তি দেওয়া হবে। আর তারাও এ শাস্তির সম্মুখীন হবে যারা পরকালীন নেক কাজ করে, কিন্তু তা দ্বারা দুনিয়া অর্জন করতে চায়, আর মুনাফিক্ব এবং লোক দেখানো নেক আমলকারীরা,

অপর দিকে পুনরুত্থান ও হিসাব দিবসে অবিশ্বাসী কাফিররা তো এ শাস্তি পাবেই। যেমন: জাহিলিয়াত বা অজ্ঞতা যুগের লোকদের অবস্থা।

সর্বনাশী মতবাদসমূহে যেমন: পুঁজিবাদ, কম্যুনিজম এবং নাস্তিক্যবাদী সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিশ্বাসীরাও আল্লাহর ওয়াদাকৃত শাস্তি পাবে। তারা জীবনের কোন মর্যাদাই বুঝেনি। দুনিয়াবী ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি সামনে অগ্রসর হয়নি। বরং এরা চতুস্পদ জন্তু থেকেও অধিক পথভ্রষ্ট। কারণ এ সকল লোকেরা তাদের জ্ঞানকে অকেজো করতঃ নিজেদের শক্তিকে রহিত করে দিয়েছে। তারা সময়কে এমন অনর্থক কাজে নষ্ট করেছে যাতে তাদের জন্য কোন কিছু অবশিষ্ট থাকেনি। তারা ভাল কাজ করে নিজেরা স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেনি এবং পরকালের জন্য তারা কোন আমলই করেনি।

চতুস্পদ জন্তুর জন্য অপেক্ষমাণ কোন প্রত্যাবর্তন স্থান (পরকাল) নেই। পশুর কোন জ্ঞান নেই যা দ্বারা সে চিন্তা করবে। অথচ পূর্বোক্ত মানুষদের বিষয়টি চতুস্পদ জন্তু থেকে ভিন্ন। কারণ, তাদের জন্য অপেক্ষমাণ প্রত্যাবর্তন স্থান (পরকালীন জীবন) রয়েছে এবং তাদের চিন্তা-ভাবনার জন্য জ্ঞানও দেওয়া হয়েছে।

এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} [الفرقان: ٤٤]

আপনি কি মনে করেন যে তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা আরো পথভ্রান্ত। *সূরা আল্ ফুরক্বান ২৫:৪৪।*

কেবল মাত্র দুনিয়াবী চিন্তা-ধারার লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা অজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করে বলেন:

{وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} [الروم: ٦، ٧]

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না। *সূরা আর্ রূম ৩০:৬-৭।*

এ সকল লোকেরা আধুনিক আবিষ্কার ও কারিগরি শিল্পে দক্ষতার পরিচয় দিলেও মূলতঃ তারা অজ্ঞ। জ্ঞানী বলে পরিচিতির যোগ্যতা তারা রাখে না। কারণ তাদের জ্ঞান দুনিয়ার বাহ্যিক বিষয়াবলীকে অতিক্রম করতে পারেনি। আর এটা নিশ্চিত অপূর্ণ জ্ঞান। এরূপ জ্ঞানের লোকেরা জ্ঞানীর মতো মর্যাদাপূর্ণ শব্দের যোগ্য নয়। তাই এদেরকে জ্ঞানী বলা যাবে না। বরং জ্ঞানী শব্দটির যোগ্য হলেন তারাই যারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তাকে ভয় করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}

আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে। *সূরা ফাতির ৩৫:২৮।*

পৃথিবীতে বস্তুবাদী চিন্তা-ধারার আরো দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ কারুনের কথা উল্লেখ করেছেন। যাকে তিনি অঢেল সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [القصص: ٧٩]

অতঃপর কারুন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়! কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান। *সূরা আল্ ক্বাসাস ২৮:৭৯।*

যাদের দুনিয়া অর্জনের প্রবল আকাংখা ছিল, তারাই কারুণের মত অর্থ সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করেছিল। মূলতঃ অর্থনৈতিক চিন্তা ধারার বশীভূত হয়ে তারা এরূপ আশা করেছিল।

যেমন, কাফির রাষ্ট্রসমুহের অর্থনৈতিক ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও উন্নতির বর্তমান অবস্থা। আর দুর্বল ঈমানের মুসলমানেরা কি-না তাদের দিকে বিস্ময় ও আত্মতুষ্টির দৃষ্টিতে তাকায়!

অথচ তারা একবার খেয়াল করে না যে, ওরা কাফির এবং তাদের জন্য ভয়ানক জঘন্য পরকাল অপেক্ষা করছে। এ ভুল দৃষ্টি-ভঙ্গির কারণে তারা নিজেদের অন্তরে কাফিরদেরকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে। ফলে এরা তাদের কু-চরিত্র এবং ঘৃণিত কৃষ্টি কাল্চারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

অথচ এরা (দুর্বল মুসলমানেরা) প্রচেষ্টা, শক্তি অর্জন, আধুনিক আবিস্কার ও শিল্প-কারিগরীতে কাফিরদের অনুসরণ করে না। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: ٦٠]

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ভয় দেখাবে। *সূরা আল্ আন্ফাল ৮:৬০।*

খ। জীবনের দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি: এটা বিশুদ্ধ ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

বিশুদ্ধ ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো- মানুষ এ দুনিয়ার সম্পদ, নেতৃত্ব এবং অর্থনৈতিক শক্তিকে এমন মাধ্যম মনে করবে যা দ্বারা পরকালের কাজে সহযোগীতা নেওয়া হবে। অতএব প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং দুনিয়া নিন্দনীয় নয়। তবে এই দুনিয়াতে বান্দার ভাল-মন্দ কর্মের দরুণ তার প্রশংসা ও নিন্দা করা হবে।

দুনিয়া হলো পরকালে মুক্তি বা নাজাতের সেতু ও পুল। দুনিয়াতে রয়েছে পরকালের পাথেয়। পরকালে জান্নাতীরা যে সুখময় জীবন লাভ করবেন তা দুনিয়াতে তাদের সৎ কর্মের কারণেই। তাই দুনিয়া হলো জিহাদ, ছ্বলাত, সিয়াম, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় এবং কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগীতার ঘর।

পরকালে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে বলবেন:

{كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} [الحاقة: ٢٤]

বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, (অর্থাৎ দুনিয়াতে) তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে।[৯২]

৯২. সূরা আল্ হাক্বক্বাহ্ ৬৯:২৪।

দশম পরিচ্ছেদ

في الرقى والتمائم

ঝাড়-ফুঁক এবং তাবিজ-কবচ সম্পর্কে

ক। ঝাড়-ফুঁক: **اَلرُّقَى** শব্দের অর্থ ঝাড়-ফুঁক। আর্‌রুক্বা শব্দটি **رُقية** রুক্বিয়্যাতুন শব্দের বহুবচন।

রুক্বিয়্যাহ্ হলো: এমন সব রক্ষাকবচ যা দ্বারা রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা হয়। যেমন: জ্বর, মৃগী রোগসহ অন্যান্য ব্যাধি ও বালা-মুসিবত। একে মানুষেরা আযায়িম বা দৃঢ় ইচ্ছা ও সঙ্কল্প বলে নাম করণ করেছে। এটা দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার: শিরকমুক্ত ঝাড়-ফুঁক।

যেমন: রোগীর উপর কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করা অথবা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহর নিকটে রোগ মুক্তি চাওয়া। এ প্রকার ঝাড়-ফুঁক জায়েয। কারণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ঝাড়-ফুঁক করেছেন, এর আদেশ দিয়েছেন এবং একে জায়েয বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আওফ ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»

জাহিলিয়াত যুগে আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমাদের ঝাড়-ফুঁকগুলো আমার সামনে পেশ করো। যে ঝাড়-ফুঁকে শিরক নেই তা করতে কোন অসুবিধা নেই।[৯৩]

---

৯৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২০০, ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৩৮৮৬।

ইমাম সুয়ূত্বী রহি বলেন: তিনটি শর্তের ভিত্তিতে ঝাড়-ফুঁক জায়িয বলে উলামাগণ রহি. ঐকমত্য পোষণ করেছেন। শর্তগুলো হলো:

ক। ঝাড়-ফুঁক যেন আল্লাহর বাণী অথবা তার নাম ও গুণাবলী দ্বারা হয়।

খ। আরবী ভাষায় এবং এমন শব্দে হতে হবে যার অর্থ বুঝা যায় এবং

গ। এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব কোন প্রভাব নেই। বরং আরোগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।[৯৪]

ঝাড়-ফুঁকের পদ্ধতি:

কুরআনের আয়াত অথবা দু'আ পড়ে রোগীকে ফুঁক দিতে হবে। অথবা দু'আ পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রোগীকে পান করানো। যেমন, সাবিত ইবনে ক্বাইস এর হাদীছে এসেছে:

ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ (سنن أبي داود:٣٨٨٥)

অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুত্বহান নামক স্থানের কিছু মাটি নিয়ে একটা পাত্রে রেখে তাতে পানি মিশিয়ে ফুঁক দিলেন এবং তা সাবিত এর শরীরের উপর ঢেলে দিলেন।[৯৫]

দ্বিতীয় প্রকার ঝাড়-ফুঁক: শিরকযুক্ত ঝাড়ফুঁক। এ প্রকার ঝাড়-ফুঁকে গাইরুল্লাহর (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের) সহযোগীতা নেওয়া হয়। গাইরুল্লাহর নিকটে প্রার্থনা, ফরিয়াদ ও আশ্রয় চাওয়া হয়। যেমন: জ্বিন, ফেরেশতা, নাবীগণ আলাইহিমুস্ সলাতু অস্সালাম এবং সৎ ব্যক্তিগণের নাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা। উল্লিখিত বিষয়গুলোতে গাইরুল্লাহকে আহ্বান করা হয় বিধায় তা শিরকে আকবার বা বড় শিরক। দ্বিতীয় প্রকার ঝাড়-ফুঁক অনেক সময় অনারবী ভাষা অথবা এমন শব্দাবলী দ্বারা করা হয় যার অর্থ বুঝা যায় না। এ প্রকার ঝাড়-ফুঁকে অজান্তে শিরক বা কুফরী প্রবেশের ভয় রয়েছে বিধায় তা নিষিদ্ধ।

---

৯৪. ফতহুল মাজীদ ১৩৫ পৃষ্ঠা।

৯৫. যঈফ: আবূ দাউদ হা/৩৮৮৫।

খ। التمائم বা তাবিজ-কবচ: তামায়িম শব্দের অর্থ তাবিজ-কবচ। এটি **تميمة** তামীমাতুন শব্দের বহুবচন। এটা এমন জিনিস যা বদ নযর থেকে বাঁচার জন্য শিশুদের গলায় ঝুলানো হয়। কখনো তা বয়স্ক পুরুষ এবং নারীর গলায় লটকানো হয়। এটা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার তাবিজ-কবচ:

যা কুরআন দ্বারা করা হয়। এর পদ্ধতি হলো: একটি কাগজে কুরআনের কোন আয়াত বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী লিখে রোগ মুক্তির আশায় গলায় ঝুলানো হয়। এ প্রকার তাবিজের ক্ষেত্রে আলিমগণ দু'টি মত পোষণ করেছেন।

প্রথম মত: এ প্রকার তাবিজ ঝুলানো জায়েয। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর্ ইবনে আস্ রা. এ মত পোষণ করেছেন। আয়িশা রা. থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার বাহ্যিকভাবও এ মতের পক্ষেই। আবূ জাফর আল্ বাক্বির এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহি. তার এক বর্ণনায় এমনই মত দিয়েছেন। আর যে সকল হাদীছে তাবিজ কবচ ব্যবহারে নিষেধ করা হয়েছে তা শিরক সম্বলিত বলে তারা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাদের নিকটে শিরক সম্বলিত তাবিজ ব্যবহার করা জায়েয নয়। যে তাবিজে শিরক নেই তা ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই এই হলো তাদের সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় মত: তাবিজ-কবচ ব্যবহার করা নাজায়েয। এ সিদ্ধান্ত হলো: আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস, হুযাইফাহ, উক্ববাহ্ ইবনে আমির, ইবনে উক্বাইম রা., তাবিঈগণের রহি. একটি দল তাদের মধ্যে রয়েছেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রা. সহচরবৃন্দ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহি. তার এক বর্ণনা মতে, (তার অনেক অনুসারী এ মতকে পছন্দ করেছেন) এবং পরবর্তী উলামাগণের। তারা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ (مسند أحمد:٣٦١٥)

ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ এবং যাদু-টোনা ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক।[৯৬]

---

৯৬. ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৩৫৩০, আবূ দাউদ হা/৩৮৮৩, মুসনাদে আহমাদ হা/৩৬১৫।

তিওয়ালাহ (التولة): এটা এমন কিছু যাদু-মন্ত্র বা তাবিজ-কবচ যা স্বামীর হৃদয়ে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর হৃদয়ে স্বামীর ভালবাসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরী ও ব্যবহার করা হয়।

তিনটি কারণে দ্বিতীয় মতটি সঠিক ও বিশুদ্ধ:

১। তাবিজ-কবচ নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীছটি ব্যাপক।_আর এ ব্যাপকতাকে খাস করে এর বিপরীতে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি।

২। অবৈধ তাবিজ-কবচ চালু হওয়ার পথ বন্ধ করতে দ্বিতীয় মতটি বড় সহায়ক।

৩। কুরআন দ্বারা তাবিজ-কবচ করা হলে যে ব্যক্তি তা ঝুলায় সে পেশাব-পায়খানাসহ অন্যান্য নাপাক স্থানে তা বহন করার ফলে কুরআনের অবমাননা করে। অথচ কুরআনের অবমাননা করা হারাম।

দ্বিতীয় প্রকার তাবিজ-কবচ:

কুরআন ছাড়া অন্য কিছু মানুষের কোন অংগে ঝুলানো। যেমন: দানা জাতীয় পুঁতি বা তাবিজ, হাড়, কড়ি, সুতা, জুতা, লোহার কাঁটা, শয়তান-জ্বিনদের নামসমূহ এবং বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র। এরূপ তাবিজ-কবচ সম্পূর্ণ হারাম ও শিরক। কারণ, এ ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ তা'আলা তার নাম ও গুণাবলী এবং আয়াত ব্যতীত অন্যের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ (سنن الترمذى:٢٠٧٢)

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন কিছু (তাবিজ-কবচ ইত্যাদি) লটকায় তাকে ঐ বস্তুর দিকে সোপর্দ করে দেওয়া হয়।[৯৭]

অর্থাৎ সে যা লটকায় আল্লাহ্ তাকে সে বস্তুর নিকটে সোপর্দ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতঃ তার নিকটে আশ্রয় নিয়ে নিজের সকল বিষয় তার দিকে সোপর্দ করে আল্লাহ্ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট হবেন। সকল দূরবর্তী বিষয়কে তার কাছে করে দিবেন এবং কঠিন কাজকে তার জন্য সহজ সাধ্য করে দিবেন।

৯৭. হাসান: সুনানে তিরমিযী ২০৭২।

অপর দিকে যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন মাখলুক্ব, তাবিজ-কবচ, ঔষধ ও কবরের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে বা যোগাযোগ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ বস্তুর দিকে সোপর্দ করে দিবেন যা তার থেকে কোন কিছুকে বাধা দিতে পারবে না। ওটা তার কোন অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। ফলে এ ব্যক্তি তার আক্বীদাহ্ নষ্ট করতঃ স্বীয় রব্বের সাথে সম্পর্কেচ্ছেদ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

ঈমান-আক্বীদাহ্ নষ্টকারী ও তাতে ত্রুটি নিয়ে আসে এমন বিষয়াবলী থেকে স্বীয় আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাসকে হেফাযত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। তাই মুসলিম ব্যক্তি নাজায়িয কোন ঔষধ গ্রহণ করবে না। অপসংস্কৃতিতে বিশ্বাসী, ভেলকীবাজ গণকদের নিকটে রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যাবে না।

কারণ, তারা তার হৃদয় ও আক্বীদাকে রোগাগ্রস্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হবেন।

কোন প্রকার শারীরিক ব্যাধি ছাড়াই অনেকে নিজের গায়ে এ সকল জিনিস ঝুলিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বদ নযর ও হিংসার ক্ষতির ভয় তাদের অন্তরে কাজ করে। অনেকে আবার এগুলো নিজের গাড়ি, বাহন, বাড়ীর দরজা অথবা দোকানে ঝুলিয়ে রাখে। এ সবই দুর্বল আক্বীদা (বিশ্বাস) ও আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা না করার পরিণাম। নিশ্চয় দুর্বল আক্বীদাহ্ বা বিশ্বাসই প্রকৃত রোগ বা ব্যাধি। তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব) ও সঠিক আক্বীদা জানার মাধ্যমে এব্যাধির চিকিৎসা করা ফরয।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং আপনাদের সৎ আমলসমূহ কবুল করুন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

في بيان حكم الحلف بغير الله والتوسل والاستغاثة والاستعانة بالمخلوق

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা, সৃষ্টিজীবের দ্বারা অসীলা, ফরিয়াদ এবং সাহায্য প্রার্থনা করার বিধান

ক। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম/শপথ করার বিধান: হাল্ফ্ (الحلف) শব্দটির প্রতিশব্দ হল ইয়ামীনুন (اليمين)। হাল্ফ্ বা ইয়ামীন শব্দদ্বয়ের শাব্দিক অর্থ: কসম করা, শপথ করা ও প্রতিজ্ঞা করা। ইসলামের পরিভাষায় হাল্ফ্ বা শপথ হলো: বিশেষভাবে কোন সম্মানিত ব্যক্তি বা বস্তুর নাম উল্লেখ করে কোন বিষয়কে সুদৃঢ় বা মজবুত করা। আর সম্মান পাওয়া আল্লাহর অধিকার। অতএব আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা জায়েয নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, একমাত্র আল্লাহ্ এবং তার নাম ও গুণাবলীর দ্বারাই শপথ করতে হবে। তারা এ ব্যাপারেও একমত পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা যাবে না।[৯৮]

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা শিরক। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করে সে কুফরী এবং শিরক করে।[৯৯]

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। কিন্তু শপথকারীর নিকটে শপথকৃত জিনিস যদি এমন সম্মানের পর্যায়ে পৌঁছে যায় যাতে তার ইবাদত করা হয় তবে তা শিরকে আকবার বা বড় শিরকে পরিণত হয়। যেমন: বর্তমান কবর পূজারীদের অবস্থা।

---

৯৮. কিতাবুত্তাহীদের উপর ইবনে কাসেম প্রদত্ত টিকা ৩০৩ পৃষ্ঠা।

৯৯. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/১৫৩৫, মুসনাদে আহমাদ হা/৬০৭২, বাইহাকী সুনানুন কুবরা হা/১৯৮২৯, আবূ দাউদ হা/৩২৫১, ইবনে হিব্বান হা/৪৩৫৮।

এরা মাযারস্থ ব্যক্তিকে আল্লাহর চেয়ে বেশী ভয় পায় ও অধিক সম্মান করে। এদের কাউকে তাদের পীর ও ওলীর নামে শপথ চাওয়া হলে সত্য ব্যতীত শপথ করে না। অপর দিকে আল্লাহর নামে শপথ চাওয়া হলে মিথ্যা হলেও শপথ করতে দ্বিধা করে না!!!

অতএব, কসম বা শপথ হলো শপথকৃত ব্যক্তি বা বস্তুকে এমন সম্মান করা যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও জন্য প্রযোজ্য নয়। সঙ্গত কারণেই শপথ বিষয়টিকে সম্মান প্রদর্শন করতঃ যখন তখন বা কথায় কথায় বেশী শপথ করা উচিত নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم: ١٠]

যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। *সূরা আল্ ক্বলাম ৬৮:১০।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: ٨٩]

আর তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা করো। সূরা আল্ মায়িদা ৫:৮৯।

অর্থাৎ প্রয়োজন এবং সত্য নেকীর কাজ ব্যতীত তোমরা শপথ করবে না। কারণ অতিরিক্ত ও মিথ্যা শপথ করা আল্লাহকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করার পরিচায়ক। তা তাওহীদ বা একত্বের পূর্ণতার পরিপন্থী। হাদীছে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ , وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ , وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ لَهُ بِضَاعَةً فَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ

ক্বিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা হলোঃ বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহঙ্কারী ভিক্ষুক এবং ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহকে তার পণ্য বানিয়ে নিয়েছে; ফলে এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম ব্যতিত স্বীয় পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে না।[১০০]

---

১০০. সনদ ছ্বহীহ: আল্ মু'জামুস্ সাগীর-লিত্ তাবারানী ৮২১, ছ্বহীহ মুসলিম ১০৭, ছ্বহীহ জামি' হা/৩০৭২, ছ্বহীহ তারগিব ওয়াত তারহিব হা/১৭৮৮।

অত্র হাদীছে অধিক শপথ করার ক্ষেত্রে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর নামের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে অধিক শপথ করা হারাম। এমনি আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করাও হারাম।

মিথ্যা শপথকে ইয়ামিনে গামূস বলা হয়। তা হলো: অতীত কোন বিষয়ে জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করা। আর তা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিক্বদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: মুনাফিক্বরা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে।

পূর্বের আলোচনার সারাংশ হল:

১। গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে) নামে কসম/শপথ করা হারাম। যেমন: আমানত, ক্বা'বা শরীফ এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে শপথ করা। গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা শিরক।

২। ইচ্ছা করে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা হারাম। এটাকে ইয়ামিনে গামুস বলা হয়।

৩। সত্য হলেও বিনা প্রয়োজনে আল্লাহর নামে অধিক শপথ করা হারাম। এতে আল্লাহ্ তা'আলাকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করা হয়।

৪। প্রয়োজনের সময় আল্লাহর নামে সত্য শপথ করা জায়েয।[১০১]

---

১০১. শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: ٨٩]

আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাঁধ। অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা, তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা, একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন সিয়াম পালন করবে। এটা কাফফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। সূরা আল্ মায়িদা ৫:৮৯।

التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى

খ। সৃষ্টির অসীলা (মাধ্যম) ধরে আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করা

তাওয়াস্‌সুল (التّوسّل): কোন বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া এবং তার নিকটে পৌঁছা। **অসীলা** (الوسيلة) **অর্থ:** নৈকট্য অর্জন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة: ٣٥]

তোমরা তার (আল্লাহর) নিকটে অসীলা সন্ধান কর। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৩৫।*

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও সন্তুষ্টিমূলক কাজের মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জন করা।

তাওয়াস্‌সুল (التّوسّل) দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার: শরী'আত সম্মত তাওয়াস্‌সুল। এটাও কয়েকভাগে বিভক্ত, যথা:

১। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর দ্বারা তার অসীলা বা নৈকট্য অর্জন করা। যেমন: আল্লাহ তা'আলা তার বাণীতে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف: ١٨٠]

আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। *সূরা আল্ আ'রাফ ৭:১৮০।*

২। ঈমান ও সৎ আমলের মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করা। যেমন, ঈমানদারদের অসীলা অর্জনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ } [آل عمران: **١٩٣**]

হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন।

অতঃপর আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতএব আমাদের সকল গুনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দুর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। ***সূরা আলে ইমরান ৩:১৯৩।***

এক্ষেত্রে আরো প্রমাণ হলো হাদীছে বর্ণিত ঐ তিন ব্যক্তির ঘটনা যারা গুহায় আটকা পড়েছিলেন। উপর থেকে পাথর পড়ার কারণে তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ফলে তারা বের হতে পারছিলেন না। তখন তারা নিজেদের সৎ কর্মসমূহের দ্বারা আল্লাহর নিকটে অসীলা করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিপদ দূর করলেন। আর তারা বের হয়ে নিজ নিজ কাজে গমন করেন।[১০২]

৩। আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বের মাধ্যমে তার অসীলা বা নৈকট্য অর্জন করা। যেমনঃ ইউনুস আ. তাওহীদকে অসীলা করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা ইউনুস আ. এর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

{فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ....} [الأنبياء: ٨٧]

অতঃপর তিনি (ইউনুস আ.) অন্ধকারের মধ্যে আহবান করলেনঃ তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র। ***সূরা আল্ আম্বিয়া ২১:৮৭-৮৮।***

৪। স্বীয় দুর্বলতা, প্রয়োজন ও দারিদ্রতা প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে অসীলা করা। যেমনঃ আইয়ূব আ. বলেছিলেন,

{أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [الأنبياء: ٨٣]

আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি, আর আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান। ***সূরা আল্ আম্বিয়া ২১:৮৩।***

৫। জীবিত সৎ ব্যক্তিদের দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে অসীলা করা। যেমনঃ ছাহাবাগণের যুগে যখন অনাবৃষ্টি হতো তখন তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিজেদের জন্য আল্লাহর নিকটে দু'আ করতে বলতেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলে ছাহাবাগণ তার চাচা আব্বাস রা. কে নিজেদের জন্য আল্লাহর নিকটে দু'আ করতে বললে তিনি তাদের জন্য দু'আ করতেন।[১০৩]

---

১০২. ছ্বহীহ বুখারী হা/২২১৫, ২২৭২, ২৩৩৩, ২৪৬৫, ৫৯৭৪, ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৪৩।
১০৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/১০১৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৯৭।

৬। নিজের গুনাহ ও পাপের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে অসীলা করা। যেমন: মূসা আলাইহিস সালাম এর ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

{قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} [القصص: ١٦]

হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর যুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। ***সূরা আল্ ক্বাসাস ২৮:১৬।***

দ্বিতীয় প্রকার অসীলা: শরী'আত বহির্ভূত তাওয়াস্সুল।

তা হলো উল্লিখিত শরী'আতসম্মত অসীলা ব্যতীত বাকী সকল অসীলা। যেমন: মৃত ব্যক্তিদের নিকটে প্রার্থনা ও শাফা'আত তলবের মাধ্যমে অসীলা করা। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান ও মর্যাদার দ্বারা অসীলা করা। সৃষ্টির যাত অথবা অধিকারের দ্বারা অসীলা করা। নিম্নে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হলো:

১। মৃত ব্যক্তিদের নিকটে দু'আ চাওয়া অবৈধ: কারণ মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় যেমন দু'আ করতে সক্ষম, মৃত্যুর পর তিনি সে রকম দু'আ করতে সক্ষম নন।

একইভাবে মৃত ব্যক্তিদের নিকটে শাফা'আত (সুপারিশ) চাওয়া অবৈধ। কারণ উমার ইবনে খাত্তাব, মুয়াবিয়াহ্ ইবনে আবূ সুফিয়ান ও তাদের সময়ে উপস্থিত ছাহাবাগণ এবং তাদের সঠিকভাবে অনুসরণকারী তাবিয়ীগণ যখন অনাবৃষ্টির শিকার হতেন তখন তারা জীবিত ব্যক্তি, যেমন-আব্বাস রা. এবং ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ রা. এর মাধ্যমেই আল্লাহর নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন, অসীলা ধরতেন এবং সুপারিশ তলব করতেন।

কখনই তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের নিকটে বা অন্য স্থানে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করেননি। বরং এর পরিবর্তে তারা আব্বাস ও ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ থেকে মাধ্যম গ্রহণ করতেন। উমার রা. এ বলে দু'আ করেছিলেন:

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

(صحيح البخاري: ١٠١٠)

হে আল্লাহ, আপনার নাবীর জীবদ্দশায় আমরা আপনার নাবীর মাধ্যমে আপনার নিকটে অসীলাহ গ্রহণ করলে আপনি আমাদিগকে বৃষ্টি দিতেন। এখন তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন তাই আমরা আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

চাচার মাধ্যমে আপনার নিকটে অসীলাহ করছি। অতএব, আপনি আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন: তখন তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বৃষ্টি লাভ করতেন।[১০৪]

ছাহাবাগণ যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে শরী'আত সম্মত উপায়ে অসীলা গ্রহণে অসুবিধার সম্মুখীন হলেন তখন তার পরিবর্তে তারা আব্বাস রা. বা অন্য ছাহাবীর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করতেন। অথচ মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে অসীলা করা যদি জায়িয হতো তবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের নিকটে এসে অসীলা করা তাদের জন্য খুবই সহজ ছিল।[১০৫]

সুতরাং তাদের সেটা পরিত্যাগ করা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দু'আ প্রার্থনা এবং সুপারিশ চাওয়াসহ সকল ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিদেরকে অসীলা করা জায়িয নয়। মৃত ব্যক্তিদের জীবদ্দশা ও মৃত্যুর পর উভয় অবস্থায় যদি তাদের দ্বারা দু'আ ও সুপারিশ চাওয়া সমান হতো তবে ছাহাবাগণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বাদ দিয়ে তার চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে যেতেন না।

২। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা অন্য কারো সম্মানের অসীলা করা নাজায়িয।

অনেকে নিম্নোক্ত হাদীছটি বলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান বা মর্যাদার দ্বারা অসীলা করা জায়িয বলে সাব্যস্ত করেন:

(إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم) (التوسل (ص: ١١٧)

তোমরা যখন আল্লাহর নিকটে কোন কিছু চাইবে তখন আমার সম্মান ও মর্যাদার অসীলা করে চাও। কারণ আল্লাহর নিকটে আমার মর্যাদা মহান।[১০৬]

অথচ উপরোক্ত হাদীছটি মিথ্যা ও জাল। মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে তা নেই। কোন হাদীছ বিশারদ ও বিশেষজ্ঞ তা উল্লেখ করেননি।[১০৭]

যেহেতু দলীল হিসাবে উপরোক্ত হাদীছটি সঠিক নয়, (আর অন্য কোন ছ্বহীহ দলীলও নেই)। তাই রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মান ও মর্যাদার

---

১০৪. ছ্বহীহ বুখারী ১০১০।
১০৫. মাজমূ' ফতোওয়া ১/৩১৮-৩১৯।
১০৬. তাওয়াস্ সুল লিশ্ শাইখ আলবানী (রহি.) ১১৭ পৃষ্ঠা।
১০৭. মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৩১৯।

অসীলা করা জায়িয নয়। কারণ ইবাদতের কোন বিষয় স্পষ্ট দলীল ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না।

৩। সৃষ্টির দোহাই দিয়ে অসীলা করা অবৈধ।

কারণ আরবী “বা” অব্যয়টি শপথের জন্য ব্যবহৃত হলে এ দ্বারা আল্লাহর উপর শপথ করা বুঝায়। এক সৃষ্টির দ্বারা অপর সৃষ্টির উপর শপথ করা অবৈধ। কারণ হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী তা শিরক। তাহলে সৃষ্টির দ্বারা কিভাবে আল্লাহর উপর শপথ করা জায়েয হতে পারে?

আর যদি আরবী “বা” অব্যয়টি সাবাবিয়াহ্ বা কারণ হিসাবে ব্যবহার হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির দ্বারা চাওয়াকে দু'আ কবুলের কারণ করেননি এবং তার বান্দাদের জন্য এটা শরী'আত সম্মতও করেননি।

৪। সৃষ্টির কোন অধিকারের দোহাই দিয়ে অসীলা করা দু'টি কারণে নাজায়েয।

ক। আল্লাহর উপর কারো কোন অধিকার ওয়াজিব নয়। বরং আল্লাহ তা'আলাই নিজের উপর বান্দার জন্য কিছু অধিকার নির্ধারণ করে তার উপর অনুগ্রহ ও দয়া করেছেন। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]

মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। সূরা আর রূম ৩০:৪৭।

আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা তার নিকটে ভাল প্রতিদান লাভের অধিকার রাখে। তবে তার এ অধিকার দয়া ও অনুগ্রহ লাভের অধিকার। এটা ঐরূপ অধিকার নয় যেমন কোন জিনিসের বিনিময়ে এক সৃষ্টির উপর অন্য সৃষ্টির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বরং আল্লাহ তার আনুগত্যশীল ও মুমিন বান্দাদেরকে যে পুরষ্কার দিবেন সেটা তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও দয়া স্বরূপ।

খ। এই অধিকারের মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর অনুগ্রহ ও দয়া করেন। এটা কেবল তার সাথেই খাস বা সংশ্লিষ্ট। এর সাথে অন্য কারো কোন সম্পর্ক নেই। যখন কোন অধিকারহীন ব্যক্তি এর দ্বারা অসীলা করবে তখন সে এমন অপরিচিত বিষয়ের মাধ্যমে অসীলা গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে যার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ফলে এ অসীলা দ্বারা সে কোন কিছুই পাবে না।

أسألك بحق السائلين(التوسل (ص: ٩٣)

আমি যাঞ্ছাকারীদের অধিকারের মাধ্যমে চাইতেছি বলে যে হাদীছটি বর্ণনা করা হয় তা ছ্বহীহ নয়। কারণ, এ হাদীছের সনদে "আত্বীয়্যাহ্ আল্ আওফী" রয়েছেন। তিনি দুর্বল। অনেক মুহাদ্দিস তার দুর্বলতার ক্ষেত্রে সকলের ঐক্যমতের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব, যার অবস্থা এই তার বর্ণিত হাদীছ দ্বারা আক্বীদার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলীল পেশ করা গ্রহণীয় হবে না।

তাছাড়া এতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে অসীলা করা হয়নি। বরং সকল প্রার্থনাকারীদের অধিকারের দ্বারা অসীলা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদানুযায়ী প্রার্থনাকারীদের অধিকার হলো তাদের প্রার্থনা কবুল করা।

এটা এমন এক অধিকার যা প্রার্থনাকারীদের জন্য আল্লাহ্ নিজেই নিজের উপর ওয়াজিব করেছেন। অন্য কেউ তার উপর এটা ওয়াজিব করেনি। আর এটা আল্লাহর সত্য ওয়াদা বা অঙ্গিকারের মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ। সৃষ্টিজগতের অধিকারের মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ নয়।

حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق

গ। সৃষ্টির নিকটে সাহায্য প্রার্থনা ও বিপদে উদ্ধার কামনা করা

আল্ ইসতিআনাহ (الاستعانة): যার অর্থ কোন বিষয়ে সাহায্য, সহযোগিতা ও শক্তি প্রার্থনা করা।

আল্ ইস্তিগাসাহ (الاستغاثة): যার অর্থ বিপদে উদ্ধার কামনা করা বা কোন সমস্যা দূরিকরণে ফরিয়াদ করা।

সৃষ্টির নিকট ফরিয়াদ কামনা ও সাহায্য প্রার্থনা করা দু'প্রকার।

প্রথম প্রকার: সৃষ্টিজগতের কেউ যে কাজ করতে সক্ষম সে কাজে তার সাহায্য চাওয়া এবং উদ্ধার কামনা করা বৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]

সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় একে অন্যের সাহায্য কর। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:২।*

মূসা আলাইহিস সালাম এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} [القصص: ١٥]

অতঃপর যে তার নিজ দলের সে তার শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। *সূরা আল্ ক্বাসাস ২৮:১৫।*

এর আরো উদাহরণ হলো, যুদ্ধ ও অন্যান্য সময়ে মানুষ যা করতে সক্ষম সে বিষয়ে তার সাহায্য চাওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার: যে কাজ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেউ করতে সক্ষম নয় সে কাজে সৃষ্টিজীবের নিকটে সাহায্য চাওয়া ও ফরিয়াদ জানানো।

যেমন: যে কাজ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ করতে সক্ষম নয় সে বিষয়ে মৃত এবং জীবিত ব্যক্তিদের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ জানানো। এর অন্যতম হলো: গাইরুল্লাহর নিকটে রোগীদের রোগ মুক্তি কামনা করা, মহা বিপদ-আপদ ও ক্ষতিকারক জিনিস প্রতিহত করার আবেদন জানানো। শিরকে আকবার (বড় শিরক) হওয়ার দরুন সৃষ্টিজীবের নিকট এ প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করা ও ফরিয়াদ জানানো অবৈধ। নাবী কারীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এক

মুনাফিক্ব ছিল, যে মুমিনগণকে কষ্ট দিত। তাদের কতেকে বললেন: চলুন আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এ মুনাফিক্বের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ফরিয়াদ জানাই। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

إنه لا يُستغاثُ بِي، وإنما يستغاث بالله

আমার নিকটে ফরিয়াদ জানানো যাবে না। কেবল মাত্র আল্লাহর নিকটেই উদ্ধার কামনা করতে হবে।[১০৮]

নিজের জীবদ্দশায় সামর্থিত বিষয়ে ফরিয়াদ শব্দটি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করাকে অপছন্দ করেছেন। কারণ, তার উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদের সংরক্ষণ ও শিরকের যাবতীয় পথ বন্ধ করে দেয়া। স্বীয় স্রষ্টার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার ও বিনয় শিক্ষা দেয়া এবং কথা ও কাজে সকল প্রকার শিরক থেকে উম্মাতকে সতর্ক করা।

স্বীয় জীবদ্দশায় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামর্থিত বিষয়ে ফরিয়াদ জানানোর অবস্থা এমন হলে কিভাবে মৃত্যুর পর তার নিকটে ফরিয়াদ জানানো এবং সাহায্য প্রার্থনা করা জায়িয হতে পারে যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ করতে সক্ষম নয়।[১০৯]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে তা জায়িয না হলে অন্যের ক্ষেত্রে তা বৈধ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

---

১০৮. তাবারানী।

১০৯. ফাত্হুল মাজীদ ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়

في بيان ما يجب اعتقاده في الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবারবর্গ এবং ছাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে যে আক্বীদা-বিশ্বাস রাখা আবশ্যক।

এ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদসমূহে আলোচনা করা হবে

প্রথম পরিচ্ছেদঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা ও সম্মান করা ওয়াজিব, তার প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়া-বাড়ি ও সীমালংঘন করা নিষিদ্ধ এবং তার মর্যাদা সম্পর্কে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও অনুকরণ করা ওয়াজিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ছ্বলাত ও সালাম পাঠের বিধান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের মর্যাদা, ঘাটতি ও সীমালংঘন ব্যতীত তাদের জন্য করণীয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ছাহাবাগণের মর্যাদা, তাদের ব্যাপারে যে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব এবং তাদের মাঝে সৃষ্ট মতানৈক্য সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ছাহাবাগণ এবং সঠিক পথের ইমামগণকে গালি দেওয়া নিষেধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

في وجوب محبة الرسول وتعظيمه والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه وبيان منزلته – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা এবং সম্মান করা ওয়াজিব। তার প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়া-বাড়ি ও সীমালংঘন করা নিষিদ্ধ এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা।

১। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসা এবং সম্মান করা ওয়াজিব।

প্রত্যেক বান্দার উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব হলো আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসা। এটা সবচেয়ে বড় ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]

আর যারা মু'মিন তারা আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। *সূরা আল বাক্বারা ২:১৬৫।*

কারণ, আল্লাহ তা'আলা হলেন এমন রব্ব যিনি স্বীয় বান্দাদের উপর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার নিয়ামত দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহর ভালবাসার পর তার রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বেশী ভালবাসা আবশ্যক। কারণ, তিনিই মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন, আল্লাহর পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, তার শরী'আতকে সকলের নিকটে পৌঁছিয়ে দিয়ে দীনের বিধিবিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতের যে সকল কল্যাণ মুমিনগণ অর্জন করেছেন তা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ (صحيح البخاري (١٦)

যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি বিষয় থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে: আল্লাহ এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট অন্য সকলের চেয়ে প্রিয় হবে। কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কুফরী থেকে বাঁচানোর পরে পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে সে অগ্নিতে নিক্ষেপের মত অপছন্দ করবে।[১১০]

সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার অধীন। অর্থাৎ আল্লাহকে ভালোবাসতে চাইলে অবশ্যই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসতে হবে। আল্লাহর ভালোবাসার পরই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসার স্থান। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বতন্ত্রভাবে ভালোবাসা এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য সকল প্রিয় ব্যক্তি ও বস্তুর উপর তার ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (صحيح البخاري ١٥)

তোমাদের কেউ আমাকে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততী এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশী ভাল না বাসা পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।[১১১]

সত্যিকার অর্থে, প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির নিজের জীবনের চেয়েও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অধিক ভালবাসা ওয়াজিব। যেমনটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ (صحيح البخاري ٦٦٣٢)

উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বললেন: হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি আমার নিকটে আমার জীবন ব্যতীত সকল বস্তু থেকে প্রিয়। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: না, সেই আল্লাহর শপথ যার

---

১১০. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৩।
১১১. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫, সুনানে দারিমী হা/২৭৮৩, মুসনাদে আহমাদ হা/১২৮১৪।

হাতে আমার প্রাণ, আমাকে তোমার জীবনের চেয়েও অধিক ভাল না বাসা পর্যন্ত তুমি পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না। তখন উমার রা. বললেন: এখন আপনি ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আমার জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এখন তোমার ঈমান পূর্ণতা লাভ করল হে উমার।[১১২]

সুতরাং বুঝা গেল যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালোবাসা এবং তার ভালোবাসাকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সকলের ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়া ওয়াজিব। কারণ, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার অধীন এবং তার আবশ্যককারী। অর্থাৎ কেউ আল্লাহর ভালোবাসার দাবী করলে অবশ্যই তাকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও ভালোবাসতে হবে। কেননা, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা আল্লাহর রাস্তায় এবং তার সন্তুষ্টির জন্য। মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি ও ঘাটতি হওয়ার সাথে সাথে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তার ভালোবাসা বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয়ে থাকে। প্রত্যেক আল্লাহ তা'আলা প্রেমিক তার রাস্তায় এবং তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্যকে ভালোবাসে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসার চাহিদা হলো: তাকে সম্মান করা, তাকে শ্রদ্ধা করা, তার আনুগত্য করা, তার কথাকে সকল সৃষ্টিজীবের কথার উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং তার সুন্নাতকে সম্মান করা।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম রহি. বলেন: কোন মানুষকে তখনি ভালোবাসা জায়িয হবে যখন তা আল্লাহর ভালোবাসার ও সম্মানের পরে এবং অধীনে হবে। যেমন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাকে সম্মান করা। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান করা আল্লাহকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা করার পরিচায়ক। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসেন এবং সমীহ করেন বলেই তার উম্মাত তাকে ভালোবাসেন এবং সম্মান করেন।

অতএব, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা মানে আল্লাহকেই ভালোবাসা এবং আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালোবাসা ওয়াজিব।

---

১১২. ছ্বহীহ বুখারী ৬৬৩২।

সার কথা হলোঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা এমন সম্মান-মর্যাদা এবং ভালোবাসা প্রদান করেছিলেন যা অন্য কাউকে প্রদান করেননি।

এজন্য তার ছাহাবাগণের হৃদয়ে তার প্রতি যে মর্যাদা-সম্মান ও ভালবাসা ছিল অন্য কারো নিকটে কোন ব্যক্তি সে রকম সম্মান ও ভালবাসার পাত্র ছিল না।

আম্‌র ইবনে আস্‌ রা. ইসলাম গ্রহণের পর বলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে কোন ব্যক্তি আমার নিকটে ঘৃণার পাত্র ছিলেন না। কিন্তু যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন আমার দৃষ্টিতে তার চেয়ে অধিক ভালোবাসার ও সম্মানের পাত্র কেউ ছিল না। তিনি বলেনঃ যদি আমাকে তার গুণাগুণ বর্ণনা করতে বলা হয় তবে আমি তা পারব না। কারণ, তার সম্মাণার্থে আমি কোন সময় তার দিকে দু'চোখ ভরে (ভাল করে) তাকাইনি।

উরওয়াহ্‌ ইবনে মাসউদ রা. কোরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর শপথ, আমি "কিসরা", "কায়সার" ও অন্যান্য বাদশাহদের নিকটে রাষ্ট্রদূত হিসাবে গিয়েছি। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবাগণ তাকে যতটুকু সম্মান করেন, অন্য কোন বাদশাহর সহচরবৃন্দকে ততটুকু সম্মান করতে দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তার সম্মানার্থে স্বীয় সাথীরা তার চোখে চোখ রাখতে পারতেন না।

যখনি তিনি কফ ও শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করতেন তখন তা ছাহাবীদের কারো না কারো হাতে পড়ত এবং তিনি তা দিয়ে স্বীয় চেহারা ও বক্ষ মর্দন করতেন। যখন তিনি উযূ করতেন তখন তারা তার উযূর পানি নেয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন।[১১৩]

২। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়া-বাড়ি ও সীমালংঘন করা নিষেধ।

الغلو (আল্‌ গুলু): এটা আরবী শব্দ, যার অর্থঃ সীমালংঘন করা। যখন কোন ব্যক্তি কারো সম্মানের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে তখন আরবী পরিভাষায় বলা হয়: غَلَا غُلُوًّا অর্থাৎ সে সম্মানের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১১৩. জালাউল আফ্‌হাম ১২০-১২১ পৃষ্ঠা।

[لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} النساء: ١٧١]

তোমরা তোমাদের দীনের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করিও না। *সূরা আন্ নিসা* **১৭১।**

الإطراء। (আল্ ইত্বরা'): এটাও আরবী শব্দ যার অর্থ প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা এবং তাতে মিথ্যা বলা।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে সীমালংঘনের ব্যাখ্যা হলো:

তার সম্মানের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা। যেমন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দাসত্ব ও রিসালাতের স্তর থেকে উপরে উঠিয়ে উপাস্যের কোন বৈশিষ্ট্য তার জন্য নির্ধারণ করতঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার নিকটে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা এবং তার নামে শপথ করা।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **এর ক্ষেত্রে "ইত্বরা" এর ব্যাখ্যা হলো:** তার প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা তা থেকে নিষেধ করেছেন:

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (صحيح البخاري (٣٤٤٥)

প্রশংসার ক্ষেত্রে তোমরা আমাকে নিয়ে সীমালংঘন করিও না। যেমন, খ্রিষ্টানেরা ঈসা ইবনে মারঈয়াম আ. এর প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে ছিল। আমি তো কেবল আল্লাহর একজন বান্দা। অতএব, তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল বলো।[১১৪]

অর্থাৎ বাতিল ও মিথ্যা দিয়ে তোমরা আমার প্রশংসা করবে না এবং এক্ষেত্রে সীমালংঘনও করবে না। যেমন, খ্রিষ্টানেরা ঈসা আ. এর ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে তাকে মাবূদ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ্ আমাকে যেগুণে গুণান্বিত করেছেন তোমরা আমাকে সেই গুণে গুণান্বিত করতঃ আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল বলে সম্বোধন করবে।

---

১১৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫।

যখন তার কিছু ছাহাবী তাকে **أنت سيّدُنا** [আন্‌তা সাইয়িদুনা]-আপনি আমাদের নেতা বা মালিক। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: **السَّيِّدُ الله تبارك وتعالى**-সাইয়িদ-মালিক বা প্রভু হলেন মহান রব্বুল আলামীন।

ছাহাবাগণ যখন বললেন: আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান এবং দানশীল। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

তোমরা তোমাদের এ কথা অথবা কিছু কথা বলতে পারো। তবে শয়তান যেন তোমাদের উপর সওয়ার না হয়।[১১৫]

কতিপয় লোক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন: হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হে আমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও সর্বোত্তমের সন্তান। আমাদের নেতা এবং নেতার সন্তান। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبدُ الله ورسولُه، ما أحبُّ أن ترفعوني فوقَ منزلتي التي أنزلني الله عزّ وجلّ

হে মানুষেরা, তোমরা তোমাদের কথা বলতে থাকো। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে না পারে। আমি মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তোমরা আমাকে তার ঊর্ধ্বে স্থান দাও এটা আমি পছন্দ করি না।[১১৬]

সৃষ্টির মাঝে সার্বিক দিক দিয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত শব্দাবলী দ্বারা নিজের প্রশংসা করাকে অপছন্দ করেছেন: أنت سيدنا [আন্তা সাইয়িদুনা]-আপনি আমাদের নেতা, أنت خيرُنا [আন্তা খাইরুনা]-আপনি আমাদের মাঝে সবচেয়ে ভাল, أنت أفضلُنا [আন্তা আফযালুনা]-আপনি আমাদের মধ্যে উত্তম এবং أنت أعظمُنا আপনি আমাদের মধ্যে মর্যাদাবান।

---

১১৫. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৮০৬
১১৬. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহ্‌মাদ হা/১৩৫২৯

নিজের অধিকারের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও সীমালংঘন করা থেকে দূরে থাকতে এবং তাওহীদের সংরক্ষনের জন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত শব্দাবলী দ্বারা তার প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন।

বান্দার জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা জ্ঞাপক দু'টি গুণ দ্বারা তিনি তাকে গুণান্বিত করতে বলেছেন। ঐ দুটি শব্দে আক্বীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন নেই এবং তাতে কোন ক্ষতিরও আশংকা নেই। সে শব্দ দুটি হলো, আব্দুল্লাহ্ - আল্লাহর বান্দা এবং ওয়া-রসূলুহু - তার রসূল। আল্লাহ তাকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে সন্তুষ্ট হয়েছেন এর চেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়াকে তিনি অপছন্দ করেছেন।

অথচ অনেক মানুষ তার নিষেধের কোন তোয়াক্কা না করে তাকে ডাকা, তার নিকটে উদ্ধার কামনা করা, তার নামে শপথ করা এবং এমন বস্তু তার নিকটে প্রার্থনা করে যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকটে চাওয়া কখনো জায়িয নয়।

যেমন, বিভিন্ন মীলাদ মাহফিল, রসূলের নামে গাওয়া কাসিদাহ্ (কবিতা ছন্দ) এবং ইসলামী সংগীতে বলা হয়। অথচ এসকল লোকেরা আল্লাহ্ এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অধিকারের মাঝে কোন পার্থক্য করে না।

আল্লামা ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম রহি. তার নূনিয়্যাহ্ নামক আক্বীদার কবিতায় বলেন:

لله حقٌّ لا يكون لغيره * و لعبده حق هما حقّان**

لا تجعلوا الحقّين حقّا واحدا * من غير تمييز ولا فرقانِ (الجواب الفائق في الرد على مبدل الحقائق (ص: ٥٩)**

আল্লাহ্ তা'আলার এমন অধিকার বা হক্ব রয়েছে যা অন্যের জন্য প্রযোজ্য নয়। বান্দারও অধিকার বা হক্ব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার পৃথক হক্ব রয়েছে। অতএব, দু'হক্বের মাঝে তারতম্য ও পার্থক্য না করে তোমরা দু'হক্বকে এক হক্বে পরিণত করিও না।[১১৭]

১১৭. আল্ জাওয়াবুল ফায়িক্ব ফির রদ্দে আলা মুবাদ্দিলিল হাক্বায়িক্ব।

৩। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা:

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে প্রশংসা ও মর্যাদা উল্লেখ করেছেন তা বর্ণনা করা ও সে অনুযায়ী বিশ্বাস রাখাতে কোন অসুবিধা নেই। তার রয়েছে আল্লাহর প্রদত্ত সু-উচ্চ মর্যাদা। তিনি হলেন, আল্লাহর বান্দা ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । সৃষ্টির সেরা এবং সার্বিকভাবে সকল সৃষ্টি জীবের চেয়ে উত্তম। সকল জ্বিন ও ইনসানের নিকটে তিনি রসূল হিসাবে প্রেরিত। তিনি শ্রেষ্ঠ রসূল এবং শেষ নাবী। তার পরে আর কোন নবী আসবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য তার নাবীর বক্ষকে খুলে দিয়েছিলেন এবং তার খ্যাতিকে তিনি সমুন্নত করেছেন। যারা তার বিরোধী আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত ও নিচু করেছেন। তিনি হলেন, প্রশংসিত স্থানের অধিকারী। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]

শিগগিরই আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে (সম্মানিত স্থানে) পৌঁছাবেন। *সূরা বানী ইসরাঈল ৭৯।*

অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসের কঠিন পরিস্থিতি থেকে স্বীয় বান্দাদেরকে উদ্ধারের নিমিত্তে তাদের সুপারিশের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে স্থানে তার নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অধিষ্ঠিত করবেন তাই হলো মাক্বামে মাহমুদ। সকল নাবীগণের মাঝে এ স্থানটি কেবল মাত্র নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য নির্দিষ্ট। সকল সৃষ্টির মাঝে তিনি আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী এবং তাক্বওয়া অর্জনকারী ছিলেন। তার উপস্থিতিতে উম্মাতকে আল্লাহ্ তা'আলা উঁচু স্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আর যারা তার সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রশংসা করে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٤) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)} [الحجرات٢-٥]

হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে

কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। যারা আল্লাহ্‌র রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্যে শোধিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত সবর করত, তবে তা-ই তাদের জন্যে মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *সূরা আল হুজরাত ২-৫।*

ইমাম ইবনে কাসীর রহি. বলেনঃ অত্র আয়াতগুলোর মাধ্যমে মহান রব্বুল আলামীন স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কিভাবে সম্মান, মর্যাদা, শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করবে তা শিক্ষা দিয়েছেন। সকল মানুষকে যেমন তাদের নাম ধরে ডাকা হয় সেভাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নাম ধরে ডাকতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন। যেমন, ইয়া মুহাম্মাদ বা হে মুহাম্মাদ বলা। বরং নবূয়ত ও রিসালাতের বিশেষণ দ্বারা তাকে আহ্বান করতে হবে। যেমন, ইয়া রসূলুল্লাহ (হে আল্লাহর রসূল) ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্ (হে আল্লাহর নাবী) ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾

রসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। *সূরা আন্ নূর ৬৩।*

আল্লাহ তা'আলা নিজেও তাকে **يا أيها النبي** (হে নবী) ও **يا أيها الرسول** (হে রসূল) বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রশংসা করতঃ তার উপর রহমত নাযিল করেন, ফেরেশতাগণ তার জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চেয়ে দু'আ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকেও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নাবীর উপর রহমত নাযিল করেন এবং তার ফেরেশতাগণ নাবীর জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চেয়ে দু'আ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা

নাবীর জন্যে রহমতের দু'আ কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর। *সূরা আল্ আহযাব ৫৬।*

তবে কুরআন হাদীছের বিশুদ্ধ দলীল ব্যতীত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় বা তার প্রশংসার কোন ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না। মিলাদুন্নাবি বা জন্মবার্ষিকী পালনকারীর দল ধারণা প্রসূত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসার জন্য যে দিন ও পদ্ধতি ধার্য করে নিয়েছে তা স্পষ্ট ও ঘৃণিত বিদ'আত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্মান করার অর্থ হলোঃ তার সুন্নাতকে সম্মান করা। সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক এ বিশ্বাস রাখা। সম্মান ও আমল করার দিক দিয়ে তার সুন্নাত (হাদীছ) কুরআনের পরেই দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। কারণ, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছও আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী/প্রত্যাদেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣، ٤]

তিনি (রসূল) প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। তিনি যে কথা বলেন তা অহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। *সূরা আন নাজ্‌ম ৩-৪।*

অতএব, হাদীছের ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ ও তার মর্যাদায় কোন কমতি করা জায়িয নয়। সন্দেহাতীতভাবে অবগত না হওয়া পর্যন্ত তার কোন হাদীছকে ছ্বহীহ-যঈফ বলা কিংবা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা আদৌ বৈধ নয়। বর্তমান সময়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের বিরুদ্ধে অজ্ঞদের বাড়া-বাড়ি চরমে পৌঁছেছে। বিশেষতঃ কিছু উদীয়মান যুবক যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করছে তারাও শুধু কিছু কিতাবাদি পড়ে জ্ঞানহীন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন হাদীছকে ছ্বহীহ-যঈফ বলা এবং অনেক বর্ণনাকারীকে দোষারোপ করা শুরু করেছে। আর তা তাদের ও উম্মাতের জন্য বিরাট ক্ষতিকর বিষয়। অতএব, এসকল যুবকদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং নিজেদের জ্ঞানানুযায়ী কথা বলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

في وجوب طاعته – صلى الله عليه وسلم – والاقتداء به

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও অনুকরণ করা ওয়াজিব

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ বাস্তবায়ন এবং নিষেধকৃত কাজ পরিত্যাগের মাধ্যমে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। এটা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহর রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়ার চাহিদা। অনেক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন। কখনো তার আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট করে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩]

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। *সূরা আন্ নিসা ৪:৫৯।*

কখনও এককভাবে রসূলের আনুগত্যের কথা বলেছেন, যেমন তিনি বলেন:

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]

যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। *সূরা আন্ নিসা ৪:৮০।*

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النور: ٥٦]

তোমরা রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও। *সূরা আন্ নূর ৫৬।*

আবার কখনো আল্লাহ্ তা'আলা তার রসূলের বিরোধীদের ক্ষেত্রে শাস্তির ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

যারা রসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন এমর্মে সতর্ক হয়ে যায় যে, যে কোন মূহুর্তে ফিৎনায় পতিত হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *সূরা আন্ নূর ৬৩।*

অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে কুফরী বা মুনাফিক্বী বা বিদ'আতের ফিৎনা পৌঁছতে পারে। অথবা দুনিয়াতে হত্যা, সাজা, বন্দি বা তাৎক্ষণিক কঠিন শাস্তির দ্বারা দুনিয়ায় সাজা পেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করাকে বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা লাভ ও গুনাহমোচনের কারণ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তবে আমার (রসূলের) আনুগত্য কর, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মোচন করবেন। এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। *সূরা আলে ইমরান ৩১।*

রসূলের আনুগত্যকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত ও তার অবাধ্য হওয়াকে পথ ভ্রষ্টতা বলে উল্লেখ করে বলেন:

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور: ٥٤﴾

এবং যদি তোমরা তার (রসূলের) অনুসরণ করো তবে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। *সূরা আন্ নূর ৫৪।* অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [القصص: ٥٠﴾

অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। *সূরা আল্ ক্বাসাস ৫০।*

আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদও দিয়েছেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাঝে তার উম্মাতের জন্য উন্নত আদর্শ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: ٢١﴾

যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। *সূরা আল্ আহ্যাব* **২১।**

ইমাম ইবনে কাসীর রহি. বলেন: এ আয়াতটি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও যাবতীয় অবস্থায় তার অনুসরণ ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে একটি বড় মূলনীতি। এজন্য রব্বুল আলামীন আহযাবের (খন্দকের) যুদ্ধে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্য্য ধারণ, অন্যদেরকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দান, পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা, তার কষ্ট সহ্য করা এবং স্বীয় রব্বের পক্ষ থেকে বিপদ দূরীকরণে অপেক্ষা করার ক্ষেত্রে তার অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে মানুষদেরকে আদেশ দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত অনবরত তার উপর আল্লাহর রহমাত ও শান্তি নাযিল হোক।

মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনের প্রায় চল্লিশ স্থানে রব্বুল আলামীন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও অনুসরণের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব, মানুষেরা তাদের পানাহারের চেয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা জানা ও অনুসরণের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী। কারণ, পানাহার না করলে মানুষ খুব জোর দুনিয়াতে মারা যাবে। অপর দিকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও আনুগত্য না করলে চিরস্থায়ী দূর্ভাগ্য ও শাস্তি বরণ করতে হবে।

ইবাদতের ক্ষেত্রে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি যাবতীয় ইবাদত যেভাবে আদায় করেছেন এবং করতে বলেছেন আমাদেরকে সেভাবেই তা আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١﴾

নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। *সূরা আল্ আহ্যাব* **২১।**

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছেন:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (صحيح البخاري (٦٣١)

তোমরা আমাকে যেভাবে ছ্বলাত আদায় করতে দেখো সেভাবে ছ্বলাত আদায় করো।[১১৮] তিনি আরো বলেন:

خُذُواعَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ (صحيح مسلم (١٢٩٧)

তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হজ্জের নিয়ম কানুন গ্রহণ করো।[১১৯] তিনি আরো বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (صحيح مسلم (١٧١٨)

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যার উপর আমাদের দীন নেই তা প্রত্যাখ্যাত।[১২০] তিনি আরো বলেন,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي [صحيح البخاري (٥٠٦٣)]

যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হল সে আমার দলভুক্ত নয়।[১২১]

এছাড়াও আরো অনেক দলীল রয়েছে যাতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের আনুগত্য করতে এবং তার বিরোধীতা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ কর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না। *সূরা ইমরান ৩:১০৩*

---

১১৮. ছ্বহীহ বুখারী ৬৩১, ৬০০৮।
১১৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৯৭।
১২০. ছ্বহীহ বুখারী, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।
১২১. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪০১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

في مشروعية الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ছ্বলাত-দরূদ ও সালাম পাঠের বিধান

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য তার উম্মাতের উপর মহান রব্বুল আলামীন যে হক্ব শরী'আত সম্মত করেছেন তা হলো, তার উপরে ছ্বলাত ও সালাম পেশ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦]

আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফেরেশতাগণও নাবীর জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চেয়ে দু'আ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নাবীর জন্যে অনুগ্রহের দু'আ কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর। *সূরা আল্ আহযাব ৫৬।*

আয়াতে বর্ণিত রসূলের উপর আল্লাহর ছ্বলাত প্রেরণের অর্থ হলো: ফেরেশতাদের নিকটে আল্লাহ কর্তৃক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা করা। ফেরেশতাদের ছ্বলাত প্রেরণের অর্থ: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য দু'আ করা। মানুষের পক্ষ থেকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ছ্বলাত পেশের অর্থ হলো: তার জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাওয়া।[১২২]

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তার নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের মাঝে স্বীয় নাবী ও বান্দা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদার সংবাদ দিয়ে বলেন যে, নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের নিকটে তিনি রসূলের প্রশংসা করেন এবং ফেরেশতাগণ নাবীর জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ নিম্নজগত তথা দুনিয়াবাসীকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ছ্বলাত ও সালাম পেশের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন উভয় জগতবাসীর প্রশংসা তার উপর একত্রে বর্তিত হয়।

আয়াতে বর্ণিত ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ এর অর্থ: ইসলামের অভিবাদন দিয়ে তাকে সম্মান ও শুভেচ্ছা জানাও। কেউ যখন রসূলের উপর ছ্বলাত পেশ করে তখন যেন

১২২. ছ্বহীহ বুখারী তাফসীর অধ্যায় ৪৭৯৭ নং হাদীছের পূর্ববর্তী অংশ।

ছ্বলাত ও সালাম উভয়টি পেশ করে। আর উভয়টির কোন একটিকে যেন যথেষ্ট মনে না করে। যেমন, শুধু 'ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি' অথবা শুধু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' না বলে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ছ্বলাত-সালাম উভয়টি পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিভিন্ন স্থানে ওয়াজিব অথবা গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব হিসাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ছ্বলাত (দরূদ) পেশ করতে বলা হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহি. স্বীয় "জালাউল আফহাম" কিতাবে একচল্লিশটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। শুরুতেই তিনি বলেছেনঃ প্রথম স্থান হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, আর তা হলো, ছ্বলাতের শেষ বৈঠকে। সকল উলামাগণ তা শরী'আত সম্মত হওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। তবে ছ্বলাতে তা ওয়াজিব কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

এরপর রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **উপর** ছ্বলাত **পেশের** আরো **স্থানগুলো হচ্ছেঃ** দুয়া কুনুতের শেষে, জুমআর খুৎবা-দুই ঈদের খুৎবা এবং সলাতুল ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার খুৎবায়, মুয়াজ্জিনের আযানের জওয়াব দেয়ার পর, যে কোন দুয়া করার সময়, মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময়, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম উল্লেখের সময় ইত্যাদি। এরপর তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ছ্বলাত পেশের চল্লিশটি ফযিলত/উপকারীতা উল্লেখ করেছেন। **তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ**

১। আল্লাহর আদেশ মানা হয়।

২। একবার রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর দরূদ/ ছ্বলাত পাঠের বিনিময়ে বান্দা দশবার আল্লাহর রহমত লাভ করে থাকে।

৩। দুয়ার শুরুতে রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর দরূদ/ ছ্বলাত পেশ করলে ঐ দুয়া কবুলের আশা করা যায়।

৪। যে ব্যক্তি রসূলের উপর ছ্বলাত পেশ করে তার জন্য অসীলাহ্ তলব করবে এটা ঐ ব্যক্তির জন্য রসূলের শাফা'আত লাভের কারণ হবে।

৫। রসূলের প্রতি দরূদ/ ছ্বলাত পেশ গুনাহ মোচনের কারণ।

৬। রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর ছ্বলাত ও সালাম পেশকারী ব্যক্তি তার জওয়াব (উত্তর) পেয়ে থাকেন।

অতএব, সম্মানিত নাবীর উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আমীন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

في فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا غُلُوّ

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের মর্যাদা, তাদের জন্য করণীয় ও বর্জনীয়-আহ্‌ল আল-বাইতের ব্যাপারে সঠিক নীতিমালা

আহলে বাইত হলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারবর্গ যাদের প্রতি সদাক্বা/দান গ্রহণ হারাম। তারা হলেনঃ আলী, জা'ফার, আক্বীল এবং আব্বাস রা. এর পরিবারবর্গ, হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানাদি এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিণী ও কন্যাগণ। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: ٣٣]

হে রসূলের পরিবারবর্গ আল্লাহ্ কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং পুতঃপবিত্র রাখতে চান। *আল্ আহযাব ৩৩:৩৩।*

ইমাম ইবনে কাসীর রহি. বলেনঃ যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে সে নিশ্চিত জানতে পারবে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণ আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: ٣٣]

হে রসূলের পরিবারবর্গ আল্লাহ্ কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্র দূর করতে এবং পুতঃপবিত্র রাখতে চান। *আল্ আহযাব ৩৩:৩৩।*

কেননা বর্নণা ভঙ্গি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্নীগণের পক্ষেই কথা বলে। অর্থাৎ তারা রসূলের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য এ সংক্রান্ত সকল আলোচনার পর বলা হয়েছেঃ

{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا}

আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্ম দর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন। *সূরা আল্ আহযাব ৩৪।*

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্বীয় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কুরআন হাদীছের যা কিছু তোমাদের গৃহে নাযিল হয় সে অনুযায়ী তোমরা আমল করো। ক্বাতাদা রা. সহ একাধিক মুফাসসির পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

সকল মানুষদের মাঝে তোমরা যে নিয়ামতের দ্বারা বিশেষিত হয়েছো তা স্মরণ করো। আর সে নিয়ামত হলোঃ সকল মানুষ ব্যতীত কেবল মাত্র তোমাদের গৃহে ওহী নাযিল হয়। আবূ বকর সিদ্দীক্ব রা. এর কন্যা আয়িশা সিদ্দীক্বা রা. এ ব্যাপক নিয়ামতের জন্য অধিক উপযোগী ছিলেন। কারণ রসূলের ভাষ্য অনুযায়ী তার পত্নীগণের মধ্যে কেবল আয়িশা রা. এর বিছানাতেই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ওহী নাযিল হয়েছিল।

কতেক উলামা রহি. বলেছেনঃ কারণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা রা. ব্যতীত অন্য কোন কুমারী নারীকে বিবাহ করেননি এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ তার বিছানায় ঘুমাননি। (অর্থাৎ আয়িশা রা. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করেননি, রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সকল স্ত্রীর আগে অন্য স্থানে বিবাহ হয়েছিল)।

সঙ্গত কারণেই আয়িশা রা. উপরোক্ত বিশেষণ এবং উঁচু মর্যাদায় বিশেষিত হওয়া উপযুক্ত হয়েছে। তবে রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্নীগণ যখন তার পরিবারের আওতাভূক্ত হয়েছেন তখন তার নিকটাত্মীয়গণ আহলে বাইতের অধিক হক্বদার।[১২৩] তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারকে ভালবাসেন, তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের ক্ষেত্রে বর্ণিত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসিয়তের হেফাযত করেন। কারণ গাদিরে খুমের (একটি স্থানের নাম) দিন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

[أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي] (صحيح مسلم (٢٤٠٨)

আমার পরিবারবর্গের ক্ষেত্রে আমি তোমাদিগকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।[১২৪]

১২৩. তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে গৃহিত।
১২৪. ছ্বহীহ মুসলিম ২৪০৮।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারকে ভালবাসেন এবং সম্মান করেন। কারণ এতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসা এবং সম্মান করা হয়।

তবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারকে ভালবাসার জন্য শর্ত হল: তাদের পূর্ববর্তীগণ যেমন সুন্নাতের অনুসারী এবং দীন ইসলামের উপর অটল ছিলেন সে রকম আহলে বাইতের যারা এটা মেনে চলবে তাদেরকে ভালবাসতে এবং সম্মান করতে হবে। তাদের পূর্ববর্তীগণের দৃষ্টান্ত হল: আব্বাস রা. এবং তার সন্তানাদি, আলী রা. এবং তার সন্তানাদি। অপর দিকে আহলে বাইতের কেউ যদি সুন্নাতের বিরোধীতা করতঃ দীন ইসলামের উপর অটল না থাকে তবে আহলে বাইত হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখা জায়িয নয়।

অতএব, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হলো মধ্যমপন্থা ও ইনসাফ ভিত্তিক। তারা আহলে বাইতের মধ্যে দীনদার ও ইসলামের উপর অবিচল ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন। অপর দিকে আহলে বাইতের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও দীন বিমুখ ও সুন্নাতের বিরোধী হলে তার সাথে আহলুস সুন্নাহ নিজেদের বন্ধুত্ব ছিন্ন করেন। দীনের উপর অবিচল না থাকলে আহলে বাইতের সদস্য এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটত্মীয় হয়েও কোন উপকার হবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا (صحيح البخاري (٢٧٥٣)

আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} আপনি স্বীয় নিকটত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন। *সূরা আশ্ শুআরা ২১৪।* তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন: হে কুরাইশ সম্প্রদায় (অথবা অনুরূপ শব্দ তিনি বলেছিলেন) তোমরা তোমাদের জীবনকে ক্রয় করে নাও। (অর্থাৎ শিরকের পথ পরিত্যাগ করে তাওহীদের পথ ধরে সে অনুযায়ী

আমল করে জান্নাতের হক্বদার হয়ে জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচাও)। আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ব্যাপারে আমি আপনাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আব্দুল্ মুত্তালিব আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির ক্ষেত্রে আমি আপনার কোন উপকার করতে পারব না। হে রসূলের ফুফু সফিইয়্যাহ্, আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতিমাহ্ বিনতে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুমি আমার সম্পদ হতে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। কারণ, আমি আল্লাহর দরবারে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।[১২৫]

অপর হাদীছে বলা হয়েছে:

(مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ) صحيح مسلم (٢٦٩٩)

যার আমল কাউকে পিছনে ফেলে দেয় তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না।[১২৬]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের ব্যাপারে রাফেযী-শিয়াদের নীতি থেকে মুক্ত। অতিরঞ্জণ করে রাফেযীরা আহলে বাইতের কতেক সদস্যকে নিষ্পাপ বলে দাবী করে।

আহলে বাইতের যারা সঠিক দীনের উপর অবিচল ছিলেন তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ও তাদেরকে দোষারোপকারী নাওয়াসিবদের নীতি থেকেও আহলুস ওয়াল জামা'আত নিজেদেরকে মুক্ত রাখেন।

আহলে বাইতের মাধ্যমে অসীলাহকারী এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাদেরকে মা'বূদ হিসাবে গ্রহণকারী বিদ'আতী ও অপসংস্কৃতিতে বিশ্বাসীদের নীতি থেকেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত মুক্ত।

অতএব, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এ বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী এবং সঠিক পথের পথিক। এ বিষয়ে তারা বাড়াবাড়ি ও ঘাটতি করেন না। তারা আহলে বাইত ও অন্যান্যদের অধিকারের ক্ষেত্রে কমতি ও সীমালংঘন করেন না। আহলে বাইতের মধ্যে সঠিক পথের উপর অবিচল ব্যক্তিবর্গও নিজেদের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জণ করাকে অপছন্দ করেন এবং সীমালংঘনকারীদের থেকে নিজেদেরকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করেন।

---

১২৫. ছ্বহীহ বুখারী ২৭৫৩, ৪৭৭১।
১২৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯।

যারা আলী রা. এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. ও তাদের হত্যা করাকে সম্মতি দিয়েছিলেন। তবে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাদেরকে আগুন দিয়ে না জ্বালিয়ে তরবারী দিয়ে হত্যা করতে হতো। সীমালংঘনকারীদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা'কেও আলী রা. হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে পালিয়ে আত্মগোপন করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم

ছাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা, তাদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় বিশ্বাস এবং তাদের মাঝে সংঘটিত বিবাদ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান

১। ছাহাবী দ্বারা উদ্দেশ্য কি এবং তাদের বিষয়ে কিরূপ বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব: ছাহাবাতুন (صحابة) শব্দটি আরবী ছাহাবী শব্দের বহু বচন। আর ছাহাবী হলেন: ঐ ব্যক্তি যিনি রসূলের প্রতি ঈমানের সহিত তার সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং ঈমানের উপরই মৃত্যু বরণ করেছেন। তাদের ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব তা হলো: তারা হলেন, উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের যুগও সর্বোত্তম যুগ।

কারণ, তারা এ উম্মাতের সর্বাগ্রের লোক, তারা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথী হওয়া, তার সাথে একত্রে জিহাদ করা, তার নিকট হতে শরী'আত গ্রহণ করতঃ তাদের পরবর্তীগণের নিকটে তা পৌঁছে দেয়াসহ আরো বিভিন্নগুণে বিশেষিত ও বিশিষ্ট ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিজ্ঞানময় কুরআনে তাদের প্রশংসা করে বলেন,

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: ١٠٠]

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ। যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। *সূরা আত-তাওবা ১০০।*

অপর স্থানে রব্বুল আলামীন বলেন,

{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: ٢٩]

মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে-চাষীকে আনন্দে অভিভুত করে-যাতে আল্লাহ্ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। *সূরা আল ফাত্হ ২৯।* আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে বলেন,

{لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: ٨-٩]

এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ্ ও তার রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। *সূরা আল্ হাশ্র ৮-৯।*

পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাজির ও আনসার ছাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করেছেন। তাদেরকে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দিয়েছেন যে, ছাহাবাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তাদের

জন্য জান্নাত (উদ্যানসমূহ) প্রস্তুত করে রেখেছেন: আর তারা পরস্পর দয়াপরবশ, কাফেরদের প্রতি বড় কঠোর, তারা অধিক রুকু-সিজদাহ্‌কারী (অধিক ছ্বলাত আদায়কারী), তাদের হৃদয় অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার, ঈমান ও আনুগত্যের চিহ্ন দ্বারা সবার মাঝে পরিচিত, আল্লাহ তা'আলা তাদের মাধ্যমে স্বীয় কাফের শত্রুদের অন্তর জ্বালা সৃষ্টির জন্য তাদেরকে স্বীয় নাবীর সাথী হিসাবে বেছে করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা একথাও বলেছেন যে, মুহাজির ছাহাবীগণ মহান আল্লাহর জন্য, তার দীনের সাহায্যার্থে, তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় নিজেদের মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তারা সত্যবাদী।

আনসার ছাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন: তারা হলেন, দারুল হিজরাহ্‌ মদীনার অধিবাসী, মুহাজির ছাহাবীগণসহ দীনের সার্বিক সহযোগী এবং স্বচ্ছ ঈমানের অধিকারী।

আনসারগণ তাদের মুহাজির ভাইদেরকে ভালবাসেন, তাদেরকে নিজেদের জীবনের উপর প্রাধান্য দেন, তারা মুহাজিরগণের সহযোগী, তাদের হৃদয় কৃপণতা থেকে মুক্ত, সঙ্গত কারণেই তারা সফলতা অর্জন করেছেন। এ হলো ছাহাবায়ে কিরামের কিছু ফযীলত ও মর্যাদার নমুনা। তাছাড়া ইসলাম গ্রহণ, জিহাদ ও হিজরতে অগ্রগামীতার ভিত্তিতে প্রত্যেক ছাহাবীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যা দ্বারা তারা একে অপরের উপর মর্যাদাবান ও বৈশিষ্টের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা সকল ছাহাবীগণের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আমীন।

সর্বশ্রেষ্ঠ ছাহাবী হলেন চার খলীফাহ: আবু বাক্‌র, উমার, উসমান এবং আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। অতঃপর দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর অবশিষ্টগণ, তারা হলেন: উপরের চারজন (আবু বাক্‌র, উমার, উসমান এবং আলী), ত্বলহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, আবূ উবাইদাহ্‌ ইবনে জার্‌রাহ্‌, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনে যাইদ।

মুহাজির ছাহাবীগণ আনসার ছাহাবায়ে কিরামের উপর মর্যাদাবান। এর পরের মর্যাদায় রয়েছেন বদরী ছাহাবায়ে কিরাম এবং বাইয়াতে রিদ্বওয়ানের (হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যারা তথায় একটি গাছের নিচে রসূলের হাতে হাত রেখে বাই'আত করেছিলেন) সদস্য বৃন্দ। এরপর যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের জন্য জিহাদ করেছেন তারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী ও জিহাদকারীদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।

২। ছাহাবীগণের মাঝে সংঘটিত লড়াই ও গোলযোগের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতি:

গোলযোগের কারণ: ইয়াহূদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ইয়ামানের আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা নামী এক ইয়াহূদী শয়তান ও প্রতারণাকারী ধোঁকাবাজকে ইসলামের মাঝে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইসলামে প্রকাশ করলেও ভিতরে সম্পূর্ণ তার উল্টো ছিল। এ দুষ্ট ইয়াহূদী তার কুটিল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশিদার তৃতীয় খলীফা উসমান ইবনে আফ্ফান রা. এর বিরুদ্ধে তার হিংসা, ক্রোধ ও বিষবাষ্প ছড়াতে থাকে।

এ শয়তান তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদ রটাতে থাকে। ফলে স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন, দুর্বল ঈমান এবং কলহ ও বিবাদ প্রিয় কিছু লোক তার মাধ্যমে ধোকাগ্রস্থ হয়ে তার দলে শরীক হয়। পরিশেষে এ চক্রান্তের শিকার হয়ে সঠিক পথে সদা অবিচল ন্যায় পরায়ণ খলীফাহ উসমান ইবনে আফ্ফান রা. অত্যাচারিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তার শাহাদাতের পরেই মুসলমানদের মাঝে মতানৈক্য শুরু হয়। এ ইয়াহূদী এবং তার দোসরদের প্ররোচণায় ফিৎনার আগুন জ্বলে উঠে এবং ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছাহাবাগণের মাঝে মতানৈক্য ও সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে।

আক্বীদাহ ত্বহাবিয়্যার ব্যাখ্যাকার বলেন: রাফেযী-শিয়া মতবাদের মৌলনীতি প্রণয়ন করে একজন মুনাফিক্ব এবং যিন্দীক্ব (প্রকাশ্যে ইসলামের দাবীদার কিন্তু অন্তরে কুফরী বিদ্যমান) ব্যক্তি। তার ইচ্ছা ছিল দীন ইসলামের মূলোৎপাটন এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নিন্দা ও কুৎসা রটনা করা। উলামাগণ রহি. এরূপই উল্লেখ করেছেন।

কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা যখন বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার উদ্দেশ্য ছিল স্বীয় জঘণ্য ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামকে নষ্ট করা। যেমন "বুলিস" নামক এক ইয়াহূদী খ্রিষ্টান ধর্মকে নষ্ট করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা দরবেশী ও তাপসী জাহির করে ভাল কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করা শুরু করে। আর এ দরবেশীর আড়ালে চক্রান্ত করে সে ফিৎনার সৃষ্টি করে উসমান রা. কে হত্যা করে।

তারপর সে কুফাতে আগমন করে আলী রা. এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি এবং তাকে সাহায্য করার কথা প্রকাশ করতে লাগল। যাতে সে এ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করতে সক্ষম হয়। আলী রা. এর নিকটে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবাকে হত্যা করতে বলেন। তখন সে ক্বারক্বীসে পলায়ন করে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবার কুকীর্তির কালো অধ্যায় ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ রহি. বলেন:

فلما قتل رضي الله عنه تفرقت القلوب وعظمت الكروب وظهرت الأشرار وذل الأخيار وسعى في الفتنة من كان عاجزا عنها وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي لكن كانت القلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة فلم تتفق الكلمة ولم تنتظم الجماعة ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير ودخل في الفرقة والفتنة أقوام وكان ما كان. (مجموع الفتاوى – ٢٥/٣٠٤-٣٠٥)

উসমান রা. কে হত্যার পর মানুষের হৃদয়সমূহ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বিপদাপদ বড় কঠিন হয়ে দেখা দিল। বিভিন্ন প্রকার খারাপি প্রকাশিত হয়ে ভাল লোকেরা লাঞ্ছিত হতে লাগলেন। যারা ফিৎনা ছড়াতে পারছিল না তারা বিভিন্ন ফিৎনা-ফাসাদ ছড়াতে জোর প্রচেষ্টা ব্যয় করতে লাগল। যারা কল্যাণ এবং সততা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তারা অপারগ হয়ে গেলেন। তদুপরি তারা বুক ভরা আশা নিয়ে আলী ইবনে আবূ তালিব রা. এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তিনি ঐ সময় পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং খেলাফতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য ছিলেন। কিন্তু মানুষের অন্তরসমূহ দ্বিধা-বিভক্ত ও ফিৎনার আগুন প্রজ্বলিত থাকায় তাওহীদী কালিমার নিচে সবাইকে একত্রিত করতঃ একটি সুশৃঙ্খল জামা'আত তৈরী করা সম্ভবপর হয়নি। খলীফা আলী রা. এবং উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ জাতির যে কল্যাণ করতে চেয়েছিলেন তা তারা করতে সক্ষম হননি। এই দলাদলি এবং ফিৎনাতে বিভিন্ন ক্বওম ও জাতি অংশ গ্রহণ করে ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে।[১২৭]

আলী এবং মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এর মাঝে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণকারী ছাহাবীদের অজুহাত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

و مُعاوِيةُ لَمْ يدّعِ الخِلافة ، ولَمْ يُبايعْ لهُ بِها حيْن قاتل علِيًّا، ولَمْ يُقاتِلْ على أنّهُ خلِيفةٌ ، ولا أنّهُ يسْتحِقُّ الخِلافة ، ويُقِرُّون لهُ بِذلِك ، وقدْ كان مُعاوِيةُ يُقِرُّ بِذلِك لِمنْ سألهُ عنْهُ ، ولا كان مُعاوِيةُ وأصْحابُهُ يروْن أنْ يبْتدُوا علِيًّا وأصْحابهُ بِالْقِتالِ ، ولا يعْلُوا ، بلْ لمّا رأى علِيٌّ

---

১২৭. মাজমূউল ফতোওয়া ২৫/৩০৪-৩০৫।

رضي الله عنه وأصْحابُهُ أنّهُ يجِبُ عليْهِمْ طاعتُهُ ومُبايعتُهُ, إذْ لا يكُون لِلْمُسْلِمِيْن إلّا خلِيفةٌ واحِدٌ, وأنّهُمْ خارِجُون عنْ طاعتِهِ يمْتنِعُون عنْ هذا الْواجِبِ, وهُمْ أهْلُ شوْكةٍ رأى أنْ يُقاتِلهُمْ حتّى يُؤدُّوا هذا الْواجِب, فتحْصُل الطّاعةُ والْجماعةُ، وهُمْ قالُوا: إنّ ذلِك لا يجِبُ عليْهِمْ, وإنّهُمْ إذا قُوتِلُوا على ذلِك كانُوا مظْلُومِين قالُوا: لِأنّ عُثْمان قُتِل مظْلُومًا بِاتِّفاقِ الْمُسْلِمِين, وقتلتُهُ فِي عسْكرِ عليٍّ, وهُمْ غالِبُون لهُمْ شوْكةٌ, فإذا امْتنعْنا ظلمُونا واعْتدوْا عليْنا، وعلِيٌّ لا يُمْكِنُهُ دفْعُهُمْ, كما لمْ يُمْكِنْهُ الدّفْعُ عنْ عُثْمان; وإنّما عليْنا أنْ نُبايِع خلِيفةً يقْدِرُ على أنْ يُنْصِفنا ويبْذُل لنا الْإِنْصاف،

আলী রা. এর সাথে যুদ্ধের সময় মুয়াবিয়া রা. খেলাফতের দাবী করেননি এবং খেলাফতের জন্য কেউ তার কাছে বাইয়াতও গ্রহণ করেননি। মুয়াবিয়া রা. খলীফা হিসাবে লড়াই করেননি, আর নিজেকে তখন খলীফার যোগ্যও মনে করতেন না, মুয়াবিয়ার সাথীরা তার ব্যাপারে এ বিশ্বাসই করতেন। মুয়াবিয়া রা. কোন এক ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরে উপরোক্ত কথাগুলোই বলেন। মুয়াবিয়া রা. এবং তার সাথীরাও প্রথমে আলী রা. এবং তার দলের সাথে লড়াই শুরু করে তাদের বিরুদ্ধে প্রাধান্য বিস্তার করতে চাননি। বরং যখন আলী রা. এবং তার সাথীগণ দেখলেন যে, মুয়াবিয়া রা. এবং তার সাথীদের উপর ওয়াজিব হলোঃ আলী রা. এর আনুগত্য করা এবং তার নিকটে বাইয়াত গ্রহণ করা। কারণ একই সাথে মুসলমানদের একাধিক খলীফা থাকা ঠিক নয়। অথচ মুয়াবিয়া রা. ও তার সাথীরা আলী রা. এর আনুগত্য স্বীকার করে বাইয়াত গ্রহণ করছে না। তাই আলী রা. তাদের সাথে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে তারা তার বাইয়াত গ্রহণ করতঃ আনুগত্য করে এবং মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। অপর দিকে মুয়াবিয়া রা. এবং তার সাথীরা বলেন এ বাইয়াত আমাদের উপর ওয়াজিব নয়। এমতাবস্থায় নিহত হলে তারা হবেন মজলুম (অত্যাচারিত)। কারণ, সকল মুসলমানদের ঐক্যমতে উসমান রা. মজলুম অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। আর তার হত্যাকারীরা আলী রা. এর দলে রয়েছে। তারাই আলী রা. এর দলে শক্তিধর ও প্রাধান্য বিস্তারকারী। যখন আমরা আলী রা. এর হাতে বাইয়াত করা থেকে বিরত থাকলাম তখন তারা আমাদের উপর যুলুম করে আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করল। আলী রা. এর পক্ষে তাদেরকে বাধা দেয়া সম্ভবপর ছিল না যেমন, উসমান রা. এর হত্যার ব্যাপারে তিনি তাদেরকে প্রতিহত করতে পারেননি। এমতাবস্থায় আমাদের কর্তব্য

হলো এমন একজন খলীফার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা যিনি আমাদের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।[১২৮]

যে মতবিরোধ এবং ফিৎনার কারণে ছাহাবায়ে কিরামের মাঝে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সে বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতি **দু'টি বিষয়ে সীমাবদ্ধঃ**

প্রথম বিষয়ঃ ছাহাবাগণের মাঝে যে মতবিরোধ ও লড়াই সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে তারা কথা বলা, মন্তব্য পেশ ও দোষ-ত্রুটি খোঁজা থেকে বিরত থাকেন। কারণ এরূপ ঘটনাবলীতে চুপ থাকাই শান্তির পথ। তারা ছাহাবাগণের ব্যাপারে নিম্নোক্ত দু'আ করেন:

{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: ١٠]

তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। *সূরা আল হাশর ৫৯: ১০।*

দ্বিতীয় বিষয়ঃ ছাহাবাগণকে দোষারোপ করে যা কিছু বলা হয়েছে তার প্রতিবাদ ও উত্তর প্রদান করা। তা কয়েকভাবে হতে পারে:

এক। ছাহাবাগণকে দোষারোপ করে বর্ণিত অধিকাংশ রিওয়াতসমূহ বানোয়াট ও মিথ্যা। শত্রুপক্ষ ছাহাবাদের সুখ্যাতিকে ম্লান ও কালিমাযুক্ত করতে তাদের নামে এসব মিথ্যা বানিয়ে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

দুই। এ সকল বর্ণনার অনেকগুলোতে সংযোজন-বিয়োজন করে তার বিশুদ্ধতা নষ্ট করা হয়েছে এবং তাতে মিথ্যা যুক্ত হয়েছে। ফলে এসব বর্ণনাকে গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

তিন। এ বিষয়ে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত থাকলেও তার সংখ্যা খুবই কম। তার পরও এ ক্ষেত্রে ছাহাবাগণের শারঈ ওযর রয়েছে। কারণ এটা ইজতেহাদী বিষয়। এ বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত সঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। মুজতাহিদ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সঠিক হলে তার জন্য দ্বিগুণ ছাওয়াব রয়েছে। আর তিনি যদি

---

১২৮. মাজমূ' ফতোওয়া ৩৫/৭২-৭৩।

ভুলও করেন তবে তার জন্য একভাগ ছাওয়াব রয়েছে এবং তার ভুল আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন। এ বিষয়ে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে- রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

যখন কোন বিচারক ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন তখন তার জন্য দু'টি নেকী রয়েছে এবং যখন বিচার কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে ইজতিহাদ করে ভুল করলেও তার জন্য একটি নেকী লিখা হয়।[১২৯]

চার। ছাহাবাগণ মানুষ ছিলেন, মানুষ হিসাবে তাদের ভুল হতেও পারে। কেননা, ব্যক্তিগতভাবে তারা নিষ্পাপ (পাপমুক্ত) নন। তবে তাদের দ্বারা ভুল হলেও তা মোচনের অনেক দিক রয়েছে:

১। এ ভুল থেকে তারা তাওবা করেছেন। আর বিভিন্ন দলীল দ্বারা এ কথা স্পষ্ট যে, তাওবা সকল গুনাহ ও পাপকে মুছে দেয়।

২। তারা ছিলেন ইসলাম, হিজরত ও অন্যান্য সৎকাজে অগ্রগামী এবং তাদের রয়েছে এমন বিশাল মর্যাদা যা তাদের ভুল-ভ্রান্তি মুছে দেয়াকে আবশ্যক করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤]

নিশ্চয় নেকীর কাজসমূহ পাপরাশিকে মুছে দেয়। *সূরা হুদ ১১৪।*

তারা ছিলেন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথী, তারা তার সাথে যুদ্ধ করেছেন। এটা তাদের আংশিক বা ছোট গুনাহসমূকে ঢেকে দেয়।

৩। অন্যদের তুলনায় তাদের নেকীসমূহকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের সমতুল্য কেউ হতে পারে না।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী দ্বারা প্রমাণিত তারা হলেন, সর্বোত্তম সোনালীর যুগের লোক। তাদের কারো এক মুদ (৫১০ গ্রাম) পরিমাণ দান অন্যদের ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দানের চেয়েও উত্তম।[১৩০]

---

১২৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৫২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৬।
১৩০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৪০।

আল্লাহ তা'আলা সকল ছাহাবাগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকেও তিনি সন্তুষ্ট করুন। আমীন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহি. বলেনঃ সকল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এবং দীনের ইমামগণ কোন ছাহাবী, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার ও নিকটাত্মীয়, অগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী এবং অন্য কাউকে নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করেন না। বরং তাদের বিশ্বাস উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ভুল হতে পারে।

তাওবা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপরাশি মোচন এবং মর্যাদা উঁচু করে থাকেন। অনেক সময় মোচনকারী ভাল কাজসমূহ বা অন্য কোন কারণেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (٣٣) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٣٤) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الزمر: ٣٣ - ٣٥]

যারা সত্য নিয়ে আগমন করছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে; তারাই তো আল্লাহ্ ভীরু। তাদের জন্যে পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার। যাতে আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন। *সূরা আয্ যুমার ৩৩-৩৫।*
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ} [الأحقاف: ١٥، ١٦]

অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম। আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দকর্মগুলো মার্জনা

করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সে সত্য ওয়াদার কারণে যা তাদেরকে দেয়া হত। ***সূরা আল্ আহক্বাফ ১৫-১৬।***

ফিৎনার সময় ছাহাবাগণের মাঝে যে মতবিরোধ ও লড়াই সংঘটিত হয়েছিল সেটাকে আল্লাহর শত্রুরা ছাহাবাগণকে দোষারোপ ও তাদের মানহানির কারণ হিসাবে গ্রহণ করেছে। বর্তমান সময়ের এমন কিছু লেখক এ জঘণ্য পরিকল্পনার উপর কাজ করে যাচ্ছে যারা এমন সব কথা বলে যা তারা জানে না। ফলে তারা নিজেদেরকে রসূলে কারীম এর ছাহাবাগণের মাঝে বিচারক নির্ধারণ করে দলীল-প্রমাণ বিহীন, বরং অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কতোক ছাহাবাকে সঠিকপন্থী এবং কতেককে বাতিলপন্থী বলে সিদ্ধান্ত দেয়। এরা প্রাচ্যের হিংসুক, মতলবী এবং তাদের লেজুর-দোসরদের কথাই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে। ফলে তারা স্বল্প বয়সী ও ইসলামী সংস্কৃতিতে অপরিপক্ক কিছু যুবককে স্বীয় জাতির মর্যাদা সম্পন্ন ইতিহাস এবং উন্নত যুগের সালফে সালিহীন সম্পর্কে সন্দেহে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

যাতে পর্যায়ক্রমে তারা ইসলামকে কলুষিত-দোষারোপ, মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি, সালফে সালিহীনগণের অনুসরণ ও আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি আমল করার পরিবর্তে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার শেষ যামানার লোকদের হৃদয়ে ইসলামের প্রথম যুগের ছাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ জাগাতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: ١٠]

আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে: হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। ***সূরা আল হাশর ৫৯:১০।***

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى

ছাহাবায়ে কিরাম এবং দীনের সঠিক পথের ইমামগণকে গালি দেয়া নিষেধ

এক। ছাহাবায়ে কিরামকে গালি দেয়া নিষেধ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম মূলনীতি হলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীদের ক্ষেত্রে নিজেদের হৃদয় ও জিহ্বাকে মুক্ত রাখা। অর্থাৎ ছাহাবাগণের ক্ষেত্রে তারা কোন মানহানিকর কথা বলেন না। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের এ গুণই বর্ণনা করেছেন,

{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: ١٠]

আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে: হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। *সূরা আল্ হাশর ১০।* ছাহাবাগণকে গালি না দিলেই রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনুগত্য করা হয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ (صحيح البخاري (٣٦٧٣)

তোমরা আমার ছাহাবীদিগকে গালি দিও না। কারণ, তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলেও তাদের কারো এক মুদ (৫১০ গ্রাম) বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমতুল্যও পৌঁছতে পারবে না।[১৩১]
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত নিজেদেরকে রাফেযী ও খারেজীদের নীতি থেকে মুক্ত রাখেন। কারণ রাফেযী ও খারেজীরা ছাহাবাগণকে গালি দেয়, তাদের প্রতি

---

১৩১. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, মুসনাদে আহমাদ ১১৬০৮।

বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদের মর্যাদাকে অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশকে কাফির বলে বিশ্বাস করে।

কুরআন হাদীছে বর্ণিত ছাহাবাগণের ফযীলতকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত স্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, ছাহাবাগণ হলেন উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার সর্বোচ্চ যুগের লোক। যেমন- রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُكُمْ قَرْنِي (صحيح البخاري (٢٦٥١)

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ।[১৩২]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতে মুহাম্মাদীয়া তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে এবং একটি দল ব্যতীত সকল দল জাহান্নামে যাবে মর্মে সংবাদ দিলে ছাহাবাগণ এ নাজাত প্রাপ্ত দলটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

((هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم و أصحابي)) رواه الإمام أحمد وغيره.

তারা হলেন ঐসকল লোক যারা আজ আমি এবং আমার ছাহাবাগণ যে মত ও পথের উপর রয়েছি সে পথে চলবে।[১৩৩]

আবূ যুরআহ্ রহি. (তিনি ইমাম মুসলিমের সবচেয়ে সম্মানিত উস্তাদ) বলেন: যখন কোন ব্যক্তিকে কোন ছাহাবী সম্পর্কে কটাক্ষ, কটুক্তি বা তার মানহানীকর মন্তব্য করতে দেখবে তখন জানবে সে ব্যক্তি নিশ্চয় নাস্তিক। আর এটা এজন্য যে, আল্ কুরআন সত্য, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য, আর এসকল সত্য বিষয়গুলো ছাহাবায়ে কিরামগণই আমাদের নিকটে পৌঁছিয়েছেন।

অতএব, যে ব্যক্তি কোন ছাহাবীকে দোষারোপ করে সে মূলতঃ কুরআন সুন্নাহ্কে বাতিল করতে চায়। ফলে উল্টো তার দোষী হওয়াই উপযুক্ত। এব্যক্তির উপরে নাস্তিকতা ও পথভ্রষ্টতার হুকুম লাগানো অধিক বিশুদ্ধ ও উপযোগী।

আল্লামা ইব্নে হামদান "নিহাইয়াতুল মুবতাদিঈন" গ্রন্থে বলেন: যে ব্যক্তি কোন ছাহাবীকে গালি দেয়া হালাল মনে করবে সে কাফির। আর যদি হালাল মনে না করে কোন ছাহাবীকে কেউ গালি দেয় তাহলে সে ফাসিক্ব। তার থেকে অপর বর্ণনাতে এসেছে ছাহাবায়ে কিরামকে গালি দাতা কাফির।

---

১৩২. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৫১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৩৫, নাসাঈ হা/৩৮০৯।
১৩৩. হাসান: তিরমিযী হা/২৬৪১, মুসতাদরাক হাকিম ৪৪৪।

আর যে ব্যক্তি কোন ছাহাবীকে ফাসিক্ব বা কাফির বলবে অথবা তার ধর্মীয় বিষয়ে তাকে দোষারোপ করবে তাহলে সে কাফির এতে কোন সন্দেহ নেই।[১৩৪]

দুই। উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার সঠিক পথের অনুসারী কোন আলিমকে গালি দেয়া নিষেধ

ছাহাবায়ে কিরামের পর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেন এ উম্মাতের সঠিক পথে অবিচল ইমামগণ। তারা হলেন, তাবিঈনগণ এবং মর্যাদাপূর্ণ যুগে তাদের অনুসারীগণ। এর পরের স্থানে রয়েছেন তাবে তাবিঈনগণের পরের যুগে যারা এসেছেন এবং সঠিকভাবে ছাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: ١٠٠]

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *সূরা আত-তাওবা ৯:১০০*

অতএব, ছাহাবাগণকে কটাক্ষ করা এবং তাদেরকে গালি দেয়া জায়িয নয়। কারণ, তারা হিদায়াত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥]

যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্য স্থান। *সূরা আন-নিসা ৪:১১৫।*

---

১৩৪. শরহে আক্বীদাতুস্ সাফ্ফারীনী ২/৩৮৮-৩৮৯।

আক্বীদাতুত্ ত্বহাবিয়ার ব্যাখ্যাকার বলেনঃ

আল্লাহ্ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ভালোবাসা রাখার পর মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। কুরআনুল কারীমে এমনটিই বলা হয়েছে। বিশেষতঃ যারা নবীগণের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী (উলামাগণ)। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের তারকা সমতুল্য করেছেন। যাদের মাধ্যমে জল ও স্থলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায়। মুসলমানগণ তাদের হিদায়াত প্রাপ্ত ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

কারণ তারা হলেন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাতের মাঝে তার খলীফা বা প্রতিনিধি এবং তার মৃত সুন্নাতগুলোকে জীবিতকারী। তাদের দ্বারা আল্লাহর কিতাব কুরআন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারাও কুরআনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআন তাদের কথা বলেছে এবং তারাও কুরআন নিয়ে কথা বলেছেন। তারা সকলেই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করা আবশ্যক ও অপরিহার্য বিষয়ে নিশ্চিত একমত। অপর দিকে তাদের কারো কোন কথা যদি ছ্বহীহ হাদীছের বিপরীত হয় তবে তা পরিত্যাগে ঐ ছাহাবীর কোন না কোন ওযর বা কৈফিয়ত রয়েছে। **আর সে ওযরগুলো তিন ধরণের হতে পারেঃ**

১। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বলেছেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

২। তিনি এ বিশ্বাস করতেন না যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা দ্বারা এ মাস'আলা উদ্দেশ্য করেছেন।

৩। তিনি উক্ত মাস'আলায় এ বিশ্বাস করতেন যে, এ বিধান মানসূখ (রহিত) হয়েছে।

ছাহাবাগণ আমাদের অগ্রবর্তী হওয়া, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা আমাদের নিকটে পৌঁছানো এবং তার অস্পষ্ট বিষয়াবলী আমাদের নিকটে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তারা আমাদের উপর মর্যাদাশীল ও দয়া পরবশ। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী মুমিনদের সম্পর্কে বলেনঃ

{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: ١٠]

আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। *সূরা আল্ হাশর ৫৯:১০।*

ইজতিহাদী বিষয়ে কোন আলেমের পক্ষ থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার দরুন তার সম্মানহানী করা বিদ'আতীদের কাজ। এটা দীন ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি, মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা তৈরী, উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার পরবর্তী লোকদেরকে পূর্ববর্তী লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা, যুবক এবং আলিমগণের মাঝে বিরোধ প্রসারের জন্য ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত। যেমনটি আজ বর্তমান সমাজে পরিলক্ষিত হয়।

অতএব কতেক প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা যেন ফক্বীহ্-মুফতী ও ইসলামী ফিক্বাহ্ এর মানহানী না করে। ইসলামী ফিকাহ্ অধ্যয়ন এবং তাতে যে সত্য ও বিশুদ্ধতা রয়েছে তার মাধ্যমে উপকার গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করা থেকে যেন সাবধান, সতর্ক ও বিরত থাকে। এসকল প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের ফিক্বাহ্ নিয়ে সম্মানবোধ করে এবং স্বীয় আলিমগণকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে।

তারা যেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও পথভ্রষ্ট পথের দাওয়াত দাতাদের মাধ্যমে ধোঁকায় না পড়ে। আল্লাহ্ সকল ভাল কাজে সহায় হোন। আমীন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

البدع

বিদ‘আত পরিচিতি

এ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিদ‘আতের সংজ্ঞা-তার প্রকার ও বিধান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মুসলমানদের জীবনে বিদ‘আতের প্রকাশ এবং তার কারণসমূহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বিদ‘আতীদের ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমার অবস্থান এবং তাদের প্রতিবাদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের নীতি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বর্তমান যুগের কিছু বিদ‘আতের নমুনা:

১। ঈদে মীলাদুন্নাবী বা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বার্ষিকী পালন করা।

২। স্থান, নিদর্শনাবলী এবং মৃত ও জীবিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে বরকত অর্জন।

৩। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিদ‘আতসমূহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

تعريف البدعة – أنواعها – أحكامها

বিদ‘আতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও বিধান

১। বিদ‘আতের সংজ্ঞা (تعريف البدعة): বিদ‘আতের আভিধানিক সংজ্ঞা: বিদ‘আত শব্দটি আরবী اَلْبَدْعُ (আল্ বাদ্উ) শব্দ হতে গৃহিত। যার অর্থ হলো পূর্ব নমুনা ব্যতীত কোন কিছু আবিস্কার করা। যেমন-আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾

পূর্ব কোন নমুনা ছাড়াই আল্লাহ তা‘আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। *সূরা আল-বাক্বারা ২: ১১৭।* অপর আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ)

তুমি বলে দাও, আমি নতুন কোন রসূল নই। *সূরা আল-আহক্বাফ ৪৬: ৯।*

অর্থাৎ আমিই সর্ব প্রথম আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের নিকটে রিসালাত নিয়ে এসেছি এমনটি নয়, বরং আমার আমার পূর্বেও অনেক রসূল (আলাইহিমুস্‌সালাম) এসেছিলেন। বলা হয় অমুক ব্যক্তি একটা বিদ‘আত করেছে, তার অর্থ হলো: সে নতুন একটা পদ্ধতি চালু করেছে যা এর আগে কেউ করেনি।

শাব্দিক অর্থে বিদ‘আত দু’প্রকার:

১। অভ্যাসগত (দুনিয়াবী) বিষয়ে বিদ‘আত। যেমন নব আবিষ্কৃত বস্তুসমূহ, এগুলো বৈধ। কেননা অভ্যাসের ক্ষেত্রে মূল হলো বৈধতা।

২। দীনের ক্ষেত্রে বিদ‘আত, আর এটা হারাম। কেননা এ ক্ষেত্রে আসল হলো তাওক্বীফী বা প্রতিটি বিষয় কুরআন-হাদীছের দলীলের উপর নির্ভরশীল।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ (صحيح البخاري:٢٦٩٧)

যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মের মাঝে এমন কিছু নতুন সংযোজন করে যা তার অন্তর্গত নয় তা পরিত্যাজ্য।[১৩৫] অপর বর্ণনায় এসেছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (صحيح مسلم:١٧١٨)

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের দীনে (ইসলাম) নেই তা প্রত্যাখ্যাত।[১৩৬]

২। বিদ'আতের প্রকারভেদ: দীনের ক্ষেত্রে বিদ'আত দু'প্রকার।

প্রথম প্রকার: কথার ক্ষেত্রে যা আক্বীদাগত বিদ'আত। যেমন জাহ্মিয়্যাহ, মু'তাযিলা, রাফিদা এবং অন্যান্য ভ্রষ্ট দলসমূহের কথা ও আক্বীদাসমূহ।

দ্বিতীয় প্রকার: ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ'আত। যেমন এমন বিষয়াবলীর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা যা আল্লাহ্ তা'আলা শরী'আত সম্মত করেননি, এ প্রকার বিদ'আত আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত:

(১) মূল ইবাদতের মাঝে বিদ'আত:

এমন ইবাদত শরী'আতে যার কোন আসল বা অস্তিত্ব নেই। যেমন নতুন কোন ছ্বলাত অথবা শরী'আত বহির্ভূত কোন সিয়াম, অথবা শরী'আত বহির্ভূত কোন ঈদ, যেমন ঈদে মিলাদুন নাবী, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি প্রবর্তন করা।

(২) শরী'আত সম্মত ইবাদতে কোন কিছু বৃদ্ধি করা:

যেমন যুহর অথবা আসরের সলাতে এক রাক'আত বৃদ্ধি করে পাঁচ রাক'আত পড়া।

(৩) শরী'আত সম্মত ইবাদত আদায়ের পদ্ধতিতে বিদ'আত:

---

১৩৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৯৭, আবূ দাউদ হা/৪৬০৬।
১৩৬. ছ্বহীহ্ মুসলিম হা/১৭১৮।

আর তা হলো শরী'আত বহির্ভূত পদ্ধতিতে কোন ইবাদত আদায় করা। যেমন, দলবদ্ধভাবে উঁচু শব্দে যিকির করা অথবা ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের আত্মার উপর এমন কঠোরতা করা যা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতে নেই।

(৪) শরী'আত সম্মত ইবাদতের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করা যা শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নয়ঃ

যেমন ১৫ ই-শা'বানের দিনে সিয়াম পালন এবং রাত্রে ক্বিয়াম (ছ্বলাত আদায়) করা। মূলতঃ সিয়াম ও ক্বিয়াম (রাত্রিকালীন ছ্বলাত) শরী'আত সম্মত ইবাদত। কিন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়কে খাস করতে অবশ্যই দলীলের প্রয়োজন (যা শবে বরাত নামক ইবাদতের ক্ষেত্রে নেই)।

৩। দীনের ক্ষেত্রে বিদ'আতের হুকুম বা বিধানঃ দীনের ব্যাপারে সকল প্রকার বিদ'আত হারাম ও ভ্রষ্টতা। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

দীনের মাঝে তোমরা নতুন কিছু সংযোজন করা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা দীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন জিনিসই বিদ'আত আর প্রত্যেক বিদ'আত হলো গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।[১৩৭]

অপর হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ (صحيح البخاري:٢٦٩٧)

যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মাঝে এমন নতুন কিছু সংযোজন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য।[১৩৮] অপর বর্ণনায় রয়েছেঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (صحيح مسلم:١٧١٨)

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের দীনে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।[১৩৯]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায় দীনের মাঝে প্রত্যেক নতুন জিনিসই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ ইবাদত ও

---

১৩৭. ছ্বহীহঃ আবূ দাউদ হা/৪৬০৭, নাসাঈ ১৫৭৮, ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমা হা/১৭৮৫।
১৩৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৯৭, আবূ দাউদ হা/৪৬০৬।
১৩৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

আক্বীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদ‘আত হারাম বা নিষিদ্ধ। তবে এর প্রকারভেদে নিষিদ্ধতার মাত্রা কম-বেশী হয়ে থাকে।

তার মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফরী। যেমন ক্ববরস্থ ব্যক্তির নৈকট্য লাভের আশায় তার ক্ববরকে তওয়াফ করা, ক্ববরস্থ ব্যক্তির নিকটে দু‘আ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা এবং গুলাতুল (বাড়াবাড়িকারী) জাহমিয়্যাহ্ ও মু'তাযিলাদের উক্তি সমূহ।

আর কিছু বিদ‘আত রয়েছে যা শিরকে নিমজ্জিত করার মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। যেমন ক্ববরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করা, সেখানে ছ্বলাত আদায় ও দু‘আ করা।

কিছু বিদ‘আত রয়েছে যা আক্বীদার ক্ষেত্রে ফাসিক্বী হিসাবে গণ্য। যেমন খারিজী, ক্বাদারিয়াহ্ ও মুরজিয়াদের আক্বীদা এবং উক্তির ক্ষেত্রে বিদ‘আত যা শারঈ দলীলের বিপরীত।

কিছু বিদ‘আত আছে যা পাপকার্য (অবাধ্যতা) হিসাবে গণ্য। যেমন সন্তান না নেয়ার জন্য খাসি করে নেয়া, সূর্যে দাঁড়িয়ে সিয়াম পালন করা এবং সহবাসের চাহিদা নষ্ট করার জন্য খাসি হয়ে যাওয়া।[১৪০]

১৪০. ইমাম শাতুবীর লেখা আল্ ই‘তিসাম গ্রন্থ ২/৩৭।

একটি সতর্কতা: تنبيه

البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة

বিদ‘আতকে হাসানা ও সাইয়িআহ হিসাবে ভাগ করা

যে ব্যক্তি বিদ‘আতকে বিদ‘আতে হাসানা ও সাইয়িআতে (ভালো ও মন্দ বিদ‘আতে) বিভক্ত করবে; সে ভুল করে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদীছের বিরোধীতা করবে: «**فإن كل بدعة ضلالة**» প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা বা গুমরাহী। কেননা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল বিদ‘আতকে ভ্রষ্টতা বলে উল্লেখ করেছেন।

আর কতেক মানুষ কিনা বলছে! প্রত্যেক বিদ‘আত ভ্রষ্টতা নয় বরং এক প্রকার বিদ‘আত রয়েছে যা বিদ‘আতে হাসানা বা উত্তম বিদ‘আত!!!

হাফিয ইবনে রজব রহি. হাদীছে আরবাঈনের (চল্লিশ হাদীছের) ব্যাখ্যায় বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: «**كل بدعة ضلالة**» ‘সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতা’ এটি অল্প কথায় বিস্তৃত তাৎপর্য ও বহুল অর্থবোধক বাকের অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে কোন বিদ‘আতই বাদ পড়েনি। এটা দীন ইসলামের অন্যতম মূলনীতি এবং রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাণী:

﴿مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ﴾

‘আমাদের দীনের অন্তর্গত নয় এমন কিছু যে তাতে সংযোগ করে তা প্রত্যাখ্যাত’ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অতএব যারাই দীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু সংযোজন করে যে ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ নেই; তা ভ্রষ্টতা, দীন তা থেকে মুক্ত।

এ ধরনের বিষয় আক্বীদা (বিশ্বাস), প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য কথা ও কাজসহ সকল মাস‘আলার ক্ষেত্রেই হতে পারে।[১৪১]

---

১৪১. জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ২৩৩ পৃষ্টা।

তারাবীহ ছ্বলাতের ক্ষেত্রে উমার রা. এর উক্তি: [نعمت البدعة هذه] (এটা কতই না উত্তম বিদ'আত) ব্যতীত এ সকল লোকদের (যারা বিদ'আতে হাসানা ও সাইয়িআহ বলে) আর কোন দলীল নেই।

তারা আরো বলেঃ অনেক নতুন জিনিসই করা হয়েছে পূর্ববর্তী সালাফ বা সৎ ব্যক্তিগণ তার বিরোধিতা করেননি। যেমনঃ কুরআন সংকলন করা এবং হাদীস লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি।

এর উত্তর হলঃ ইসলামী শরী'আতে এ সকল কাজের মূল ভিত্তি রয়েছে, তাই তা নতুন নয়, আর উমার রা. এর কথা: ﴿نعمت البدعة هذه﴾ দ্বারা তিনি শাব্দিক অর্থে বিদ'আত বুঝিয়েছেন, শারঈ অর্থে নয়, শরী'আতে যার মূল রয়েছে সে দিকেই ফিরে যেতে হবে। যদি বলা হয় জামা'আতে তারাবীর ছ্বলাত আদায় বিদ'আত, তবে তা শাব্দিক অর্থে বিদ'আত, শারঈ অর্থে নয়।

কেননা, শারঈ অর্থে বিদ'আত হলো: দীনের মাঝে এমন কিছু নতুন সংযোজন করা শরী'আতে যার কোন মূল ভিত্তি নেই। আর কুরআনুল কারীম এক কিতাবে একত্রে জমা করার মূল ভিত্তি ইসলামে রয়েছে। কেননা, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বুরআন লিখার জন্য ছাহাবাগণকে আদেশ করতেন। তবে কুরআন বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ ছিল, তাই কুরআন সংরক্ষণের জন্য ছাহাবাগণ তা একত্রে জমা করেন। আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবাগণকে নিয়ে কয়েক রাত তারাবীর ছ্বলাত জামা'আতে আদায় করেছেন, পরবর্তীতে ফরয হওয়ার ভয়ে তিনি আর তা করেননি।

ছাহাবাগণ রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর পৃথক পৃথকভাবে এ ছ্বলাত আদায় করতেন। পরবর্তীতে উমার রা. তাদেরকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করেন, যেমনটি তারা রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিছনে একত্রে কয়েক রাত ছ্বলাত আদায় করেছিলেন। তাই প্রমাণিত হলো যে একত্রে তারাবীর ছ্বলাত আদায় করা বিদ'আত বা দীনের মাঝে নবাবিষ্কৃত কোন বিষয় নয়।

হাদীছ লিপিবদ্ধ ও সংকলনের মূল ভিত্তিও শরী'আতে বিদ্যমান। যখন কোন ছাহাবী রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট কোন হাদীছ লিখে নিতে চাইতেন তখন তিনি তা লিখে দেয়ার আদেশ দিতেন।

আবূ হুরাইরা রা. নাবীর ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশাতেই হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন। তবে কুরআনের সাথে মিলে যাওয়ার ভয়ে রসূলের জীবদ্দশায়

ব্যাপকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করা নিষেধ ছিল। যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন এ ভয় দূর হয়ে গেল।

কেননা, কুরআন পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল এবং রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকালের পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ সময়ে হাদীস নষ্ট না হয়ে সংরক্ষিত রাখার জন্য মুসলমানগণ হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।

যারা এ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন; কেননা, তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসকে নষ্ট হওয়া ও বাতিলদের বাতুলতা ও অনর্থকতা থেকে সংরক্ষণ করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إليها

মুসলিম সমাজে বিদ‘আতের প্রকাশ ও তার কারণ

১। মুসলিম সমাজে বিদ‘আতের প্রকাশ:

প্রথমত: বিদ‘আত প্রকাশের সময়কাল।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: জেনে রেখো, ইলম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ায় সর্বপ্রথম সাধারণ বিদ‘আত প্রকাশ পায় খোলাফায়ে রাশেদার শেষ যুগে।[১৪২] আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ (سنن أبي داؤد (٤٦٠٧)

তোমাদের যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অতিসত্ত্বর অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার ও হিদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার (চার খলীফার) পথ ও সুন্নাতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে।[১৪৩]

সর্বপ্রথম যে সকল বিদ‘আত প্রকাশ পায় তা হলো:

- ক্বাদরিয়া, মুরজিয়া, শিয়া ও খারিজীদের বিদ‘আত।
- উসমান রা. এর শাহাদাতের পর দলাদলি শুরু হলে হারুরিয়া নামক বিদ‘আতী দলের আবির্ভাব ঘটে।
- ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, জাবির প্রমুখ ছাহাবাগণের শেষ যুগে ক্বাদরিয়া নামক বাতিল দলের আবির্ভাব ঘটে। এর কাছা-কাছি সময়ে মুরজিয়া নামক ফের্কার উদ্ভব হয়।
- উমর ইবনে আব্দুল আযীযের মৃত্যুর পর তাবিঈগণের শেষ যুগে জাহমিয়া নামক দলের প্রকাশ ঘটে। এমনও বর্ণিত আছে যে, উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহি. জাহমিয়াদের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। মূলতঃ খলীফা

১৪২. মাজমুউ'ল ফতোয়া ১০/৩৫৪।
১৪৩. ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৬০৭।

হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের যুগে খোরাসানে জাহমিয়ারা আত্ম প্রকাশ করে।

- হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এ সকল বিদ'আতের সূচনা হয়। তখন অনেক ছাহাবী বেঁচেছিলেন, তারা এ সব বিদ'আত প্রবর্তনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছেন। এরপর মুতাযিলা নামক নতুন দলের প্রকাশ হয়।
- তখন মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন ফিতনা সৃষ্টি হয়। মানুষ মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে বিদ'আত ও প্রবৃত্তির প্রতি আসক্ত হতে শুরু করে। উত্তম তিন যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর সূফীবাদ, ক্ববর পাকাকরণ ও তার উপর গম্বুজ ইত্যাদী নির্মাণের মত বিদ'আতের প্রকাশ ঘটে। এভাবে সময় যত গড়িয়েছে বিদ'আতও বেশী হয়েছে এবং নতুন নতুন আকার ধারণ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ বিদ'আত প্রকাশের স্থান।

বিদ'আত প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলামী শহরগুলোর ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহি. বলেনঃ

বড় বড় শহর যেগুলোতে ছাহাবাগণ বসবাস করেন এবং যেখান থেকে ইলম ও ঈমানের প্রকাশ ঘটে তা পাঁচটিঃ হারামাইন (মক্কা-মদীনা), দুই ইরাক্ব (বসরা-কুফা) এবং শাম (সিরিয়া)।

কুরআন, হাদীস, ফিক্বহ, ইবাদত এবং অন্যান্য ইসলামী মাস'আলা এসকল শহর হতে প্রকাশ পেয়েছে। অপর দিকে মক্কা-মদীনা ব্যতীত এসকল শহর থেকেই মূল বিদ'আত চালু হয়। কুফা থেকে শিয়া এবং মুরজিয়াদের বিদ'আত চালু হয়ে অন্যত্রে তা বিস্তার লাভ করে।

বসরা থেকে ক্বাদরিয়া ও মু'তাযিলা মতবাদ এবং অন্যান্য বাতিল কর্মাদি চালু হয়ে পরবর্তীতে তা অন্যত্র বিস্তার করে। শাম বা সিরিয়াতে নাসাবিয়া ও ক্বাদরিয়াদের প্রাদুর্ভাব ছিল। জাহ্‌মিয়াদের বিদ'আত খোরাসানের দিকে প্রকাশ পায় এবং তা হলো সবচেয়ে খারাপ বিদ'আত। বিদ'আত প্রকাশ হতে নাবীগৃহ বেশ দূরেই ছিল।

কিন্তু উসমান রা. এর শাহাদাতের পর মতভেদ সংঘটিত হলে মদীনাতে হারুরিয়া মতবাদের লোকদেরকে দেখা যায়। তবে মদীনা মুনাওয়ারাহ এ সকল বিদ'আত হতে মুক্ত বা নিরাপদ ছিল। এটা সত্য যে, মদীনাতে কিছু লোক গোপনে বিদ'আত করত তবে তারা লাঞ্ছিত ও নিন্দিত ছিল। যেমন সেখানে ক্বাদরিয়াদের

একটা দল ও অন্যান্য কিছু বিদ'আতপন্থী লোক থাকলেও তারা অপদস্থ ও নিচু হয়েই ছিল।

অপরদিকে কুফাতে শিয়া ও মুরজিয়া, বসরাতে মু'তাযিলা ও নুস্সাকদের (বাতিল পন্থায় ইবাদতকারী) বিদ'আত এবং শাম বা সিরিয়াতে নাসাবিয়াদের বিদ'আত স্পষ্ট ও প্রকাশ্যরূপে ছিল।

ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: দাজ্জাল মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১৪৪] ইমাম মালেক রহি. এর অনুসারীদের পর্যন্ত সেখানে ইলম ও ঈমান স্পষ্ট ছিল। অথচ তারা ছিলেন চতুর্থ শতাব্দীর লোক।[১৪৫]

উত্তম তিন যুগে মদীনাতে প্রকাশ্য কোন বিদ'আত ছিল না এবং দীনের মূলনীতির ক্ষেত্রে সেখান থেকে কোন বিদ'আতের শুচনা হয়নি, যেমনটি অন্যান্য শহর থেকে হয়েছে।

২। বিদ'আত প্রকাশের কারণসমূহ

এতে সন্দেহ নেই যে কুরআন সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরাতেই বিদ'আত ও গোমরাহী হতে মুক্তি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾

এটাই আমার সহজ সরল পথ। তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ ও মতের অনুসরণ করিও না; তাহলে তা তোমাদিগকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। ***সূরা আল্ আনআম ৬: ১৫৩।***

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বিষয়টি ঐ হাদীছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যা ইবনে মাসঊদ রা. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

﴿ خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: "هذا سبيل الله" ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: "وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه" ثم تلا {وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً} إلى آخر الآية [الأنعام: ١٥٣] [صحيح ابن حبان– ٦

১৪৪. ছ্বহীহ বুখারী ১৮৭৯।
১৪৫. মাজমু' ফতোয়া ২০/৩০০-৩০৩।

একদা তিনি আমাদের জন্য একটি দাগ কেটে বা টেনে বললেন: “এটা আল্লাহর পথ”। তার পরে ঐদাগের ডানে-বামে কয়েকটি দাগ টেনে বললেন: আর এ সকল পথ এমন যার প্রতিটির মাথায় একটা করে শয়তান রয়েছে যে নিজের দিকে এবং ঐপথের দিকে মানুষকে আহ্বান করছে, এরপর তিনি আল্লাহর এ বাণী পাঠ করলেন:

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: ١٥٣]

নিশ্চয় এটাই আমার সহজ সরল পথ। তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ ও মতের অনুসরণ করিও না; তাহলে তা তোমাদিগকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে এর অসিয়তই করেন, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।[১৪৬]

অতএব, যারা কুরআন সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তারাই ভ্রষ্টপথে এবং নবাবিষ্কৃত বিদ‘আতসমূহে নিপতিত হবে।

বিদ‘আত প্রকাশের মূল কারণসমূহ

বিদ‘আত প্রকাশের মূল কারণগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে পেশ করা হল:

- দীনের বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা,
- প্রবৃত্তির অনুসরণ,
- বিভিন্ন মত ও ব্যক্তির প্রতি গোঁড়ামী,
- কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতা পোষণ ও তাদের অন্ধ অনুসরণ করা ইত্যাদী।

১৪৬. সূরাহ্ আল্ আনআম আয়াত ১৫৩। ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ ১৫২৭৭, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান ৬ ও হাকিম ৩২৪১, হাসান: সুনানে দারিমী ২০৮।

নিম্নে এ বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আমরা তুলে ধরা হলো:

(ক) দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা:

রিসালাতের যুগ যতই অতিক্রান্ত হয়েছে মুসলিম সমাজ তা থেকে ততই দূরে সরে গেছে। পক্ষান্তরে ইলমের ঘাটতি ও মূর্খতার প্রসার হয়েছে। যেমন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا

তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘজীবি হবে (বেঁচে থাকবে) তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে।[১৪৭]

অন্যত্রে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا (صحيح مسلم – (٢٦٧٣)

আল্লাহ মানুষের নিকট থেকে ইলম ছিনিয়ে নিবেন না। তবে তিনি ইলম ছিনিয়ে নিবেন আলিমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে, এমনকি যখন কোন আলিম বাকী (জীবিত) থাকবে না, মানুষেরা তখন অজ্ঞ ও মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তারা যখন জিজ্ঞাসিত হবে তখন বিনা ইলম বা জ্ঞানে ফতোয়া দিবে, ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং মানুষদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[১৪৮]

ইল্‌ম ও আলিমগণ ব্যতীত বিদ‘আতের মোকাবিলা করা এবং তা সংশোধন করা সম্ভব নয়। যখন ইল্‌ম ও আলিম পাওয়া যাবে না তখন বিদ‘আত নির্দ্বিধায় প্রকাশ ও প্রসার হতে পারবে এবং বিদ‘আতীরাও উদ্যমতা ও শক্তি লাভ করবে।

(খ) প্রবৃত্তির অনুসরণ:

যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে নিজ প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।

---

১৪৭. ছ্বহীহঃ ইবনে মাজাহ ৪৩, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান ৫ ও তিরমিযী ৬৯।
১৪৮. ছ্বহীহ মুসলিম ২৬৭৩, তিরমিযী ২৬৫২।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ }[القصص ٥٠]

অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? *সূরা আল ক্বসাস ২৮: ৫০।* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ } [الجاثية: ٢٣]

আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ্ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? *সূরা আল-জাসিয়া ৪৫: ২৩।*

বিদ'আত হলো অনুসৃত প্রবৃত্তির নির্যাস।

(গ) বিভিন্ন মত ও ব্যক্তির প্রতি গোঁড়ামী:

ব্যক্তি বিশেষ বা কারো কোন মতের প্রতি গোঁড়ামী মনোভাব সঠিক দলীলের অনুসরণ ও সত্য জানার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا}[البقرة : ١٧٠]

আর যখন তাদের বলা হয়, 'তোমরা তাই অনুসরণ করো, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন'। তখন তারা বলে, না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। *সূরা আল্-বাক্বারা ২: ১৭০।*

বর্তমানে গোঁড়া লোকদের ব্যাপারটি এমনই। সূফী ও ক্ববর পূজারীদের কোন দলকে যখন কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ এবং কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী যে আমলের উপর তারা রয়েছে তা পরিত্যাগের দাওয়াত দেয়া হয়, তখন তারা নিজেদের মাযহাব, নেতা ও বাপ-দাদার থেকে দলীল দেয়।

(ঘ) কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য: কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যতা পোষণ ও সামঞ্জস্যতা রক্ষা করণই মানুষকে সবচেয়ে বেশী বিদ'আতে পতিত করে। আবূ ওয়াক্বিদ আল্ লাইসি রা. হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন:

خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط قال : فمررنا بالسدرة فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل {اجعل لنا إلها كما لهم آلهة } قال : إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. (المعجم الكبير ٣/٢٤٤) –

আমরা রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে হুনাইনের যুদ্ধে বের হলাম। আমরা ছিলাম কুফরের কাছা-কাছি সময়ের অর্থাৎ আমরা নতুন মুসলমান ছিলাম। মুশরিকদের একটা বরই গাছ ছিল (গুরুত্বপূর্ণ কাজে গেলে) তার নিকটে তারা দাঁড়াত এবং তাতে নিজেদের অস্ত্রগুলো ঝুলিয়ে রাখত। ঐ গাছটির নাম ছিল যাতু আন্ওয়াত। আমরাও ঐ সফরে একটা কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তখন আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কাফিরদের যেমন একটা যাতু আন্ওয়াত আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ একটা যাতু আনওয়াত বৃক্ষ নির্ধারণ করে দিন। তখন আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ মহান) সেই সত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা পূর্ব অনুসৃত সে পথের কথাই বলছো যা বানী ইসরাঈল মূসা আ. কে বলেছিল। তারা বলতে লাগল, হে মূসা আলাইহিস সালাম:

اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ الأعراف١٣٨]

আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। *সূরা আল-আ'রাফ ৭: ১৩৮।* অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ

অবশ্যই পদে পদে তোমরা পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।[১৪৯]

অত্র হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট যে, কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করাই বাণী ইসরাঈলকে এ জঘন্য বা নিকৃষ্ট আবেদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

আর তা হলো (কাফিরদের মতো) তাদের জন্যও মা'বূদ নির্বাচন করা যাদের তারা ইবাদত করবে। আর ঠিক এ কারণেই কতক ছাহাবাগণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এ আবেদন করতে উদ্দত হন যাতে করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তিনি তাদের জন্য এমন একটি গাছ নির্ধারণ করে দেন যার মাধ্যমে তারা বরকত লাভ করবে।

বর্তমানের বাস্তবতাও একই রকম। অধিকাংশ মুসলিম বিদ‘আত ও শির্কী কর্মে কাফিরদেরই অন্ধ অনুসরণ করছে। যেমন,

- জন্মদিন পালন, বিভিন্ন দিবস ও সপ্তাহ পালন [এরূপ সকল বিদ‘আত ইসলামের শত্রুদের থেকে মুসলিম নামধারী অজ্ঞ ব্যক্তিগণ মুসলিম সমাজে প্রচলন করেছে।]
- বিভিন্ন ধর্মীয় উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানাদি ও স্মরণ সভা পালন
- মূর্তী বা ভাস্কর্য তৈরী, স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, কোন ব্যক্তির মৃত্যু পরবর্তী শোক অনুষ্ঠান করা
- জানাযার বিদ‘আত, ক্ববরের উপর ঘর ও গম্বুজ নির্মাণ করা ইত্যাদী।

---

১৪৯. ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৭০২, মুসনাদে আহমাদ ২১৮৯৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة ومنهج أهل السنة والجماعة في الرّدّ عليهم

বিদ‘আতীদের ব্যাপারে মুসলিম জাতির অবস্থান এবং তাদের প্রতিবাদে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের নীতি

১। বিদ‘আতীদের ব্যাপারে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অবস্থান:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত সর্বদা বিদ‘আতীদের প্রতিবাদ ও তাদেরকৃত বিদ‘আতকে অস্বীকার করে আসছেন। তাদেরকে এবং অন্যান্য মানুষদেরকে এ বিদ‘আত করা থেকে নিষেধ করে আসছেন। আপনাদের জন্য তার কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক। উম্মুদ দারদা রা. বলেন:

دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا (صحيح البخاري ٦٥٠)

একদা আবুদ্দারদা রা. রাগান্বিত হয়ে আমার নিকটে প্রবেশ করলে আমি তাকে বললাম: কিসে তোমাকে রাগান্বিত করেছে? তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাতের মাঝে জামা‘আতে ছ্বলাত আদায় করা ব্যতীত আর কোন আমল অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছি না।[১৫০]

খ। বিদ‘আতীদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর ঘটনা:

عن عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن اني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله الا خيرا قال فما هو فقال ان عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا

১৫০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫০, মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৫০০।

جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه و سلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج (سنن الدارمي – ٢١٠) قال حسين سليم أسد : إسناده جيد

উমার ইবনে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন: যুহরের ছ্বলাতের পূর্বে আমরা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. এর দরজার সামনে বসে থাকতাম। যখন তিনি বের হতেন তখন আমরাও তার সাথে মাসজিদে ছ্বলাত আদায়ের জন্য যেতাম। একদা আমরা ঐভাবে বসেছিলাম, তখন আবূ মূসা আশ‘আরী রা. এসে বললেন: আবূ আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কি বের হয়েছেন না তার বের হতে দেরী হবে? আমরা বললাম: না, তিনি বের হননি, তখন তিনিও আমাদের সাথে তার বের হওয়া পর্যন্ত বসে রইলেন। অতঃপর যখন তিনি বের হলেন তখন আমরা সকলে তার সাথে মসজিদে যাওয়ার জন্য দাঁড়ালাম। আবূ মূসা আশআ'রী রা. বললেন: হে আবূ আব্দুর রহমান, আমি এখনি মসজিদে একটি ঘটনা দেখলাম যা আমার নিকটে অপছন্দনীয় এবং অপরিচিত মনে হয়েছে। আল্লাহর প্রশংসা আমি ভালোই দেখলাম, ইবনে মাসউদ বললেন: সেটা কি? তিনি বললেন: আপনি বেঁচে থাকলে দেখতে পাবেন। আবূ মূসা রা. বললেন: আমি মসজিদে কিছু লোককে দেখলাম বৃত্তাকারে বসে ছ্বলাতের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক বৃত্তে একজন করে ব্যক্তি এবং তাদের সকলের হাতে কাঠি বা

কড়ি রয়েছে। ঐ ব্যক্তি বলছেঃ একশত বার আল্লাহু আকবার বলুন, তখন তারা ঐ কাঁঠি দিয়ে গুনে একশত বার আল্লাহু আকবার বলছে। এরপর সে ব্যক্তি বলছে, একশত বার লা-ইলা-হা বলুন, তখন তারা ঐ নিয়মে তা করছে। এরপর বলছেঃ একশতবার সুবহানাল্লাহ বলুন, তখন তারা কাঁঠি দিয়ে গুণে একশতবার সুবহানাল্লাহ্ বলছে। ইবনে মাসঊদ রা. বললেনঃ আপনি তাদেরকে কি বললেন? তিনি বললেনঃ আপনার রায় বা আদেশের অপেক্ষায় আমি তাদেরকে কিছু বলিনি। ইবনে মাসঊদ রা. বললেনঃ আপনি তাদেরকে নিজেদের খারাপ কর্মগুলো গণনা করতে নির্দেশ দিয়ে তাদের কোন সৎকর্ম নষ্ট হবে না এর যামিন বা যিম্মাদর হলেন না কেন? অতঃপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. মসজিদের দিকে চলা শুরু করলেন আমরাও তার সাথে গেলাম। তিনি মসজিদের ঐ হালকাগুলোর (গোল হয়ে বসাকে হালাকা বলে) নিকটে এসে তথায় দাঁড়িয়ে বললেনঃ তোমরা এসব কি করছ? তারা বললঃ হে আবূ আব্দুর রাহমান এগুলো হলো পাথরখণ্ড যা দিয়ে আমরা তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহ্লীল (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ) এবং তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) গণনা করছি! তিনি বললেনঃ তোমরা তোমাদের গুনাহগুলো গণনা কর। আমি যিম্মাদার হচ্ছি তোমাদের কোন ভালো আমল হারিয়ে যাবে না। ধ্বংস ও সর্বনাশ তোমাদের হে উম্মতে উম্মাদীয়া! তোমরা এত দ্রুত ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়েছো! রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনেক ছাহাবী এখনো বেঁচে আছেন! এ হলো তার কাপড় যা নষ্ট হয়ে যায়নি, তার পান পাত্র ভাঙ্গেনি। (আর তোমরা এতদ্রুত বিদ'আতে লিপ্ত হয়েগেছো)। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ তোমরা যে পথের উপর রয়েছো তা কি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ হতে অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত? না তোমরা বিদ'আত বা পথ ভ্রষ্টতার দরজা উম্মুক্তকারী? তারা বললঃ আল্লাহর শপথ হে আবূ আব্দুর রাহমান ! কল্যাণ ছাড়া আমরা কিছুই চাইনি। ইবনে মাসউদ রা. বললেনঃ অনেক কল্যাণ কামীই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে অর্থাৎ কল্যাণ চায় কিন্তু তা অর্জন করতে পারে না। (তোমাদের অবস্থাও তাই!)। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ একটা জাতি হবে যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। আল্লাহর শপথ সম্ভবত তাদের অধিকাংশ তোমাদের মধ্য থেকেই। এরপর তিনি তাদের থেকে ফিরে গেলেন। আমর ইবনে সালামাহ রা. বলেনঃ নাহ্রাওয়ানের দিন আমি তাদের অধিকাংশকে খাওয়ারিজদের সাথে মিশে আমাদেরকে গালিগালাজ করছে।[১৫১]

---

১৫১. সুনানে দারিমী হা/২১০। হুসাইন সেলিম আসাদ বলেন, হাদীছটির সনদ ভালো।

গ। বিদ'আতীর সাথে ইমাম মালিক রহি. এর ঘটনা:

কোন এক ব্যক্তি ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহি. এর নিকটে এসে বলল: আমি কোথা থেকে ইহরাম বাঁধব? তিনি বললেন: ঐ মিক্বাত (স্থান) গুলো থেকে ইহরাম বাঁধবে যা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারণ করেছেন এবং আমি ঐ সব মিক্বাত থেকেই ইহরাম বাঁধি। তখন ঐ ব্যক্তি বলল: আমি যদি মিক্বাতের চেয়ে দূরবর্তী স্থান হতে ইহরাম বাঁধি? ইমাম মালিক রহি. বললেন: আমি তা জায়িয মনে করি না। লোকটি বলল: এতে আপনি খারাপির কি দেখলেন? তিনি বললেন: এর মাধ্যমে তুমি ফিতনায় পড় এটা আমার পছন্দ নয়। লোকটি বলল: কল্যাণকর কাজ বেশী করাতে আবার কিসের ফিতনা রয়েছে? তখন ইমাম মালিক রহি. বললেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[النور٦٣]

যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিতনা (বিপর্যয়) তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *সূরা আন্-নূর ২৪: ৬৩।*

তুমি এমন এক ফযিলতের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করছ, যা স্বয়ং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অর্জন করতে পারেননি এর চেয়ে বড় ফিতনা বা বিপর্যয় আর কি হতে পারে![152]

এটা একটা উপমা বা দৃষ্টান্ত মাত্র। আলিমগণ যুগে যুগে বিদ'আতিদের বিরোধীতা করে আসছেন। তাই সকল প্রশংসা আল্লাহর।

১৫২. ঘটনাটি আবূ শামাহ্ আবূ বকর আল-খাল্লাল থেকে "আল-বায়িস আলা' ইন্কারিল বিদা' অল হাওয়াদিস" কিতাবের ১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

২। বিদ‘আতীদের প্রতিবাদে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের নীতি:

এক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'তের নীতি কুরআন ও সুন্নাহের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ নীতি সন্তোষজনক, তৃপ্তিকর ও নির্বাককারী (যার পরে আর কোন কথা বলার থাকে না)। তারা বিদ‘আতীদের সংশয়গুলো পেশ করে তা খণ্ডন করেন। সুন্নাতকে অপরিহার্যভাবে গ্রহণ এবং বিদ‘আত ও দীনের মাঝে নবাবিস্কৃত বিষয় থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে তারা কুরআন এবং হাদীছের মাধ্যমে দলীল দেন। এ ব্যাপারে তারা অনেক কিতাবও রচনা করেছেন।

ঈমানের মূলনীতি ও আক্বীদার ক্ষেত্রে তারা আক্বীদার কিতাব সমূহে শিয়া, খাওয়ারিজ, জাহ্‌মিয়্যাহ্‌, মু'তাযিলা, আশ‘আরীদের বিদ‘আতী মতবাদের খণ্ডন ও প্রতিবাদ করেছেন। এ বিষয়ে তারা স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। যেমন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রচনা করেছেন: জাহ্‌মিয়াদের জবাব। অন্যান্য ইমামগণও এ ব্যাপারে কিতাব রচনা করেছেন।

যেমন উসমান ইবনে সাঈদ আদ-দারিমী, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং তার ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়্যিম এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ও অন্যান্য উলামাগণ। প্রত্যেকেই উপরোক্ত বাতিল ফিরকাসমূহ, ক্বরপূজারী এবং সূফীদের জবাবে কিতাব রচনা করেছেন।

বিদ‘আতীদের জবাবে লিখিত কিতাবসমূহ অনেক। এগুলোর মধ্যে প্রাচীন ও সমকালিন কিছু কিতাব নীচে উল্লেখ করা হলো।

পুরাতন কিতাবসমূহ:

১. কিতাবুল ই'তিসাম (ইমাম শাত্বিবী)-**كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي**

২. কিতাবু ইক্বতিযাউস্‌সিরাতুল মুস্তাক্বীম (ইবনে তাইমিয়া)। এ কিতাবের বড় একটা অংশে বিদ‘আতীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে-

كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد استغرق الرد على المبتدعة جزءًا كبيرًا منه

৩. কিতাবু ইনকারিল হাওয়াদিস ওয়াল বিদা' (ইবনে অজ্জাহ)-

كتاب إنكار الحوادث والبدع لابن وضَّاح

৪. কিতাবুল হাওয়াদিস ওয়াল বিদা' (ত্বরত্বুশী)-

كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي

৫. কিতাবুল বায়িস আলা' ইনকারিল বিদা' ওয়াল হাওয়াদিস (আবূ শামাহ্)-

كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة

বর্তমান কিতাবসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

১. কিতাবুল ইবদা' ফী মাযারিল ইবতিদা' (শাইখ আলী মাহফূয)- **كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ**

২. কিতাবুস্ সুনান ওয়াল মুবতাদিআ'তিল মুতাআ'ল্লিক্বাতু বিল আযকার অস সালাওয়াত, (শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আশ্ শুক্বাইরি আল হাওয়ামিদী)- **كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي**

৩. রিসালাতু-ত্তাহযীর মিনাল বিদা' (শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায)- **رسالة التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن باز**

আলহামদুলিল্লাহ্ আজও মুসলিম উলামাগণ বিদ‘আতকে প্রত্যাখ্যান করতঃ পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও, জুম‘আর খুৎবা, সেমিনার এবং বক্তব্যের মাধ্যমে বিদ‘আতীদের প্রতিবাদ করে আসছেন। মুসলমানদেরকে বিদ‘আত বিষয়ে সতর্কীকরণ, বিদ‘আ'তের মূলৎপাটন এবং বিদ‘আতীদেরকে নির্বাক করে দিতে যার বড় ভূমিকা রয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

في بيان نماذج من البدع المعاصرة

বর্তমান যুগে প্রচলিত বিদ‘আতের কিছু নমুনা

১। ঈদে মীলাদুন্নাবী (নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে মীলাদ) অনুষ্ঠান করা।

২। বিশেষ কোন স্থান বা নিদর্শনাবলী, কিংবা কোন মৃত ব্যক্তি বা অনুরূপ কোন কিছুর মাধ্যমে বরকত অর্জন করা।

৩। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিদ‘আত।

বর্তমানে প্রচলিত বিদ‘আত অনেক। শেষ জামানার উপস্থিতি, দীনি জ্ঞানের স্বল্পতা, বিদ‘আত এবং শরী‘আত বিরোধী কর্মের প্রতি আহ্বানকারীদের আধিক্যতা, কাফিরদের অভ্যাস, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণের প্রবণতার কারণে বিভিন্ন প্রকার বিদ‘আতের প্রকাশ ঘটেছে। সর্বোপরি এক্ষেত্রে -

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী,

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

অবশ্য অবশ্যই তোমরা পূর্ববর্তীদের (ইয়াহূদী ও নাসারা-খ্রিষ্টানদের) পদে পদে অনুসরণ করবে।[১৫৩]

১। ঈদে মীলাদুন্নাবী বা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবস উপলক্ষে মীলাদ অনুষ্ঠান করাঃ

এটা খ্রিষ্টানদের ঈসা মাসীহ আ. এর জন্মোৎসব পালনের সাথে সাদৃশ্য রাখে। ফলে দেখা যায় কিছু জাহিল বা মূর্খ মুসলিম এবং পথভ্রষ্ট আলিম প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে অথবা অন্য সময়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবস উপলক্ষে মীলাদ মাহফিল করে থাকে। তারা কেউ মসজিদ, বাড়ী

---

১৫৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩২০, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৯৪।

বা এ অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত স্থানে এ মীলাদ মাহফিল করে থাকে। এ সকল অনুষ্ঠানে অনেক নেতৃস্থানীয় এবং সাধারণ জনতা উপস্থিত হয়।

মূলতঃ খ্রিষ্টানদের ঈসা মাসীহ্ আ. এর জন্মোৎসব পালনের বিদ'আতের সাথে সাদৃশ্য রেখেই তারা এমনটি করে থাকে। এসকল অনুষ্ঠান বিদ'আত তো বটেই, খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন এবং গর্হিত কাজ ও শিরকের মত অমার্জনীয় পাপ থেকেও মুক্ত নয়।

যেমন: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে এমন কিছু কাসিদা (কবিতা) গাওয়া হয় যাতে রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, কখনো তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আহ্বান করা, তার নিকটে সাহায্য চাওয়া পর্যন্ত পৌঁছায়। অথচ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (صحيح البخاري – (٣٤٤٥)

তোমরা আমাকে নিয়ে ঐরকম বাড়াবাড়ি করিওনা যেমনটি নাসারারা ইবনে মারঈয়ামকে (ঈসা আ. নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র, অতএব, তোমরা আমাকে আব্দুল্লাহ্ (আল্লাহর বান্দা) এবং আল্লাহ তা'আলা এর রসূল বলে আখ্যায়িত করবে।[১৫৪]

অনেক সময় এসকল অনুষ্ঠানে নারী পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ, চরিত্র বিনষ্ট এবং মদ পানের মত ঘটনাও ঘটে।

হাদীছে বর্ণিত الإطراء শব্দের অর্থ- প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা, আবার কখনো তারা এ বিশ্বাসও করে যে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। তাই দাঁড়িয়ে সম্মান করা হয়। এ সকল অনুষ্ঠানে আরো যে সকল খারাবি হয়: সম্মিলিত গান গাওয়া, ঢোল বাজানো এবং সূফীদের বিভিন্ন বিদ'আতী যিকির ও কর্মাদি। কখনো তাতে নারী পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ হয় যা ফিৎনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যিনার মতো অপকর্মও ঘটে। এসকল অনুষ্ঠান উল্লেখিত গর্হিত মারাত্বক অপরাধ সমূহ থেকে মুক্ত হয়ে শুধু একত্রিত হওয়া,

---

১৫৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫।

আহার গ্রহণ এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হলেও (যেমনটি তারা বলে থাকে) তা নবাবিষ্কৃত বিদ'আত।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: (দীনের মাঝে) প্রত্যেক নবাবিস্কৃত বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী বা ভ্রষ্টতা।

এসকল অনুষ্ঠান খারাবি বৃদ্ধি হওয়ার কারণও বটে। এসকল অনুষ্ঠানেও ঐ সকল খারাবি ও কুকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে যা অনৈসলামিক এবং বিধর্মীদের অনুষ্ঠান সমূহে সংঘটিত হয়।

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি: মীলাদ মাহফিল বিদ'আত; কেননা কুরআন, সুন্নাহ্, সালফে সালিহীনের আমল এবং উত্তম তিন যুগে তার (মীলাদের) অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। চতুর্থ শতাব্দির পরবর্তী সময়ে মীলাদের উৎপত্তি হয়েছে, শিয়াদের ফাতিমী সম্প্রদায় তার প্রথম প্রচলন ঘটায়।

ইমাম আবূ হাফস তাজুদ্দীন আল ফাকিহানী রহি. বলেন: অতঃপর কিছু সম্মানিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে রবিউল আউয়াল মাসকে কেন্দ্র করে যে সকল কর্মাদি, অনুষ্ঠান, মীলাদ হয়ে থাকে সে বিষয়ে আমাকে বার বার প্রশ্ন করা হয়েছে। ইসলামে এর কোন ভিত্তি (আসল) রয়েছে কি? তাদের উদ্দেশ্য হলো আমি যেন এব্যাপারে তাদেরকে স্পষ্টভাবে জবাব (উত্তর) দেই।

উত্তর: আমার জানামতে কুরআন সুন্নাহয় এর কোন ভিত্তি নেই। উম্মতের নির্ভরযোগ্য, অনুস্মরণীয় এবং পূর্ববর্তীগণের সুন্নাতকে মজবুতভাবে ধারণকারী উলামাগণের কেউ এ আমল করেছেন এরও কোন প্রমাণ নেই। বরং তা বিদ'আত যা বাত্তালুন তথা মিসরের ফাতিমী সম্প্রদায়ের শিয়া লোকেরা আবিষ্কার করেছে। আর কিছু লোক আত্ম প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে একাজ করে যার মাধ্যমে পেটুকদের পেট পূজা করা হয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহি. বলেন: এমনিভাবে কিছু মানুষ মীলাদের ক্ষেত্রে যা আবিষ্কার করেছে, তা হয়তো নাসারাদের ঈসার আ. জন্মোৎসবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে অথবা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসা ও সম্মানার্থে হবে। এটাকে তারা নাম দিয়েছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিনের ঈদ। অথচ রসূলের জন্ম দিনের ব্যাপারে উলামা এবং ঐতিহাসিকগণ একমত নন। (কোন দিন তাঁর জন্ম হয়েছে)। সালফে সালেহীন (পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তিগণ) তা করেননি।

যদি এতে কোন কল্যাণ থাকত তবে তারা আমাদের পূর্বে অবশ্যই তা পালন করতেন। কেননা তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমাদের চাইতে বেশী ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। কল্যাণকর কাজে তারা আমাদের চাইতে বেশী আগ্রহী ছিলেন।

তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য, অনুসরণ, তার আদেশের বাস্তবায়ন, আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে তার সুন্নাতকে জীবিত করণ, তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রচার এবং এক্ষেত্রে অন্তর, হাত এবং জিহ্বা (বক্তৃতা) দিয়ে জিহাদ করা ইত্যাদির মাধ্যমে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালোবাসতেন এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন।

এটাই ছিল পূর্ববর্তী মুহাজির, আনসার এবং সঠিকভাবে তাদের পথ অনুসরণকারীদের নিয়ম বা পদ্ধতি।[১৫৫]

মীলাদ মাহফিলের বিদ'আতের প্রতিবাদে পূর্বে এবং বর্তমানে অনেক কিতাব ও পুস্তিকা রচিত হয়েছে। মীলাদ অনুষ্ঠান করা বিদ'আত এবং ঈসায়ীদের জন্মোৎসবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ উপরন্ত তা মানুষকে অন্যান্য জন্মোৎসব পালনের দিকে ধাবিত করে। যেমনঃ ওলী আউলিয়া, মাশায়েখ এবং নেতাদের জন্মোৎসব পালন করা। এতে করে অনেক খারাবি ও অপকর্মের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে।

২। বিশেষ কোন স্থান বা নিদর্শনাবলী কিংবা মৃত অথবা জীবিত ব্যক্তি বা অনুরূপ কোন কিছুর মাধ্যমে বরকত অর্জন করাঃ

বর্তমানে চলমান বিদ'আতসমূহের মধ্যে রয়েছে, কোন সৃষ্টি জীবের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা, আর এটা পৌত্তলিকতারই একটা বিশেষরূপ ও ফাঁদ। যার মাধ্যমে পেট পূজারীরা সরল মনা লোকদের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করে।

'তাবাররুক' অর্থ বরকত চাওয়া বা প্রার্থনা করা। অর্থাৎ কোন জিনিসে কল্যাণ স্থায়ী ও বৃদ্ধি হওয়া। আর কল্যাণ স্থায়ী ও বৃদ্ধি হওয়া তার নিকটেই প্রার্থনা করতে হবে যিনি তার মালিক এবং তা দিতে সক্ষম। তিনি হলেন মহা পবিত্র মহান রব্বুল আলামীন। তিনিই বরকত নাযিল ও স্থায়ী করেন। মাখলুক্ব (সৃষ্টিজীব) বরকত দিতে, তার অস্তিত্ব দানে এবং বরকতকে স্থায়ী করতে সক্ষম নয়।

---

১৫৫. ইক্বতিযা উসসিরাতুল মুস্তাক্বীম ২/৬১৫-কিঞ্চিত সংক্ষেপিত।

অতএব স্থান, স্মৃতি চিহ্ন এবং জীবিত বা মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে বরকত অর্জন করা বৈধ নয়-হারাম। কেননা যদি কেউ এ বিশ্বাস করে যে, উক্ত জিনিস বা ব্যক্তি বরকত দান করে তবে তা হবে স্পষ্ট শিরক। অথবা যদি বিশ্বাস করে যে, উক্ত জিনিস বা ব্যক্তির যিয়ারত, স্পর্শ বা মাসাহ্ করা আল্লাহর পক্ষ হতে বরকত অর্জনের কারণ তবে তা শিরকের অন্যতম মাধ্যম। অপরদিকে ছাহাবাগণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুল, থুথু এবং শরীরের ঘাম দিয়ে বিশেষভাবে যে বরকত অর্জন করতেন তা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথেই খাস।

ছাহাবাগণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরের বা তার মৃত্যুর পর তার কবরের মাধ্যমে বরকত অর্জন করেননি এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল স্থানে ছ্বলাত আদায় করেছেন বা বসেছেন ছাহাবাগণ বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে সে সকল স্থানে যাননি। এমনিভাবে কোন ওলী-আওলিয়াগণ যে সকল স্থানে ছ্বলাত আদায় করেছেন বা বসেছেন অথবা তাদের বা তাদের কবরের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই বরকত অর্জন করা যাবে না।

কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এসব জিনিসের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা হয়নি, তবে তার যাত বা সত্ত্বার মাধ্যমে বরকত অর্জন করা তার সাথেই খাস। কারণ, তিনি হলেন সাইয়িদুল মুরসালীন, এ ক্ষেত্রে তার সাথে অন্য কোন মানুষের তুলনা চলে না।

ছাহাবা বা তাবিঈগণ কোন সৎ ব্যক্তির জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর তার মাধ্যমে বরকত অর্জন করেননি। যেমন, আবূ বকর, উমার এবং অন্যান্য সম্মানিত ছাহাবাগণ রা.। তারা হেরা গুহাতে ছ্বলাত আদায় বা সেখানে দু'আ করার জন্য যাননি। এমনিভাবে যে তুর পাহাড়ে আল্লাহ তা'আলা মূসা আ. এর সাথে কথা বলেছিলেন অথবা অন্য কোন পাহাড় যার ব্যাপারে বলা হয় তাতে কোন নাবী বা অন্য কেউ অবস্থান করেছিলেন এবং যেখানে কোন নাবীর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে কোন স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে ছাহাবাগণ সে সকল স্থানে যাননি।

অপরদিকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় যে স্থানে সব সময় ছ্বলাত আদায় করতেন সালাফগণের (ছাহাবা ও তাবিঈগণের) কেউ সে স্থানটি স্পর্শ করতেন না এবং তাতে চুমুও খেতেন না। এমনি মক্কাতে যেখানে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বলাত আদায় করেছেন সেখানেও কেউ চুমু খাননি বা তা স্পর্শ করেননি। যে সকল স্থানে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্মানিত দুই পা দিয়ে চলাফেরা করেছেন, যেখানে ছ্বলাত আদায় করেছেন তা স্পর্শ করা ও তাতে চুমু খাওয়া যদি তার উম্মাতের জন্য শরী'আত সম্মত করা না

হয় তবে তিনি ব্যতীত অন্যের ছ্বলাত আদায়ের ও ঘুমার স্থান চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করা কি করে জায়িয হতে পারে!!

অতএব, ইসলামের আলিমগণ স্পষ্টভাবেই জানেন যে, এরূপ কোন জিনিসকে চুমু খাওয়া এবং স্পর্শ বা মাসাহ্ করা রসূলে কারীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরী'আতের কোন অংশই না।[১৫৬] (বরং তা বিদ'আত এবং গুনাহের কাজ যা মানুষকে অনেক সময় জাহান্নাম ওয়াজিবকারী ও আমল বিনষ্টকারী শিরকে পতিত করে)।[১৫৭]

৩। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিদ'আতসমূহঃ

বর্তমান যুগে ইবাদতের মাঝে যে সকল বিদ'আত সংযোজীত হয়েছে তা অনেক। ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো "তাওক্বীফী" তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার উপরই নির্ভর করতে হবে। অতএব দলীল ছাড়া কোন কিছুকে শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ দলীল বিহীন শরী'আত মানা যাবে না। আর যে কাজের দলীল নেই তা বিদ'আত। কেননা - রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (صحيح مسلم :١٧١٨)

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের ইসলামী শরী'আত সমর্থন করে না তা পরিত্যাজ্য।[১৫৮]

১৫৬. ইক্বতিযা উসসিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/৭৯৫-৮০২, তাহক্বীক্ব ডঃ নাসির আল-আক্বল।
১৫৭. ইক্বতিযা উসসিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/৭৯৫-৮০২, তাহক্বীক্ব ডঃ নাসির আল-আক্বল।
১৫৮. ছ্বহীহ মুসলিম ১৭১৮, দারাকুৎনী ৪৫৩৭, মুসনাদে আহমাদ ২৬১৯১।

বর্তমানে দলীলবিহীন যে সকল কাজকে ইবাদত মনে করা হচ্ছে তার সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো-

১। মুখে উচ্চারণ করে ছ্বলাতের নিয়্যাত পাঠ করাঃ

যেমন, নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি এরূপ এরূপ বলা। অর্থাৎ আমি আল্লাহর জন্য বা উদ্দেশ্যে এত রাক'আত ছ্বলাত আদায়ের নিয়ত করছি। এরূপ বলা বিদ'আত। কেননা তা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحجرات :١٦]

বলুন, তোমরা কি তোমাদের দীন সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ জানেন ভূমণ্ডলে এবং নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। *সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: ১৬।*

নিয়্যাতের স্থান অন্তর বা হৃদয়। অতএব তা অন্তরের ইবাদত বা কাজ, জিহ্বা বা মুখে পড়ার বিষয় নয়।

২। ছ্বলাতের পর সম্মিলিত যিকির ও সবাই এক সাথে হাত তুলে দুয়া করাঃ

কেননা, সুন্নাত হলো হাদীছে উল্লেখিত ছ্বলাতের পরের দু'আগুলো প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী পড়বেন।

৩। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, দু'আর পরে এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতে বলা।

৪। মৃত ব্যক্তিদের উপলক্ষ্যে শোক অনুষ্ঠান বা শোক সভা করা, খাবার তৈরী করা, পয়সার বিনিময়ে কুরআন তিলাওয়াত ও তা খতম করা।

তাদের ধারণা এটা সমবেদনা জানানোর অন্তর্ভুক্ত। অথবা এটা মৃত ব্যক্তির উপকারে আসবে! আর উল্লেখিত সব ক'টি কাজই বিদ'আ'ত। সওয়াবের জন্য নয়, বরং গুনাহের কাজ এবং নিজের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে নেয়া শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই। আর আল্লাহ তা'আলাও সে ব্যাপারে কোন দলীল অবতীর্ণ করেননি।

৫। দীনি বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে মিলাদ অনুষ্ঠান করা।

যেমন, ইসরা ও মিরাজ রজনী পালন করা, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরত দিবস উপলক্ষ্যে মীলাদ মাহফিল করা। এ দিবস পালন এবং সে দিন মীলাদ মাহফিল করার কোন মূল ভিত্তি শরী'আতে নেই।

৬। রজব মাসের আমাল:

এমনিভাবে খাস করে যা কিছু করা হয় তা বিদ'আত। যেমন, রজব মাসে বেশী বেশী নফল ছ্বলাত ও সিয়াম আদায় করা। কেননা, অন্য মাস অপেক্ষা রজব মাসের কোন অতিরিক্ত বিশেষত্ব নেই। রজব মাসে ছ্বলাত আদায়, সিয়াম পালন এবং আল্লাহর রাস্তায় কোন জন্তু যবেহ্ করা সহ ইত্যাদি কাজে বেশী ছাওয়াব পাওয়া যায় না।

৭। সূফীদের বিভিন্ন প্রকার যিকির আযকারসমূহ সবই বিদ'আত ও নবাবিষ্কৃত:

কেননা, তাদের মনগড়া যিকিরের শব্দ চয়ন, পঠন-গঠন পদ্ধতি এবং এটার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা সবই শরী'আত সমর্থিত যিকির আযকারের পরিপন্থী।

৮। বিশেষ করে শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত্রে জাগা ও ক্বিয়াম করা:

ছ্বলাত আদায় করা এবং শাবানের ১৫ তারিখে দিনের বেলা সিয়াম পালন করা বিদ'আত। কেননা, শাবানের পনের তারিখ রাত বা দিনের বিশেষ কোন ফযিলত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সাব্যস্ত নেই।

৯। কবরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করা, কবরকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করা:

অর্থাৎ কবরস্থানে ছ্বলাত আদায় করা, যেমনটি অনেক মাজারে দেখা যায়। কবরের মাধ্যমে বরকত অর্জন, কবরস্থ মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে দু'আ করা এবং অনুরূপ অন্যান্য শিরকি উদ্দেশ্যে কবরস্থানে বা কোন পীর-ওলী আওলিয়ার মাজারে যাওয়া।

১০। মহিলাদের কবর যিয়ারত করা।

কারণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারতকারী নারীদের, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারী এবং কবরে বাতিদানকারী লোকদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। উপরোক্ত সব কিছুই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত, অনেক সময় তা শিরক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়।

বিদ'আতের ভয়াবহতা ও ক্ষতিকারক দিক

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, বিদ‘আত হলো কুফরীর মাধ্যম ও পাতানো ফাঁদ। বিদ‘আত হলো দীনের মাঝে অতিরিক্ত কিছু প্রবেশ করানো যা আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরী‘আত সম্মত করেননি। বিদ‘আত কাবীরাহ (বড়) গুনাহ থেকেও মারাত্মক ও ভয়াবহ।

কাবীরা গুনাহ করার চেয়ে বিদ‘আত করাতেই শয়তান বেশী খুশী হয়। কেননা, অবাধ্য বা পাপী ব্যক্তি পাপ করে এবং সে জানে যে, এটা পাপের বা গুনাহের কাজ ফলে সে তা হতে তাওবা করে ফিরে আসে।

অপরদিকে বিদ‘আতী ব্যক্তি যখন বিদ‘আত করে তখন তার এ বিশ্বাসই থাকে যে, উক্ত কাজটি দীনের অংশ এবং ইবাদত যার মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করছে। অতএব সে ঐ বিদ‘আত থেকে তাওবা করে না।

বিদ‘আত সুন্নাতের অপমৃত্যু ঘটায় এবং বিদ‘আতীর নিকটে সুন্নাতী কর্মকান্ড ও আহলুস সুন্নাহকে অপছন্দনীয় ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে। বিদ‘আত মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা হতে দুরে সরিয়ে দেয়। আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি আবশ্যক করে এবং অন্তরের বক্রতা ও ফাসাদ বা অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [الصف : ٥]

অতঃপর তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহও তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ ফাসিক্ব (পাপাচারী) সম্প্রদায় কে পথ প্রদর্শন করেন না। *সূরা আস্-সফ্ফ ৬১: ৫।*

বিদ‘আতীরা উযূ ও ছ্বলাত আদায় করা সত্ত্বেও হাওযে কাওসারের পানি পান করা হতে বঞ্চিত হবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে হাওযে কাওসারের নিকট থেকে তাড়িয়ে দিবেন। হাদীছে এসেছে:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ

إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي (صحيح البخاري ٦٥٨٣-٦٥٨٤)

সাহ্ল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের আগেই হাউযে কাওসারের নিকটে উপস্থিত থাকব। যারা আমার হাউযে কাওসারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তারা সেখান থেকে পানি পান করবে। আর যে ব্যক্তি সেখান থেকে একবার পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। এরপর আমার নিকটে কিছু কওম আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব, তারাও আমাকে চিনতে পারবে! অতঃপর তাদের এবং আমার মাঝে ফেরেশতাগণ বাধার সৃষ্টি করবেন। আবূ হাযিম রহি. বলেন, নুমান ইবনে আবি আইয়্যাশ রহি. আমাকে এমন হাদীস বর্ণনা করতে শুনে বললেনঃ আপনি কি সাহ্ল ইবনে সাদ রা. থেকে এভাবেই শুনেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আবূ সাঈদ খুদরী রা. কে এ হাদীছে একটু অতিরিক্ত সহকারে বর্ণনা করতে শুনেছি। সেখানে রয়েছেঃ ফেরেশতাগণ যখন বাধার সৃষ্টি করবেন, তখন আমি বলবঃ আপনারা এদেরকে বাধা দিচ্ছেন কেন? এরা তো আমার উম্মাত! তখন বলা হবেঃ আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কি কি বিদ'আত বা ধর্মের মাঝে নতুন আমল সৃষ্টি করেছিল!! রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন আমি বলব, আমার পরে যারা আমার দীনে পরিবর্তন করেছিল তারা এখান থেকে দূর হয়ে যাও![১৫৯]

---

১৫৯. ছহীহ বুখারী হা/৬৫৮৩-৬৫৮৪।

বিদ'আতের আরো ভয়াবহ ও ক্ষতিকারক দিক রয়েছে, যেমনঃ

ক) তারা ইসলামের সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে যায়।[১৬০]

খ) বিদ'আতীর আমল গ্রহণ করা হয় না বরং তা প্রত্যাখ্যাত বা পরিত্যাজ্য হয়।[১৬১]

গ) বিদ'আতীরা অন্যের পাপের ভাগী হয়ে থাকে।[১৬২]

ঘ) বিদ'আতীদের বিদ'আতের জন্য সুন্নাত উঠে যায়।[১৬৩]

ঙ) বিদ'আতীদের দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।[১৬৪]

চ) বিদ'আতীকে যারা আশ্রয় দেয় তাদের উপরও আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।[১৬৫]

ছ) বিদ'আতীরা মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল কে কষ্ট দেয়। তাইতো আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তিরও ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১৬০. আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। সূরা আন'আম ৬:১৫৩

১৬১. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৯৭ ও মুসলিম হা/১৭১৮।

১৬২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০১৭, ইবনে মাজাহ হা/২০৩।

১৬৩. ছ্বহীহঃ সুনানে দারিমী হা/৯৯, মিশকাত হা/১৮৮।

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ– إسناده صحيح

কোন জাতী দীনের মধ্যে বিদ'আত চালু করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে সেই পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন। অতঃপর ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সে সুন্নাত ফিরিয়ে দেয়া হয় না। সনদ ছ্বহীহঃ সুনানে দারিমী ৯৯

১৬৪. সিলসিলা ছ্বহীহা হা/১৬২০।

১৬৫. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৭৮।

لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ-

আল্লাহ অভিসম্পাত করেন ঐ ব্যক্তিগণকে যে তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করে, যে কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় এবং যে ব্যক্তি জমীনের (সীমানার) চিহ্নসমূহ পরিবর্তন করে। ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৭৮।

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [الأحزاب : ٥٧]

নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তার রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ বর্ষণ করেন। আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। *সূরা আল আহযাব ৩৩: ৫৭।*

জ) বিদ'আতীরা সুন্নাতের উপর আমলকারী অনেক ব্যক্তিকে ঘৃণার মাধ্যমে মূলতঃ সুন্নাতকেই ঘৃণা করে। ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও শারীরিকভাবেও তারা ছ্বহীহ সুন্নাতের উপর আমলকারীদেরকে কষ্ট দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ সুন্নাত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা স্পষ্ট কুফরী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [التوبة : ٦٥، ٦٦]

আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার হুকুম আহ্কামের সাথে এবং তার রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিলে? ছলনা (ওযর) পেশ কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর!। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দিব। কারণ, তারা ছিল গুনাহগার। *সূরা আত-তাওবা ৯: ৬৫-৬৬।*

ঝ) অপর দিকে মুমিনদেরকে কষ্ট দিয়ে তারা অপবাদদাতা ও পাপের ভাগী হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾

বিনা কারণে বা অপরাধে যারা মুমিনদেরকে কষ্ট দেয় মূলতঃ তারা অপবাদদাতা ও বড় গুনাহগার। *সূরা আল-আহযাব ৩৩: ৫৮।*

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বিদ'আতের কঠিন ভয়াহতার চিত্র স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাই সাধু সাবধান! এই ভয়াবহ ও ক্ষতিকর বিষয়গুলোতে যেন আমরা

পতিত না হই। সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে বিদ‘আত পরিত্যাগ করে সুন্নাতের উপর আমল করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে বিদ‘আত ও বিদ‘আতী থেকে হেফাযত করুন, আমীন।

বিদ‘আতীদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত

বিদ‘আতীর সাথে দেখা করতে যাওয়া এবং তার সাথে উঠা বসা করা হারাম। তবে তাকে নছীহত (কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে উপদেশ) এবং তার বিদ‘আতের প্রতিবাদ করার জন্য যাওয়া যেতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি তার সাথে উঠা বসা করবে তার উপরে বিদ‘আতীর খারাপ প্রভাবই পড়বে এবং অন্যের নিকটে তার শত্রুতা ছড়িয়ে পড়বে। বিদ‘আতী ও তাদের খারাবি থেকে বাঁচা ও সতর্ক থাকা ওয়াজিব। আর এটা তখন যখন বিত‘আতীদেরকে রুখে দেয়া এবং তাদেরকে বিদ‘আতী কর্মকান্ড চর্চা থেকে বাধা দেয়ার শক্তি না থাকবে।

পক্ষান্তরে, যদি শক্তি থাকে তবে মুসলিম উলামা এবং তাদের আমীরের উপর ওয়াজিব হলো বিদ‘আতকে রুখে দেয়া। বিদ‘আতীদেরকে গ্রেফতার করা এবং তাদের খারাবিকে নিবৃত্ত করা। কেননা, ইসলামের উপর তাদের ভয়াবহতা বড় কঠিন। অতঃপর এটা জানাও ওয়াজিব যে, কুফরী রাষ্ট্রগুলো বিদ‘আতীদেরকে তাদের বিদ‘আতের প্রসারে উৎসাহিত ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদেরকে সহযোগীতা করে। কেননা, এতে ইসলামকে ধ্বংস এবং কলুষিত করার যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহর নিকটে আমরা এ প্রার্থনাই করি তিনি যেন তার দীনকে সহযোগীতা করেন, তার কালিমাকে (একত্বকে) উঁচু করেন। তার শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরিবার ও সাথীবর্গের উপর রহমত ও শান্তি নাযিল করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত/অপ্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায

২. ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু

৩. কিতাবুল ঈমান
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ

৪. কিতাবুত তাওহীদ
- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী

৫. কিতাবুত তাওহীদ- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৬. আক্বীদাতুত তাওহীদ -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৭. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৮. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া

৯. আল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া

১০. শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১১. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ - ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১২. আল আক্বীদা আত-ত্বহাবীয়া- ইমাম আবূ জা‘ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী

১৩. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী

১৪. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী

১৫. নাবী-রসূলগণের দা‘ওয়াতী মূলনীতি
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৬. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৭. খিলাফাত ও বাই‘আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৮. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন
১৯. মদীনা মুনাওয়ারা- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম
২০. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
২১. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ ‘ইছ্বাম মূসা হাদী
২২. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন
২৩. হাদীছের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী
২৪. ফিক্বহের মূলনীতি -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন
২৫. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন
২৬. আল-আজউইবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
২৭. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন - সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন
২৮. তাইসীরুল ‘আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা)
- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল বাস্‌সাম